অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ঝিন্নির খই
লাল বাতাসা

সুন্দর। কিন্তু তার
লেগে যেত নয়াপাড়ার জমিদারবাড়ি
দেখে—যে-জমিদারবাড়ির এক-নম্বর
আমলা তার বাবা।
শীতলক্ষ্যা নদীর পারে
বড়-মেজো-ছোট তরফের চক-মেলানো
দোতলা বিশাল সব ঘরবাড়ি।
ঘোড়াশালে ঘোড়া, পিলখানায় হাতি।
শীতলক্ষ্যার বুকে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি আর
সার-সার নৌকা। এক-মাল্লা,
দো-মাল্লা, তে-মাল্লা। ফি বছর পুজোর
সময় বাবার পাঠানো নৌকোয় চড়ে
বাচ্চুরা পৌঁছে যেত নোয়াপাড়ায়।
সেই জমিদারবাড়িতেই দেখা ইন্দুর
সঙ্গে। বাচ্চুর থেকে কত আর বড়,
কিন্তু যেমন সাহস, তেমনই বুদ্ধি
ইন্দুর। বাচ্চুকে ইন্দু বিন্নির খই আর
লাল বাতাসা খাওয়ায়, আবার ভয়ও
দেখায়। কখনও পরি সেজে, কখনও
সার্কাসের কায়দায় উঁচু কার্নিসের উপর
দিয়ে সটান হেঁটে গিয়ে।
এই বাচ্চু আর ইন্দুকে নিয়েই
পুববাংলার চিত্রময় পটভূমিকায় এই
দুর্দান্ত উপন্যাস। ধর্মের নামে ভণ্ডামি
ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক কিশোরীর
রুখে দাঁড়ানোর আশ্চর্য কাহিনী।

বিন্নির খই
লাল বাতাসা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯১
তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৯

ISBN 978-81-7215-046-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

BINNIR KHAI LAL BATASA
[Juvenile Fiction]
by
Atin Bandyopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

দেবারতিকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

উড়ন্ত তরবারি

কিশোর গল্পসংগ্রহ

গিনি রহস্য

দশটি কিশোর উপন্যাস

বাচ্চুদের বাড়িটা বেশ জায়গা জুড়ে। চারপাশে আম-জামের গাছ, বাড়ির পাশে বড় পুকুর। পুকুরের পাড়ে পাড়ে জাম-জামরুল, কয়েতবেলের গাছ। বাচ্চুর প্রিয় কয়েতবেল গাছটা, আর পুকুরঘাটে তেঁতুলের গাছটা। তা ছাড়া বাচ্চুর আর যা প্রিয়, যেমন পুকুর পার হলেই গোপাট— গোপাটের দু'পাশে মান্দার গাছ, তার ডাল। পলাশের বন, শিমুল গাছের জঙ্গল। ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফুটে আগুন হয়ে থাকে।

বাচ্চুর ধারণা, পৃথিবীর কোথাও তার দেশটার মতো সুন্দর জায়গা নেই, ছয় ঋতু বারো মাস এখানে নদীনালায় জল নামে। জল শুকিয়ে যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কালবৈশাখী। তারপর অবিরাম বৃষ্টিপাত। বাচ্চু তাদের বৈঠকখানার ঘরে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালবাসে। টিনকাঠের ঘর, ঝুম ঝুম শব্দ হয় টিনের চালে। কিংবা শিলা বৃষ্টির সময় উঠোনে দৌড়ে গিয়ে শিল কুড়িয়ে আনার মধ্যেও তার কম আনন্দ নেই।

কিংবা দাদাদের সঙ্গে স্কুলের পথটাও তাকে টানে। ভাদ্র মাসে তিলের জমিতে অজস্র ঘন সবুজ গাছ, সাদা ফুল। তিল ফুলের মধু যে না-খেয়েছে সে জানেই না, বেঁচে থাকা কত সুখের। এই ঘন তিল গাছের নীচে পাড়ার আবু-শোভাকে নিয়ে সে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। বড়দা, মেজদা, সেজদা তাকে পাত্তা দেয় না।

তার যেমন সুখ আছে, তেমনই উপদ্রবও কম নেই। কবে কে কোথায় দেখেছে, মাথার উপর চার-চারজন মনিব। বাবার তো সে দেখেছে শুধু বাবুমশাই একমাত্র মনিব। তার বেলায় এক নম্বর মনিব ছোটকাকা। তিনিই বাড়িতে থাকেন, আর সব জ্যাঠা-কাকারা প্রবাসে। বাবা দশ ক্রোশ দূরে জমিদারবাড়িতে, বড়জ্যাঠা ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে পড়ান। গ্রীষ্মের ছুটি আর

পুজোর ছুটি ছাড়াও তিনি বাড়ি আসেন। অন্ধ ঠাকুরদা বারান্দায় বিকাল হলেই বসে থাকেন। বড়পিসি তাঁকে ধরে এনে বসিয়ে দেন।

তার দ্বিতীয় মনিব পঞ্চুকাকা। শুধু যে তার, তা নয়। বড়দা-মেজদাদেরও। হাঁক দিলেই বজ্রপাতের মতো সবাই স্থির। পঞ্চুকাকা জমিজমা হাল-বলদ বাজার-হাট সব দেখেন।

তিন নম্বর মনিব, বাড়ির গৃহশিক্ষক। সকালে উঠেই ঘরে ঘরে হাজির, 'এই ওঠ। বেলা হয়ে গেছে। সূর্য উঠে গেলে ঘুম থেকে উঠে আর কাজ কী! সূর্যোদয়ই দেখা হল না, দিনটা ভাল যাবে কী করে!'

অর্থাৎ, গৃহশিক্ষকের তাড়নায় ভোরের ঘুমটাই মাটি। সকাল আর সাঁঝবেলা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর জিম্মায়। তিনি তখন বাচ্চুদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা। তিনি যা বলবেন, তাই সত্য। আর সব মিথ্যা।

'ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটো।'

বাচ্চুদের হেঁটে যেতে হয়।

'দৌড়া।'

বাচ্চুদের দৌড়োতে হয়।

'জোরে, আরও জোরে। আরও।' যেন গৃহশিক্ষক অম্বিকাচরণ রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন।

বাচ্চু কিছুটা গিয়েই গোপাটের বটগাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। বাচ্চু হাওয়া হয়ে গেল! সড়কের নিমতলা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে গাছটা ছুঁয়ে দিয়ে ফিরে আসার কথা। মধ্যপথে একজন হাওয়া। দাদারা ফিরতে থাকলে টুপ করে ঝোপ থেকে বের হয়ে পেছন নেয়। তারপর ফিরে হাঁপাতে থাকে। হে হে হে করে তারা চারজন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। বাচ্চু জিভ বের করে দেয়।

'তুই বড় জোরে দৌড়াস বাচ্চু। তুই দেখছি বাতাসের আগে ছুটতে পারিস। ভাল, শরীর মজবুত করে তোল। ইংরেজরা দেশটারে চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছে। লড়তে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক এল বলে। নেতারা আমাদের কখন উঠতে বলবেন, বসতে বলবেন, কে জানে। আগে থেকে রেডি থাকা ভাল।'

'নে, ধর।'

হাতে হাতে নিমের ডাল।

'ফেনা তুলে ফেলবি। দেখি দাঁত। আরও ঘষতে হবে। দাঁত ঠিক না থাকলে মানুষের সব বেঠিক।'

'নে, ছোলা-গুড়।'

এই করে গৃহশিক্ষক বাড়ি থাকলে বাচ্চুর দিন শুরু। পূজার ছুটিতে, গ্রীষ্মের ছুটিতে গৃহশিক্ষক বাড়ি গেলে তারা কিছু আলগা গোরু-বাছুর। তবে বড়মনিব সতর্ক। আরও সতর্ক দু'নম্বর মনিব পঞ্চুকাকা। চতুর্থ মনিব দয়াল। তারা যেখানে সে সেখানে, কার কী অনিষ্ট করবে তার ঠিক কী। ফেউ-এর মতো পিছু লেগে থাকার কাজ তার।

এই চার মনিবের পাল্লায় পড়ে বাচ্চু অতিষ্ঠ, আর তখনই তার মনে পড়ে গেল, পূজায় নৌকো আসবে নয়াপাড়া থেকে। নয়াপাড়া বাবার কর্মস্থল। জমিদারবাড়ির এক নম্বর আমলা তার বাবা। পূজায় ক'টা দিন তারা নয়াপাড়ায় থাকে। বাবা নৌকা পাঠিয়ে দেন।

বর্ষাকালে নৌকাই সম্বল। জলে ভেসে যায় খাল বিল নদী মাঠ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে হলেও নৌকা লাগে। তাদের ইঁদারার গোড়ায় জল উঠে আসে। তখন তারা দেখতে পায়, পালের নাও, আনারসের নাও সব বোঝাই হয়ে যাচ্ছে খাল ধরে বিলে। বিল পার হয়ে নদীতে পড়বে।

পাট কাটা হয়ে যায়। জল যত বাড়ে ধানগাছগুলো তত বাড়ে। স্কুল থেকে ফেরার সময় মাঝপথে নৌকা ডুবিয়ে হুল্লোড়। আষাঢ় থেকে শুরু। পুজোর ছুটি শেষ হলে, জল-কাদা ভেঙে মাঠ পার হয়ে স্কুলে যেতে হয় তাদের। বর্ষাকালে নৌকোয় স্কুল, বাজার। আত্মীয়স্বজনরা বেড়াতে বের হয়ে পড়ে সব, কোনও বড় সড়ক নেই। দশ ক্রোশ, বিশ ক্রোশ যত দূরেই যাওয়া যাক, নৌকা ছাড়া যাওয়া যায় না।

বাচ্চুর অন্ধ ঠাকুরদা বারান্দায় বসে থাকেন। বড়পিসি পুজোর ফুল তোলে। মা, জেঠি, কাকিরা হেঁশেল সামলাতে ব্যস্ত। ভাই-বোনদের খোঁজখবর, ভালমন্দ সব বড়পিসির জিম্মায়। জ্বর হলে পিসি, কবিরাজ ডাকতে হলে পিসি, কার ক'হাতা দুধ বাটিতে দরকার পিসি ঠিক করে দেবে। মাছ কাটার সময় পিসি। কত পিস হলে দু'বেলা পাতে মাছ পড়বে সবার, তাও তার জিম্মায়।

নিরামিষ ঘরে দুধের কড়াই, মুড়ি-মুড়কি মোয়া সব পিসির হেফাজতে। কে কী খেল, খেল না, কার জামা-প্যান্ট লাগবে, পিসির হুকুম না-হলে হবে না। বাচ্চুর এইটেই রক্ষা, চার মনিব ছাড়া তার উপর হম্বিতম্বি করার কেউ নেই। চার মনিবই পিসির কাছে জব্দ। বড়পিসি তাকে খুব ভালবাসে।

বড়পিসি তাকে ভালমন্দ নিরামিষ ঘরে বসিয়ে খাওয়ায়। দুধের ঘন সর খেতে সে খুব ভালবাসে। পিসির আঁচল ধরে কিংবা পিসি আহ্নিক করতে বসলেই বায়না। পিসিও ঠিক বোঝে। চুপিচুপি শেকল খুলে ঘরে ঢুকবে। সতর্ক দৃষ্টি। কেউ না-দেখে ফেলে! বাচ্চু পিসির গায়ে আশ্চর্য নিরামিষ গন্ধ পায়। তার ভারী ভাল লাগে পিসির পিঠে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকতে।

পিসির তখন কেমন একটা আতঙ্ক থাকে। টের পেলে সব ক'টা হামলে পড়বে। দুধ ঘন করে সর ফেলার কায়দাটা পিসির অদ্ভুত। এ-কাজটি তার করার অভ্যাস রান্নার একেবারে শেষে। অল্প জ্বালে দুধের সর ঘন হয়। সর ঘন হলে রাতে একটা পাতিলে তুলে রাখে। সপ্তাহে একদিন সরবাটা পিসির বড় একটা কাজ। সরবাটা জ্বাল দিয়ে যখন পিসি ঘি বানায় আশ্চর্য সুঘ্রাণে বাড়িটা ম' ম' করে।

খুবই দুর্লভ বস্তুটির ভাগ বাচ্চুই মাঝে মধ্যে পেয়ে থাকে। রোগা দুবলা ছেলেটাকে অম্বিকা মাস্টারমশাই যা দৌড়ঝাঁপ করান তাতে বাড়তি সরটুকু শরীরের খামতি পূরণে সাহায্য করতে পারে। এমনও ভাবতে পারে পিসি। সে চাইলে পিসি তাকে কখনও তাড়া করে না।

পিসির কল্যাণেই সে গত তিন সাল পূজায় নৌকা এলেও যায়নি। সারি সারি প্রাসাদ— বড় তরফের, মেজ তরফের, ছোট তরফের। চকমেলানো দোতলা বিশাল সব ঘরবাড়ি। সে যত দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে যে ইন্দু বলে দস্যি মেয়েটা আছে কে জানত! বাবুদের ঘোড়া আছে, পিলখানায় হাতি আছে। বাড়ির সামনে বিশাল নদী শীতলক্ষ্যা। ঘোলা জল, পাখি উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে, কত নৌকা! এক-মাল্লা, দো-মাল্লা, তে-মাল্লা নৌকা। খড় বোঝাই নৌকা, তাল আনারসের নৌকা। হাঁড়ি-পাতিলের নৌকা পাল তুলে কোথায় যে যায় কে জানে। গয়না নৌকায় উঠে তারা একবার রূপগঞ্জে বেড়াতেও গিয়েছিল।

সে কাছারিবাড়ির বারান্দায় বসে নদীর জলে নৌকা দেখত। সকাল হলেই সে হেঁটে যেত নদীর পাড়ে। পিসির মতো ইন্দুরও মতিগতি বোঝা ভার। কখন কী অর্ডার করবে বোঝা ভার। তার কথা না শুনলে, ভোগান্তির চরম। তার দাবি, বাবা যেমন তাঁর ডাক-খোঁজ করলে 'আজ্ঞে যাই হুজুর' বলেন, তাকেও আজ্ঞে আপনি করতে হবে।

উদ্ভট তার চিন্তা-ভাবনা। একবার তাকে শুঁড় বেয়ে হাতির পিঠে উঠে যাবার হুকুম করেছিল। সে জীবনে হাতিই দেখেনি! সেই প্রথম ইন্দু পিলখানার মাঠে তাকে হাতি দেখাতে নিয়ে গিয়ে কী বিভ্রাটেই না ফেলে দিয়েছিল।

হাতির নাম লক্ষ্মী।

ইন্দু কখনও হাতি বলত না। বলত, 'লক্ষ্মী বড় ভাল। চল। তুই নাকি বাড়ি যাবি বলে কান্নাকাটি করছিস?'

তা ঠিক। সে তো সেবারে প্রথম মাকে ছেড়ে, তার পরিচিত ঘর, বাড়ি, পুকুর, গোপাট, স্কুলের পথ ফেলে দশ ক্রোশ দূরে পুজো দেখতে গিয়েছিল। বাড়ি বাড়ি মহাপ্রসাদের ভোগ খেয়েছিল। মোষবলি দেখেছিল। ইন্দু না-থাকলে সে মোষবলি দেখতে যেত কি না বলা যায় না। তার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

সেই ইন্দুকে সকালবেলায় বাবাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বউঠানকে খবর দিয়েছিলেন। 'বউঠান, কী করি! বাচ্চু তো সারারাত তার মা'র জন্য ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। বাড়ি চলে যাবে বলছে। ইন্দু যদি পারে।'

তা পারতেই পারে। সমবয়সি ইন্দুকে দেখলে ঘাবড়ে যাবারই কথা। পরির মতো দেখতে। ছাদের কার্নিশে সব পাথরের পরিরা উড়ে বেড়ায় প্রাসাদে। পরিরা দিনের বেলায় ছাদের কার্নিশে থাকে, গভীর রাতে ছাদের কার্নিশে থাকে না। উড়ে চলে যায় নিজের দেশে। ইন্দুই প্রথম খবর দিয়েছিল, পরিদেরও বাবা-মা থাকে। এতসব বলার পরও সে যখন সকালবেলায় গুম হয়ে বসেছিল, আর মা'র কথা মনে হলেই টপটপ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল, তখনই ইন্দু বলেছিল, 'চল, লক্ষ্মীর কাছে যাই।'

প্রথমে সে ভাবতেই পারেনি, আসলে লক্ষ্মী হল গে জমিদারবাবুর পোষা হাতি। জলা জায়গা, সড়ক-যোগাযোগ নেই। হাতি তাই পিলখানায়

বাঁধা। হেমন্তে, শীতে সে ছাড়া পায়। বাবুরা তখন হাতির পিঠে চড়ে জয়দেবপুরের গড়ে শিকারে যায়। কেবল, সন্ধ্যায় একটা বড় স্টিমার আসে, যায় ভৈরববাজারের দিকে। যাত্রী নামিয়ে সকালে ফিরে আসে। বর্ষায় শহরে যেতে হলে ওই এক স্টিমার ছাড়া আর কোনও যান-চলাচল নেই। স্টিমারের আলো নদীর জলে ভেসে বেড়ালে কেমন এক মায়াবী পৃথিবী তৈরি হয়ে যায়। নদীর পাড়ে আশ্চর্য সব যেন রূপকথার দেশ, বাগান, দিঘি। দিঘির পাড় বাঁধানো। নদীর পাড় বাঁধানো। বড় বড় ঝাউগাছ দু'পাশে— শন শন করে হাওয়া বইলে কেমন এক নিরন্তর বর্ণমালা তৈরি করে দিয়ে যায় নদীর জল, চরের কাশফুল।

এমন একটা স্বপ্নের দেশে তার ইন্দুর ভয়ে আর যাওয়া হয়নি। গেল তিন সালেই পুজোর নৌকা এলেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পুজোর ছাঁট দেওয়া হয়ে যায়। বাড়ির পরামানিক উপেন তেঁতুলতলায় বসিয়ে ঘাড় থেকে কপাল পর্যন্ত এক মাপের চুল ছাঁটে। ছোট না, বড় না। বাচ্চুর বড়দা মাঝে মাঝে খেপে যায় ঠিক, তবে মুখ ফুটে রা করার সাহস নেই। ছাঁট শেষ হলে উপেন ছোট্ট টিনের ভাঙা আরশি বের করে দেবে। 'দ্যাখ ইবারে, একেবারে কদমছাঁট যারে কয়।' বাচ্চুদের বাড়িতে সব কিছু এক মাপের। ঢাকা থেকে জ্যাঠামশাই পূজার নতুন জামা-প্যান্ট কিনে আনেন। প্রস্থে এবং উচ্চতায় গড়পড়তা হিসাব। বড়দার প্যান্ট হয়ে যায় বাচ্চুর হাফ-প্যান্ট আর কিছুটা নেমে গেলেই পাজামা।

চুলের ছাঁট একরকম। আধ ইঞ্চির বেশি না। ছোটকাকা না হয় পণ্টুকাকা তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ছোট না, বড় না। সব এক মাপের হলে কারও ক্ষোভ থাকারও কথা না। তেঁতুলতলায় পূজার চার-পাঁচদিন আগে থেকে চুল ছেঁটে পূজা শুরু। নৌকায় ফিরে এলে পূজা শেষ।

বাচ্চুর হাফশার্ট, হাফপ্যান্ট এত ঢলঢলে যে, সে এক হাতে প্যান্ট ধরে না-রাখলে হড়হড় করে নেমে যায়। অবশ্য এতে বাচ্চু কাবু হয়নি সেবারে। কাবু হয়েছিল ইন্দুর পাল্লায় পড়ে।

'লক্ষ্মী, দাঁড়া।'

হাতিটা দাঁড়িয়ে গেল।

'লক্ষ্মী, বোস।'

হাতিটা হাঁটু মুড়ে বসে গেল।

'লক্ষ্মী, বাবুকে সেলাম দে।'

শুঁড় তুলে ঠিক বাচ্চুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সেলাম পর্যন্ত দিয়েছিল।

বাচ্চু ভুলে গিয়েছিল মা'র কথা। দু'জনে উবু হয়ে বসে লক্ষ্মীর আচরণ দেখছে। আগুপিছু করছে হাতিটা। গলায় বিশাল ঘণ্টা বাঁধা। ঢং ঢং করে বাজে। চারপাশে বনজঙ্গল, আম-জামের ছায়া, সারি সারি পিটুলি গাছ, ঢুকলে মনে হয় একটা গভীর বনের মধ্যে তারা ঢুকে গেছে। ইন্দুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভয়ডর নেই। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী রামসুন্দরকে পর্যন্ত বনের ভেতর ঢুকতে দেয়নি।

গ্রামের বাইরে বাজার পার হয়ে সেই বনজঙ্গল। সে একা হলে ঢুকতে সাহসই পেত না। কিংবা বনের মধ্যে সহসা ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকলে কার না ভয় লাগে। কেমন নিরিবিলি ঝোপজঙ্গল চারপাশে। কেবল মাঝখানে সিমেন্টের বড় চাতাল। একটা লোহার কিলক, কিলকটার সঙ্গে শেকলে বাঁধা হাতির একটা পা। শেকলেরও ঝনঝন শব্দ হয়। বাচ্চু ইন্দুর সাহস দেখে শেষে তাজ্জব। সে কাছে গিয়ে শুঁড় ধরে আদর করতে করতে ডেকেছিল।

'আয়।'

'না।'

'আরে আয় না। কিছু করবে না। লক্ষ্মী আমাকে খুব ভালবাসে জানিস।' তারপরই কোত্থেকে ইন্দু একগাদা মাদারের ডাল টেনে আনল। ডালে বড় বড় কাঁটা। ডালগুলি টেনে আনার সময় ইন্দুর হাত-পা ছড়ে গিয়েছিল। ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা ডাল ভেঙে এগিয়ে দিতেই হাতিটা শুঁড় দিয়ে মুখে ফেলে দিল। বড় বড় দুটো দাঁত বের হয়ে আছে। হাঁ করতেই সে দেখল বিশাল দাঁতদুটো চোয়ালের ভেতর থেকে বের হয়ে আছে। কাটা ডালগুলো এত সহজে মটমট করে ভেঙে ফেলল এবং এমনভাবে খেতে থাকল যেন সুস্বাদু নরম নারকেল চিবিয়ে খাচ্ছে।

তার হাতেও একটা ডাল দিয়ে বলেছিল, 'দে। দে না! কিচ্ছু করবে না।'

কিন্তু এত বড় জন্তুটার সামনে যেতেই তার ভয়। ইন্দুর সাহস দেখে সে

তাজ্জব বনে গেছে। সে কিছুতেই নড়ছিল না। সে কেবল বলছিল, 'না, আমি যাব না। তুই যেতে হয় যা।'

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'আমার বাবা তোর বাবার মনিব। তুই আমাকে আজ্ঞে আপনি করবি। যা বলব তাই করবি।'

বাচ্চু এতে খেপে গেল খুব। তবু বাবার মনিবের ছোট কন্যে। অবহেলাও করতে পারে না, আজ্ঞে আপনিও করতে পারে না। এমন পুঁচকে মেয়েটাকে সে ফেলে যে চলে আসবে সে সাহসও নেই। নদীর পাড় ধরে বাজারের ভিতর দিয়ে কীভাবে যে একটা পোড়োবাড়ি পার হয়ে এত বড় জঙ্গলটায় তারা ঢুকে গিয়েছিল মনে করতে পারে না।

কোনও নির্জন জায়গায় সে একা যেতে তখনও ভয় পেত। এখন সে বড় হয়ে গেছে। সেবারে সে ক্লাস ফোরে পড়ত। এবার ক্লাস এইটে উঠেছে। বড়দা টেনে ওঠার পর থেকেই বিপ্লব শুরু করে দিয়েছিল। এক মাপের জামা-প্যান্ট সে পরবে না। সে পুজো দেখতেও যাবে না। পুজোয় সে বাড়িতেই থাকবে।

এবারে তাই মাপমতো জামা-প্যান্ট তৈরি হয়েছে। গাঁয়ে পরামানিক আছে, জামা-কাপড় সাফ করার লোক আছে, কিন্তু দর্জি নেই। দু'ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে জামা-প্যান্টের মাপ দিয়ে আসতে হয়েছিল। এবারে পুজোয় নৌকা এলে বাচ্চু কী করবে ঠিক করতে পারছে না।

ইন্দু তাকে এবার কী করবে কে জানে। সে যদি সেবারের মতো আবার তাড়া করে, তবেই হয়েছে!

'কী বলছি শুনতে পাচ্ছিস?'

বাচ্চু পা পা করে পেছনে সরে যাচ্ছিল, ইন্দু ঠিক লক্ষ করেছিল। হাতিকে আদর করার চেয়ে ছোটা তার পক্ষে বেশি নিরাপদ। সে জঙ্গলের ভেতর দিয়েই ছুটত যদি না হঠাৎ ইন্দু তাকে বলত, 'দ্যাখ, মজা দ্যাখ।'

বলেই না ইন্দু হাতিটাকে কী যে ইশারা করল কে জানে, হাতির শুঁড়ের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ঠিক মাথায় দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পিঠের উপর ডিগবাজি খেল। এক পা তুলে বোঁ করে ঘুরে গেল। দু'হাত উপরে তুলে ডিগবাজি খেল হাতির পিঠে। হেঁটে গিয়ে বলল, 'কী রে, দেখলি!'

তার চক্ষু ছানাবড়া। সে তো চোখ বুজে ফেলেছিল। ঠিক সিঁড়ি ধরে যেন কেউ উঠে গেল। শুঁড়টা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছিল, ব্যালান্সের যেন খেলা দেখাচ্ছে ইন্দু। ইন্দু প্রায় দৌড়ে উঠে গিয়ে পিঠের উপর দিয়ে ছুটে গেল। তারপরই ইন্দু লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল। এত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে পড়লে হাত-পা না ভেঙে যায়! কিন্তু, আশ্চর্য, ওর এতটুকু লাগেনি। ফ্রক ঝেড়ে সে ছুটে এসেছিল তার কাছে।

সেও ছুটেছিল প্রাণ বাঁচাবার জন্য। সে ঠিক ভেবে ফেলেছে ইন্দু আসলে মানুষ না। পরিটরি হবে। কারণ বাড়ির কার্নিশে যেসব পরি থাকে, ইন্দু তাদেরই একজন না-হয়ে যায় না! সে চোখ বুজে সেই যে দৌড় লাগাল তার আর খেয়াল ছিল না, কোথায় যাচ্ছে!

ইন্দুর এই লীলা সে আজও ভুলতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আবার ইন্দুকে মনে হয়েছে সরল সাদাসিধে মেয়ে। সে যে বাবুমশাইয়ের ছোট কন্যে, আদরে আদরে তার মাথাটি গেছে তা জানত না। জেদ ধরলে করবেই। যেমন সে যে ক'দিন ছিল, ফাঁক পেলেই অন্দর থেকে বের হয়ে আসত। আর তাকে দেখে হা হা করে হাসত। তার বাবাকে বলত, 'খুড়ামশাই, বাচ্চুটা না একদম বোকা।'

তখন মনেই হত না তাকে ছোট করছে। সে কাছারিবাড়ি থেকে নড়তে চাইত না। বাবা নদীর ঘাটে চান করতে গেলে সঙ্গে যেত। বাবা, বড়দা, মেজদা, সেজদারা যেখানে, সে সেখানে। অপরিচিত যে কেউ তাকে কোনও ঘোরে ফেলে দিতে পারে, ইন্দুর আচরণে তার সেটা মনে হয়েছে।

আশ্বিনের নীল আকাশের নীচে, সাদা ফ্রক গায়ে কোনও বালিকাকে একা হেঁটে আসতে দেখলেই সে আর দাঁড়াত না। সে ছুটত। আসলে পরিরা এমনিতে খারাপ না। তারা ভূত-প্রেতের মতো ভয় দেখায় না। তারা ভালবেসে পাখনা মেলে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই যেখানে নক্ষত্ররা বসবাস করে। নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে এক কল্পিত দেশ সে দেখতে পেত। সেখানে সব নদীর জল বরফ হয়ে গেছে। শীতে পাতা ঝরে গেছে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু বরফের উপত্যকা। পরিরা বরফের দেশের মানুষ বলেই এত সুন্দর হয়। সবুজ পাইনের বনজঙ্গল সেখানে থাকে বটে, তবে তার

ডাল থেকে কেবল টুপটাপ পাতা ঝরে পড়ে। পাতা উড়ে যায় বরফের কুচির মতো। সেখানে থাকে লাল-নীল রঙের কাঠের বাড়ি। ফুল ফোটে না, শস্য হয় না, পরিরা কিছু খায়ও না। সারাদিন শুধু পাখা মেলে নাচে। তারপর সকাল হবার আগে যার যেখানে বাস চলে যায়। ছাদের কার্নিশে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইন্দু না বললে পরিদের সম্পর্কে এত খবরও সে রাখত না। আর যা বলেছিল, তাতে তার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। সকাল হলেই ইন্দু অন্দর থেকে ছুটে এসে কাছারিবাড়ির বেঞ্চিতে বসে বলত, 'তুই একটা হাবা। তোকে একদিন দেখবি ঠিক জ্যান্ত পরি দেখাব। আমাকে দেখলেই ছুটে পালাস কেন রে!'

কাছারিবাড়িতে খোপ খোপ ঘর। বাবার জন্য একদিকটায় থাকার এলাহি ব্যবস্থা। টানা-পাংখা টাঙানো। গরমে হরিহর বারান্দায় বসে পাংখা টানে। সাদা ফরাশ পাতা, তাকিয়া, বদ্রি হুঁকো— বাবার সামনে থাকে একটা কাঠের বাক্স। অন্দর থেকে তালিকা আসে।

আবার বাচ্চু দেখেছে, কার কী লাগবে, বাজার কী হবে, তার বাবা ছাড়া কেউ জানে না। কেউ কিছু বলতে পারে না। এবং প্রজাদের আদায়পত্র বাবা কাঠের বাক্সে হিসাব করে টাকা আধুলি তামার পয়সা খোপে খোপে ভরে রাখছেন। বাবার দম ফেলার সময় নেই। তখন কিনা ইন্দু ফরাশে উঠেই বাবার ঘাড়ে ঝুলবে। বাবা কেমন নির্বিকার। যেন এত ব্যস্ততার মধ্যে ইন্দুই পারে বাবার পিঠে ঝুলে পড়তে। পারে দোল খেতে। যা খুশি করতে। বাবা তখন তার কেমন ধন্য হয়ে যান।

তার তো বাবার সঙ্গে কথা বলতেই কেমন ভয় লাগে। রাশভারী মানুষ। মোটা কালো গোঁফ। গৌরবর্ণ মানুষটা যেমন লম্বা, তেমনই ধীর-স্থির। বাবাকে সে কখনও হাসতে দেখেনি। সেই বাবা কিনা ইন্দু এলে সব কাজ ফেলে মজার মজার গল্প শুরু করে দেন।

এসব দেখার পর ইন্দুর লাঞ্ছনা সম্পর্কে সে নালিশও দিতে পারেনি বাবাকে। বলতে পারেনি, 'জানেন বাবা, ইন্দু বলে কিনা আমার মনিব। আজ্ঞে-আপনি করতে হবে।' আসলে সে চার মনিবের পাল্লায় অতিষ্ঠ। আবার নতুন মনিব!

রাতে তারা শুয়ে ছিল পাশাপাশি। বাবা আর সে। ইন্দু তাকে ল্যান্ডোতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রতিমা দেখে এসেছিল। ইন্দুর সঙ্গে সে আর রামসুন্দর পেয়াদা। সে যেতেই চায়নি। কিছুতেই যাবে না। বাবা বারবার বুঝিয়েছিলেন, 'কেন যাবি না, কী হয়েছে! যা, পুরানো বাড়ির দুগ্গাঠাকুর দেখে আয়, অবিনাশবাবুর বাড়ি যা, আশুবাবুর বাড়ি যাবি। দেখবি কী আলো, কত বাজি পুড়ছে। ঢাক বাজছে।''

তা ঠিক, সে এমন রহস্যময় একটা পৃথিবী আছে, আগে জানত না। এত বিশাল বিশাল দালানকোঠা হয় জানত না। বারমহল, অন্দরমহল, দাসীমহল, কত না সব মহলের নাম। সে একদিন ইন্দুকে খুঁজতে গিয়ে বাড়িটা থেকে বের হবারই পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। নাটমন্দির পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গিয়েছিল, দরজার পর দরজা, ঝাড়লণ্ঠন, জালালি কবুতর, দাসী-বাঁদিমহলে ঢুকেই সে ভ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল, এ সে কোথায় চলে এল! সবাই ছুটে তাকে ধরতে আসে।

বাচ্চু ভেবে পায় না, যে ইন্দুকে সে এত ভয় পায় তাকেই খুঁজতে নাটমন্দির পার হয়ে ভেতর-বাড়ি ঢুকে গিয়েছিল কেন! যাকে নদীর চরে একা উঠে আসতে দেখে দৌড় দৌড়, দু'জনারই দৌড় শুরু, ইন্দু চিতাবাঘের মতো দৌড়োয়, যেন শিকার পালিয়ে যাচ্ছে। সে আত্মরক্ষার জন্য পালায়, কারণ সে জানে তাকে নিয়ে ইন্দু নদীর জলে ঝাঁপ দিতে পারে, নৌকায় উঠে, এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায়— কারণ, নদীর ঘাটে জমিদারবাবুদের পূজা দেখার জন্য দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষ-বোঝাই নৌকা আসে, ঘাটে দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায়, শুধু নৌকা লেগে আছে। এই এক বিপজ্জনক খেলা ছিল ইন্দুর, তাকে নৌকায় তুলে দিয়ে জলে ফেলে দেবে ভয় দেখাত।

অথচ সেই ইন্দুকে আবার সারাদিন না-দেখলে মন কেমন করত তার।

বাবার পাশে শুয়ে রাতে চুপি চুপি বলেছিল, 'আচ্ছা বাবা, মানুষ কখনও পরি হয়! পরি কখনও মানুষ হয়ে যেতে পারে?'

বাবার অদ্ভুত কথা, 'হতেই পারে। কী হয় কী না-হয়, কেউ বলতে পারে না।'

বাচ্চু জানে, বাবা তার খুবই ধর্মভীরু মানুষ। নদীর ঘাটে সকালে প্রাতঃস্নান, সেই বিশাল নদীর গর্ভে বাবার আহ্নিক নানাভাবে কেমন যেন মুহ্যমান করে রাখত তাকে। চরে কাশের ফুল ফুটে আছে, নদীর ও-পাড় দেখা যায় না, বাবুদের বাড়ি বাড়ি পুজোর ঢাক বাজছে, গভীর নীল আকাশ দেখতে দেখতে বাবার কথাই সত্যি মনে হয়েছে। 'কী হয়, কী না-হয় কেউ বলতে পারে না।'

ইন্দু বাবুমশাইয়ের কন্যে হতে পারে। আবার ইন্দু ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও পরিও হতে পারে। কিংবা ইন্দুর বেশ ধরে কখনও কোনও পরি তার সঙ্গে খেলা করেও যেতে পারে।

এসব মনে হলেই তার গায়ে কাঁটা দিত। সে তখন অবশ্য ছোট ছিল বলে এসব ভাবত। এখন বড় হয়ে গেছে।

২

বাচ্চু এখন বড় হয়ে গেছে বলে এতটা আতঙ্কে পড়ে যেতে নাও পারে।

সেবারে বাড়ি ফিরে জনে জনে তার প্রশ্ন ছিল, সত্যি পরি আছে কি না?

ঠাকুমা বলেছেন, 'এ কী রে, তুই কিচ্ছু জানিস না। কত লোক আছে জানিস? দেবলোক, গন্ধর্বলোক, প্রেতলোক— পরিরা থাকে গন্ধর্বলোকে। নাগলোকে থাকে তক্ষকমুনি।'

বিকালে বড় ঘরের বারান্দায়, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হয়। অন্ধ ঠাকুরদা বসে শোনেন। মা-জেঠিমা বা কখনও বড়দার উপর ভার পড়ে রামায়ণ-মহাভারত পাঠের। কাউকে না-পাওয়া গেলে বাচ্চুর ডাক পড়ে। তা দুলে দুলে পড়তে খারাপ লাগে না। শীতের বেলা শেষ হয়ে আসে। যমুনাপিসি, বড়পিসি, ঠাকুমা, ঠাকুরদা, আরও পাড়ার সব বুড়ো-বুড়িরা বারান্দায় বসে ঠাকুরবাড়ির রামায়ণ পাঠ শোনে।

বাচ্চুর কাছে তখন বাড়ির এই টিন-কাঠের ঘর, কামরাঙা গাছের ছায়া, উত্তরের বাঁশবনে টিয়াপাখির ঝাঁক, কিংবা শীতের বকুল গাছ, কলাইয়ের

জমি, মটরশুঁটির নীল ফুল সবাই মহাভারতের দেশ থেকে উঠে আসে। অন্ধ ঠাকুরদা যেন পালাগানে ধৃতরাষ্ট্র সেজে বসে থাকেন। বাবাকে কেন যে দাতাকর্ণ মনে হয় সে এখনও এটা বুঝে উঠতে পারে না। বড় জ্যাঠামশাই যুধিষ্ঠির— তিনি সবার শেষ কথা বলার মানুষ।

গত তিন বছর পূজায় নাও এলে সে মাঝিবাড়ি গিয়ে বসে ছিল। নেই তো নেই। পূজার নাও নিয়ে আসে অলিমদ্দি-কলিমদ্দি দুই ভাই। লুঙ্গি পরনে, চিবুকে সাদা-কালো দাড়ি। দু'ভাইয়েরই মাথা ন্যাড়া। চুল বড় থাকলে গরমে মাথার ঘিলু গলে যেতে পারে এই একটা ভয় দুই ভাইকেই কাবু করে রাখে। সেবারে অলিমদ্দি নৌকায় যেতে যেতে তাদের এই খবরটাও দিয়েছিল। বড়দা, মেজদার চুল নিয়ে আফশোস। রাগে গরগর করছিল দাদারা। মাথায় কদমছাঁট, ঘাড় থেকে কপাল পর্যন্ত মাত্র আধ ইঞ্চি চুলের মাপ। পঞ্চুকাকা পাহারাদার। চেঁচামেচি করলেই পঞ্চুকাকার হম্বিতম্বি। 'দে, ন্যাড়া করে দে। বুঝুক ঠ্যালা।'

তারপর পঞ্চুকাকার কী মেজাজ হয় কে জানে। মন নরম হয়। উপেনদার পাশে দাঁড়িয়ে দু'আঙুলে চুল চিমটি দিয়ে ধরতে পারলেই এক কথা, 'আর সামান্য ছাঁইটা দ্যাও। কর্তা না-হইলে গালমন্দ করব।'

'ধুস কর্তা!' বলেই বড়দা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

পঞ্চুকাকার বিরাশি-সিক্কা ধমক, 'উমাশঙ্কর, থাবড়া মাইরা সব ক'টা গালের দাঁত ফালাইয়া দিমু। ব', কইতাছি।'

বড়দা উমাশঙ্কর ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়ার আগে বলত, 'উপেনদা, একেবারে ক্ষুর দিয়ে চেঁছে দাও। ন্যাড়া মাথা নিয়া পূজার নাও আইলে ভাইসা যামু। ভাল্লাগে— বাড়ি বাড়ি প্রতিমা দেখতে যাব, ন্যাড়া মাথা। আছে কী চুলের! লোকে দেখলে কী ভাবে!'

কলিমদ্দি বলেছিল, 'কর্তারা, মন খারাপ কইরেন না। ছোটকর্তার বোধবুদ্ধি খুব। আমার মুন্ডুখানা দ্যাখেন। অলিমদ্দির দ্যাখেন। হপ্তায় হপ্তায় ন্যাড়া না-হইলে রাতে ঘুম হয় না। ঘিলু গরম হইয়া যায়। আপনারা ইস্কুলে যান, ঘিলু ঠান্ডা না-থাকলে পড়া মনে থাকবে কেন!'

অকাট্য যুক্তি। বাচ্চুর এমন মনে হত। চুল বড় ছোট নিয়ে তার মাথাব্যথা

নেই। কারণ যার মাথার উপর চার-চারজন মনিব, তার আর চুল ছোট-বড়। আরও একজন মনিবের অধিকার দাবি করছে। সে মাথা পাতেনি। বলেছে, 'দ্যাখ ইন্দু, যা বলবি সব করব। তবে আজ্ঞে-আপনি করতে পারব না। আমার বাবা তোর খুড়ামশাই, মনে রাখবি।'

সে ভেবেছিল, বাবাকে নালিশ দেবে। 'জানেন বাবা, ইন্দু না আমাকে আজ্ঞে-আপনি করে কথা বলতে কয়।' কিন্তু বাচ্চু বলতে সাহস পায়নি। যদি বলে দেন, 'কী ক্ষতি, ইন্দু তোর চেয়ে দু'মাসের বড়। তুই হলি কার্তিক মাসে, ইন্দু হল ভাদ্র মাসে।'

তা হলেই গেছে!

বড় জ্যাঠামশাই শেষপর্যন্ত বলেছিলেন, 'বাচ্চুকে জোর করে পাঠানো দরকার নেই। আমি ওকে পরাপরদির পূজা দেখিয়ে আনব। বছরকার দিন দেবীদর্শন করবে না, সে কী করে হয়!'

ছোটকাকা চুপ। বড়দার বিধান অমান্য করার সাহস নেই। তাঁর কথাই শেষ কথা। বড়পিসিও বলেছিল, 'বাড়ি ছেড়ে থাকতে পারে না যখন, না-যাওয়াই ভাল।'

পর পর তিন বছর সে বড়জ্যাঠার সঙ্গে নৌকায় পরাপরদির পূজা দেখতে গেছে। বড় জ্যাঠার কী সমাদর! শামিয়ানার নীচে বড়জ্যাঠাকে ইজিচেয়ারে বসানো হয়েছে। বড় জ্যাঠাকে দেখে যে যেখানে বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়েছিল। এটা যে কত বড় গর্ব, ইন্দুকে যেন না-জানালেই নয়!

সে যদি যায়, পূজার নাও এলে এজন্যই যাবে। না-ও যেতে পারে। কারণ তার মর্জি একমাত্র বড়জ্যাঠা ছাড়া কেউ বোঝে না। বড় জ্যাঠাই কেবল বলেছিলেন, 'ঈশ্বর, দেবদেবী, পরি, রাক্ষসখোক্কস সবই হল গে মানুষের কল্পনা। মানুষই একমাত্র ঈশ্বর আবিষ্কার করেছে। এই যে দেখছিস গাছপালা, বিলের জল, নদীর উপর সাঁকো, আকাশ, নক্ষত্র, সব মানুষ আছে বলে, না-থাকলে সব ফাঁকা। মানুষই গন্ধর্বলোক, নাগলোক, প্রেতলোক, পরলোক, দেবলোক কল্পনা করে নিয়েছে। বুঝতে পারিস না, জ্বর-জ্বালায় রোগ-ভোগে মানুষ কী কাতর হয়। মানুষের এজন্যই এসব দরকার। মানুষের জয়যাত্রাও।'

'জয়যাত্রা কী, জ্যাঠামশাই?'

'এই যে ধরো আমরা নৌকায় যাচ্ছি, এই যে দেখছ চাষ-আবাদ, ফসল, মানুষ কল্পনা করতে শিখেছিল বলে হয়েছে। দেবদেবীর কল্পনাও মানুষকে গভীর ক্ষোভ-দুঃখ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখায়। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম, জন্ম-মৃত্যুর ফাঁকটুকুতে যা আছে তার নাম জীবন। বিচিত্র রহস্যের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকি বলে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না। পড়লেই ভয় কী! গৃহদেবতা আছেন তিনি দেখবেন। এই যে তোমার আত্মসমর্পণ প্রকৃতির কাছে, তার নামই ঈশ্বর।'

বাচ্চু কেমন অপলক তাকিয়ে থাকে বড়জ্যাঠার মুখের দিকে। শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বড়জেঠিমার কথা তার মনে নেই। বড়জেঠিমা নাকি দুগ্গাঠাকুরের মতো দেখতে ছিলেন। ভেদ-বমিতে দু'রাতও পার করতে পারলেন না। বড়জ্যাঠা সেই থেকে কিছুটা সাধু প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির বৈঠকখানার একটা দিক ঘিরে তাঁর ঘর-বারান্দা। আর বইয়ের শেলফ। গাদা গাদা বই। বিকাল হলেই তিনি বাড়ি বাড়ি যাবেন, সবার কুশল নেবেন, কখনও গোপাট ধরে বিলের দিকে হেঁটে যাবেন। ফিরতে ফিরতে তখন রাত হয়ে যায়। জ্যাঠামশাই পথ না-হারিয়ে ফেলেন, সেই আতঙ্কে সে যে কতদিন লণ্ঠন হাতে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বড়জ্যাঠামশাইয়ের সব কথা সে সবসময় বুঝতেও পারে না। তবু বাচ্চু দেখেছে, বড়জ্যাঠাকে সেই একমাত্র, কেন এটা হবে, কেন এটা হবে না, বলতে পারে। আর কেউ বলতে পারে না। এমনকী, তার চার মনিবের একজনও না। বড়জ্যাঠার চোখে পড়ে গেলেই তারা কেমন ঘাবড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সে খুবই মনোযোগ দিয়ে সব লক্ষ রাখে। যেমন, যেদিন বড়জ্যাঠার ফেরার কথা থাকে, পুজার সময় তিনি গয়না-নৌকায় ফেরেন, বাড়ি থেকে পঞ্চুকাকা আর দয়াল কোষা-নৌকা নিয়ে ফাওসার বিলে অপেক্ষা করে। গয়না-নৌকা নারায়ণগঞ্জ থেকে যায় গোপালদি।

জ্যাঠা নারায়ণগঞ্জে এসে ওঠেন। ঘাটে ঘাটে গয়না-নৌকা থেকে যাত্রী নামে, যাত্রী ওঠে। ফাওসার বিলে যারা নামে, তাদের জন্য নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয় সেও সঙ্গে যায়। কারণ জ্যাঠা এলেই ঢাকার গ্যান্ডারি

(আখ) নিয়ে আসবে। সোনালি বরন সেই নরম লম্বা আখ যে না-খেয়েছে, সে জানেই না কী নরম মিষ্টি রসে ভরতি। টিনভরতি বাখরখানি। ফাওসার বিলে তখন জ্যোৎস্না থাকে না। অন্ধকার। জলের কলকল ছলছল শব্দ। বড় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি ফেরার চিঠি পেলেই সবার মধ্যে ঢাকের বাজনা শুরু হয়ে যায়। দেবীবোধন শুরু হয়ে যায়। অনেক দূর থেকে দেখা যায় গয়না-নৌকার লণ্ঠন দুলছে। প্রথমে কোনও স্থির নক্ষত্র মনে হয়, পরে নড়তে থাকলে মনে হয় টুক করে বিলের জলে নক্ষত্রটি খসে পড়ার জন্য নড়ছে। তারপর ধীরে ধীরে কাঁপতে থাকলে, আরও বেশি নড়তে থাকলে বাচ্চু চিৎকার করে ওঠে, 'জ্যাঠামশাই আসছে।'

বাচ্চুর এই রহস্যময় অন্ধকারের অভিজ্ঞতা ইন্দুকে বলা হয়নি। ভাবছে, এবারে যদি যায় তবে বলবে, 'জানিস, বড়জ্যাঠামশাই গয়না-নৌকায় ফেরে।' ইস্টিমারে ফেরার চেয়ে গয়না-নৌকায় ফেরা কত বেশি মজার, ইন্দুকে জানানো দরকার।

পঞ্চুকাকা তখন কী ভালমানুষ হয়ে যায়। তাকে ঘাঁটায় না। অন্ধকারে বিলের জলে কতরকম মাছ নড়ে বেড়ায়, চারপাশে কোনও গাঁ-গেরাম নেই, কোনও এক গভীর সমুদ্রে যেন তারা ভেসে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে হাঁক, লণ্ঠনের আলো দেখলেই হাঁক— যে-যার বায়ে। ব্যস, তা হলে আর ঠোক্কর লাগার ভয় থাকে না। নাওগুলি যে-যার পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর সেই অন্ধকার রাতে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে ঘরে ফেরা। ক্রোশ দুই পথ, ধানের জমির ভিতর দিয়ে কিংবা পাটের জমি— সবই তো জলে ভেসে যায়। কোথাও গলাজল, কোথাও ডুবজল। নৌকা যায়। পঞ্চুকাকা লগি বেয়ে নিয়ে আসে। সামনে লণ্ঠনের বাতি জ্বলে। জ্যাঠামশাই পাটাতনে পদ্মাসনে বসে থাকেন। এই মনোরম অভিযানের কথা কোনও বইয়ে লেখা থাকে না কেন, বাচ্চু ভাবলে অবাক হয়। দূরে দেখতে পায় সে ইঁদারার ঘাটে কেউ লণ্ঠন নিয়ে অপেক্ষা করছে। বড়পিসি ছাড়া আর কারও ঘাটে অপেক্ষা করার কথা থাকে না। বড়দা, মেজদাও থাকতে পারে। আখের লোভ বড় লোভ।

বড়জ্যাঠামশাই প্রথমেই পঞ্চুকাকার কাছে বাড়ির খবরাখবর নেবেন। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইবেন বাচ্চুর কাছে। জ্যাঠামশাই ঘাটে

নামলেই মা, জেঠি, কাকিরা যে-যার ঘরে ঘরে ঢুকে যাবেন। সামনে পড়ে গেলে একগলা ঘোমটা— ঠাকুরদা জেগে থাকেন, জ্যাঠা না-ফেরা পর্যন্ত খাটে বসে থাকবেন।

বড়জ্যাঠা বড়ঘরে প্রথমে উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত— প্রথমে ঠাকুমা, পরে ঠাকুরদা, তারপর গৃহদেবতার ঘরে। শেষবেলায় আসবেন মা-জেঠি-কাকিরা। তাঁরা দূর থেকে প্রণাম সেরে উঠে যাবেন।

বাচ্চু এইসব দেখতে দেখতে ভাবে, ইন্দুকে শুধু বড়জ্যাঠার ফেরার খবর দিলেই তাজ্জব হয়ে যাবে। ইন্দুকে যদি একবার তাদের বাড়ি নিয়ে আসতে পারত, তবে সে তাকে পরি দেখানোর মজা বের করে দিতে পারত।

সে ছোট ছিল বলে তাকে নিয়ে ইন্দু কী না হুজ্জোতি করেছে।

সে ছোট ছিল বলে, তাকে সুপারির বাগানে নিয়ে পরি দেখাবার নামে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যেত!

'এই চোখ বোজ।'

বাচ্চু চোখ বুজত।

'তাকা।'

সে তাকাত।

এ কী, ইন্দু দু'হাত মেলে মুখ উপরের দিকে রেখে তাকিয়ে আছে। যেন সে সত্যি উড়ে যাবে। তার লতাপাতা-আঁকা ফ্রকে বিকালের জাফরি-কাটা রোদ। গাছে গাছে লাল সবুজ সুপারির থোকা, আর যতদূর চোখ যায় শুধু সুপারির বন।

সামনে-পেছনে কিছু দেখা যায় না।

ইন্দু তাকে জ্যান্ত-পরি দেখাবে বলে নিয়ে গেছে সুপারির বনে।

প্রাসাদের ভেতরের দিকে পাঁচিল টপকালেই বনটার শুরু। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানে না।

জ্যান্ত-পরি দেখার লোভে সেও না-বলতে পারেনি। রামসুন্দর পেয়াদাও সঙ্গে নেই। বিকালে কখন কোন ফাঁকে কাছারিবাড়ি ঢুকে গেছে তাও জানত না।

কখন তাকে ডেকেছে, নাকি সে কোনও ঘোরে পড়েই গিয়েছিল জানে না।

রাতে আশুবাবুর নাটমন্দিরে 'বৃষকেতু' পালা। কলকাতা থেকে নাকি অপেরা এসেছে। তার আগের রাতে 'তাড়কা বধ' পালা দেখেছে রাত জেগে। মাথার উপর কত রকমের রংবেরঙের ঝাড়-লণ্ঠন, পেট্রোম্যাক্সের আলো— যেন বাচ্চু ভাবতেই পারেনি, সাদা ফরাশে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখা হবে। বাবার সঙ্গে ইন্দু যাবে যাত্রা দেখতে— কেউ বাধা দেবার নেই। ইন্দু সারাক্ষণ কেবল কেঁদেছে। যাত্রা দেখে এভাবে কেউ কাঁদে! তার যে মাঝে মাঝে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠেনি তাও নয়। কিন্তু ইন্দু পরি হলে কখনওই কাঁদতে পারত না। পরিরা আর যাই করুক কাঁদে না। তারা শুধু পাখা মেলে নাচে গায়, সাদা-রাজহাঁস উড়ে যায় তাদের মাথার উপর দিয়ে, আর বরফের কুচি। সাদা রং ছাড়া পরিরা অন্য রং পছন্দ করে না। বাবুদের প্রাসাদের মাথায় অজস্র শ্বেতপাথরের পরি দেখে এমন মনে হয়েছিল তার।

তাকে কে চুপিচুপি ঠেলছে।

চোখ মেলে তাকাতেই অবাক। ইন্দু!

পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, গায়ে সাদা শাটিনের ফ্রক— সে কেবল বলছে, 'বাচ্চু, শিগগির ওঠ। পরি দেখবি। জ্যান্ত পরি দেখবি। সুপারির বাগানে জ্যান্ত পরি নেমেছে। ওঠ বাচ্চু।' প্রায় কুমির কিংবা জ্যান্ত বাঘ কাছারিবাড়ির উঠোনে হাজির এমনই বিস্ময় ছিল বাচ্চুর চোখে-মুখে। সে কোনওদিকে তাকায়নি। লম্বা ফরাশে বাবা, দাদারা ঘুমোচ্ছে। সে ওদের টপকে বের হয়ে ইন্দুর পেছনে ছুটেছিল।

খাজাঞ্চিখানার কাছে এসে একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল বাচ্চু। কেউ না টের পায়। বাবা, দাদারা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। রাত জাগরণ গেছে। বৃষকেতু পালা দেখতে হলে রাত জাগরণ হবেই। যে-যার মতো ঘরে ঘরে ঘুমোচ্ছে। কে কোথায় যাচ্ছে দেখার নেই। বাবুর বৈঠকখানায় দেবেন বারান্দায় বসে ঝুলন পাংখা টানতে টানতে ঢুলছে। সব কেমন সুনসান। পাঠশালার বারান্দায় গামছা পেতে বাঞ্ছাঠাকুর, রাম সিং ঘুমোচ্ছে। যেন বাচ্চু একটা ঘুমের রাজ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কেউ জেগে নেই— একটা কাক-পক্ষীও না।

আর দস্যি মেয়েটা ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে সুপারির বনে ঢুকে পরি হয়ে গেল।

চোখ খুলে দেখেছে, পরি নেই, পরি উবে গেছে। পরি উধাও।

সুপারির এত বড় বনে সে কোনওদিন ঢোকেনি। যেদিকে দু'চোখ যায় সুপারি গাছ। কোনদিকে গেলে সে ফেরার রাস্তা পাবে বুঝতে পারছিল না। ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে গেছে। অচেনা, অজানা জায়গা, সে কাছারিবাড়ি থেকে একা বের হয় না। হলেও নদীর পাড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। সদর রাস্তায় অপরিচিত সব লোকজন দেখলেই ভয়। কার মনে কী আছে কে জানে! আলখাল্লা-পরা মানুষ যায়, মাথায় লাল টুপি, গায়ে সিল্কের জামা, পরনে লুঙ্গি, মুখ-ভরতি দাড়ি-গোঁফ মানুষ যায়, বোরখা-পরা ছদ্মবেশী যায়। তার চেনাজানা জগতের বাইরে সে কোনওদিন যায় না। গেলেও দাদারা থাকে, না হয় পঞ্চুকাকা থাকে। রাত হলে একা ঘরের বার হতে পর্যন্ত ভয় পায়— অদৃশ্য আত্মার। কোথায় কীভাবে কী উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়বে কে জানে! রাতে নিশির পাল্লায় পড়ে কত লোকের জান গেছে। সেই বাচ্চুকে এমন একটা সুপারির বনে ফেলে দস্যি মেয়েটা পরি হয়ে উবে চলে গেল। মায়া-দয়া নেই! রাগে-ক্ষোভে তার চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছিল। সে সুপারির বনে গলা ছেড়ে ডাকছিল, 'ইন্দু, তুই পরি হয়ে কোথায় উড়ে গেলি! আমি ফিরব কী করে! তোর মায়া-দয়া নেই! আমাকে চোখ বুজতে বললি, চোখ বুজলাম, আর চোখ খুলে দেখি তুই নেই। পরি হয়ে উড়ে গেলি।'

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

হাওয়ায় গাছের মাথাগুলি দুলছিল, উপরে আকাশ আর মেঘমালা ভেসে যাচ্ছিল। অজস্র গাছের ফাঁকে যে আকাশটুকু চোখে পড়ছিল, অবাক, একটা ছোট্ট পরি সত্যি ভেসে চলে গেল। শরতের আকাশে ছিন্ন সাদা মেঘ কোন তেপান্তরে যাবে বলে বের হয়ে পড়েছিল বাচ্চুর সঙ্গে, তাই কখনও সাদা রাজহাঁস অথবা কখনও বালিকা হয়ে আকাশে ভেসে যেতে যেতে আড়ালে চলে গিয়েছিল।

৩

বাচ্চু তো তখন ছোট।

তার সব বিশ্বাস হয়, এই মেঘ বৃষ্টি ঝড় যেন কোনও এক জাদুকরের অদৃশ্য হাত। সে ভূগোল বইয়ে পড়েছে, পৃথিবী গোল। পৃথিবী সৌরমণ্ডলের গ্রহ। সূর্যের চারদিকে ঘোরে। দাদাদের বইয়ে আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি কীসব লেখা আছে। এত কিছু জানা সত্ত্বেও সে বিশ্বাস করে না বইয়ে ঠিক কথা লেখা থাকে। বরং সেই অনন্তনাগ বসুমতীকে মাথায় ধারণ করে আছে, তার কাছে বেশি সত্য। ভূমিকম্প হলে বড়পিসির এক কথা, 'আর পারছে না। মহাকালের বয়স বাড়ছে। আর কতকাল বসুমতী মাথায় নিয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে মহাকাল। কষ্ট হয় না! তা একটু নড়ানড়ি করবেই। পৃথিবী দুলবে, বেশি কী।'

সেই বাচ্চু কী করবে সেদিন সত্যি ভেবে পাচ্ছিল না। সোজা দৌড়াতেও পারে না। গাছগুলো এত ঘন যে এঁকেবেঁকে দৌড়াতে হবে। কিন্তু কোনদিকে! কোনদিকে সে যাবে! কোনদিকে গেলে নদী, কাছারিবাড়ি সে পাবে বুঝতে পারছে না। সে একবার চেষ্টা করে দেখল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বনটা থেকে বের হওয়া কত কঠিন, কিছুটা এঁকেবেঁকে ছুটে গিয়েই টের পেয়েছে। পায়ের তলায় সুপারি পড়ে যায়, হড়কে যেতে হয়। দু'বার আছাড় খেয়েছে। হাঁটু জখম। আর দেখছে সামনে সুপারির বন আরও ঘন। সুপারি গাছগুলি তার চারপাশে যেন পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা গাছগুলি তাকে নিয়ে মজা করছিল। একটা গাছ কোথা থেকে হা হা করে হেসেও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সে থমকে দাঁড়াল। কোন গাছটা তাকে মশকরা করছে! সে প্রাণপণে ডাকছে, 'ইন্দু, ফিরে আয়। ইন্দু, তুই পরি হয়ে চলে গেলি! আমি ফিরব কী করে! বাড়ি ফিরে কী বলব! ইন্দু কোথায়, বললে, কী বলব।'

মাঝে মাঝেই বনের অদৃশ্যলোক থেকে নকল গলায় কে কথা বলছে, 'দেবীকে আজ্ঞে-আপনি না করলে এই হয়।'

'কে, কে!'

আর নেই।

'কে, দেবী।'

গাছগুলো আর জবাব দেয় না।

পরিরা কি কখনও দেবী হয়?

বাচ্চু অগত্যা বলেছিল, 'আপনি তো দেবী নন, পরি।'

আর তখনই আবার হাসি।

বাচ্চু তাকায়। কিন্তু কোথা থেকে কে কথা বলছে বুঝতে পারে না। কখনও মনে হয় ডানপাশ থেকে, কখনও বাঁ-পাশ থেকে, আবার কখনও ঠিক তারই পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

এমন একটা ভূতের অদৃশ্য রাজ্য বাচ্চু আর কোথাও আবিষ্কার করতে পারেনি।

সে বলেছিল, 'দেবী, আজ্ঞে-আপনি করলে যদি আপনি খুশি হন তাই হবে। আমাকে বন থেকে বের করে নিয়ে যান। দেবী, দেখুন, গাছের মাথায় আর রোদ নেই। আমি কোনদিকে যাব বলে দিন। কোনদিকে গেলে মালিবাগানের পাঁচিল পাব, কোনদিকে গেলে নদীর পাড় পাব, কোনদিকে গেলে পিলখানার হাতি দেখতে পাব, বলে দিন। আমি সেখানে গেলেই কাছারিবাড়ি ফিরে যেতে পারব।'

'যেতে পারবি তো ঠিক?'

'কে! কে!'

বাচ্চু দেখে কেউ নেই। শুধু অজস্র সুপারি গাছ সামনে পেছনে। দু'-একটা বাদুড় উড়ে আসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। সে যে কী করে!

কারও সাড়া নেই। কে, কে করলে আর কেউ সাড়া দেয় না।

বাচ্চু সত্যি কেঁদে ফেলল, 'হ্যাঁ, বলছি তো যেতে পারব। বলছি তো আজ্ঞে-আপনি করব।' বলে জামার খুঁটে চোখের জল মুছে তাকাতেই দেখল, ইন্দু সামনে দাঁড়িয়ে।

'এত বোকা তুই, ফ্যাকফ্যাক করে কাঁদছিস!' সহসা বাচ্চু খেপে লাল! মুহূর্তে তার সব ভয় দূর। সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আছড়ে খামচে ইন্দুকে ফালা ফালা করে দেবে বলে। কিন্তু নাগাল পেল না। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ইন্দু ছুটে যাচ্ছে।

বাচ্চু আবার ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ইন্দু যদি না হয়, যদি ইন্দুর বেশে পরি নেমে এসে থাকে। তার সঙ্গে যদি মজা করার জন্য ইন্দুর বেশে তাকে ডেকে নিয়ে যায়, নিশি-পাওয়া মানুষের কত গল্প শুনেছে পঞ্চুকাকার মুখে। নিশিতে পেলে মানুষের শেষে কী দুর্গতি হয় তাও সে জানে। ছাদের কার্নিশে যেসব পরি থাকে, তারা সত্যি যদি গভীর রাতে সেই বরফের দেশে উড়ে চলে যায়, আবার সকাল হলে ছাদের কার্নিশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, থাকতেই পারে, আর যদি পরির নজর লেগে যায়, নজর লাগতেই পারে। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। সে আর নড়তে পারছে না।

চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছিল বাচ্চু। তার আর এক পা বাড়াবার শক্তি নেই। সে পড়ে যেতে যেতে একটা গাছ ধরে ফেলেছিল। তারপর আচ্ছন্নের মতো গাছের নীচে বসে পড়লে ইন্দু সামনে এসে হাজির। তার হাত ধরে টানছে।

'কী হয়েছে তোর?'

বাচ্চু ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

ইন্দুর মুখ শুকনো।

'আরে, তুই বসে থাকলি কেন? ওঠ ভাইটি, ওঠ। আমি ইন্দু। সত্যি বলছি, ইন্দু। আমি পরি না।'

'তুই কোথায় ছিলি!'

ইন্দু বলল, 'ওঠ আগে। শিগগির ওঠ। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। কী বলবি তখন?'

বাচ্চুর কেমন সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ ফিরে এসেছিল। সে বলেছিল, 'ইন্দু তুই পরি হয়ে কোথায় উড়ে গিয়েছিলি বল! আকাশের নীচে তোকে আমি দেখেছি। ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছিস।'

'পরে বলব। এখন আয় তো।'

বাচ্চু আর কোনও প্রশ্ন করতে পারেনি। সে ইন্দুর পেছনে অনেকটা পথ দৌড়ে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আশুবাবুর জমিদারি-সংলগ্ন এমন বিশাল একটা সুপারিবাগান থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি। চারপাশের ফুল-ফলের বাগান, দিঘি, নদীর পাড় আলোর বর্ণমালায় সহসা

যেন ভরে গেছে। গ্যাসের লাল-নীল বাতি জ্বলে উঠেছে। মেজ তরফের ছোটবাবু ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন।

ইন্দু তার হাত ধরে টেনে একটা ঝাউগাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। ইন্দুকে একা সাঁঝবেলায় এই নদীর পাড়ে দেখলে ছোটবাবু ঘাবড়ে যেতে পারেন, ধমক দিতে পারেন— এই ভেবেই হয়তো ইন্দু তাকে গাছের আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘোড়া লাল রঙের। কদম দিচ্ছে। তারপর স্টিমারঘাটের দিকে কদম দিতে দিতে ঘোড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। নদীর পাড়ে গ্যাসবাতির রহস্যময়তা এবং লাল রঙের ঘোড়াটা মুহূর্তে ইন্দু সম্পর্কে সব আগ্রহ মুছে দিল। বাচ্চু গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে ঘোড়াটা যতদূর যায় চুপি দিয়ে দেখছিল।

তারপর যখন ঘোড়াটা আর দেখা গেল না, সে গাছের পাশে এসে ইন্দুকে খুঁজছিল।

নেই।

মুহূর্তে হাওয়া।

সে আর একদণ্ড দেরি করেনি। নদীর পাড় ধরে কিছুটা গেলেই কাছারিবাড়ি। সে কোনওদিকে আর তাকায়নি। ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে। আরতি শুরু হয়ে গেছে হয়তো। ঠিক বাবা তাকে খুঁজতে বের হয়ে যাবেন। অচেনা জায়গা, নদীনালার দেশ, বনজঙ্গল আর প্রকৃতির আকর্ষণের তো শেষ নেই— কিংবা বাচ্চু যেদিকে তাকাত কেমন সেই এক ঘোর— কত বড় নদী, কত বিশাল নদীর চড়া, নদীর পাড়ে কত উঁচু মঠ, আর ছবির মতো সাজানো ফুল-ফলের গাছ। পিলখানার হাতি, লাল রঙের ঘোড়া, নদীতে বর্ষায় কুমির পর্যন্ত ভেসে আসে। বড় কাচের ঘরে দু-দুটো কুমিরের চামড়া আশুবাবুর চিড়িয়াখানার পাশে। হরিণ, ময়ূর, চিতাবাঘ পর্যন্ত আছে। ইন্দু বলেছিল, কুমিরের ডিম খুঁজতে যাবে। যেন ইন্দুর ইচ্ছে, পারলে একটা কুমিরই ধরে আনে। কারণ সে-বছর নদীর জলে বর্ষায় কুমির এসে গেছে বলে রব উঠে গিয়েছিল।

তা এত বড় নদীতে কুমির ভেসে আসবে না তো গো-সাপ ভেসে আসবে! রামসুন্দর পেয়াদা নদীতে যে সত্যি কোনও বর্ষায় কুমির ভেসে আসে ইন্দুর সঙ্গে তাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আশুবাবুর জাদুঘরে দুটো কুমিরের

বিশাল চামড়া দেখে বাচ্চু আর অবিশ্বাস করতে পারেনি।

আসলে এইগুলিই তাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল— প্রায় বলতে গেলে চোখ বুজে ছুটছে। সবটাই ঘোর, ইন্দু এই আছে এই নেই!

আর কাছারিবাড়ি ফিরে সে অবাক। সবার সঙ্গে ইন্দু দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দুই বলল, 'খুড়ামশাই, ওই যে বাচ্চু আসছে।'

বাচ্চুর যে কী রাগ হচ্ছিল!

ইন্দু যেন তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান! ইন্দু কেমন বিস্ময়ের গলায় বলেছিল, 'কোথায় গেছিলি!' যেন কিছু জানে না।

কী বলছে মেয়েটা!

সে ইন্দুর সঙ্গে একটা কথা বলেনি।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'অচেনা জায়গায় হারিয়ে যেতে পারতে। আমি তো ভেবেছি তুমি ইন্দুর সঙ্গে ভেতর-বাড়িতে আছ! কোথায় গেছিলে! সবাই তোমাকে খুঁজছে!'

বাচ্চু ক্ষোভে-দুঃখে কথা বলতে পারছে না। এটা তার হয়। রেগে গেলে কথা বলতে গেলে তোতলায়। সেজন্য সে রেগে গেলে কথা বলতে পারে না। কোনও কথাই একসঙ্গে গুছিয়ে তখন বলতে পারে না! শুধু তোতলাতে থাকে।

সে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল। না, কারও সঙ্গে কথা বলবে না। বলতে পারত, ইন্দু আমাকে সুপারি বনে পরি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ইন্দু পরি হয়ে উড়ে গিয়েছিল।

ইন্দু যদি অস্বীকার করে!

করতেই পারে।

সে তো তার সঙ্গে নাও যেতে পারে। অন্য কেউ তাকে ডেকে নিয়ে যায় যদি। ইস, কী মিথ্যুক খুড়ামশাই, আমি কখন তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম! ইন্দু এমন বললে সে চোখে সর্ষেফুল দেখবে।

না, বাচ্চু তার মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ইন্দু কতরকমের কথা বলছে, এভাবে একা যাস না! জানিস না নদীর চরে কুমির হেঁটে বেড়ায়। ছোটদের পেলেই হালুম করে খায়।

বাবুমশাই বৈঠকখানার বারান্দা থেকে হাঁকলেন, 'ভূষণ, বাচ্চুকে খুঁজে পেলে?'

ইন্দু দৌড়ে বাবার পিঠে ঝুঁকে বলেছিল, 'জানো বাবা, বাচ্চু না কোথায় গেছিল কিছু বলছে না।'

ইন্দুর দাদারাও তাকে গালাগাল দিচ্ছিল, 'কী বাঁদর রে তুই! কোথায় গেছিলি! বলছিস না কেন? খুড়ামশাই বারবার নদীর চড়ায় নেমে যাচ্ছে, সুকুমার গেছে পিলখানার হাতির কাছে। কোথাও তুই নেই! গেছিলি কোথায়?'

বড়দা ফিরে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। এসেই বলেছে, 'না, স্টিমার ঘাটে নেই। পুরনো বাড়িও যায়নি!'

বাবা বলেছিলেন, 'ফিরে এসেছে।'

'কোথায় গেছিল?'

'কিছু বলছে না। তোমরা আর কিছু বলতে যেয়ো না। গুম মেরে আছে।'

বাচ্চু কী বলবে, সে তা জানে না, সত্যি তাকে ইন্দু ডেকে নিয়ে গেছে, না কোনও ছোট্ট পরি! এই একটা ধন্দে পড়ে সে যে চুপ মেরে গেছে— ইন্দুর উপর খেপে গিয়েও আবার ভাবছে, যদি সত্যি ইন্দু না যায়! সে কিছুই বলতে পারছে না।

হঠাৎ বাবুমশাই ডেকেছিলেন, 'বাচ্চু, এদিকে আয়।'

কার আর সাহস আছে না যায়! বাবা পর্যন্ত ডাক পড়লে, 'আজ্ঞে, যাই হুজুর' বলেন! যদিও আত্মীয় সম্পর্ক আছে এই জমিদারবাবুর সঙ্গে তাদের— তবু জমিদারি আদবকায়দা মানতে হয়। ইন্দুর মাকে সে জেঠিমা ডাকে। ইন্দুর দাদাদের সে মেজদা বড়দা ডাকে। কেবল ইন্দুকেই সে মান্য করে না।

বাচ্চু দূর থেকে দেখল বৈঠকখানায় বেতের ইজিচেয়ারে তিনি কোঁচানো ধুতি, সিল্কের শার্ট, পায়ে কালো চটি পরে বসে আছেন, যেন বেড়াতে বের হবেন। সামনে পেছনে পাইক থাকে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে বের হলে। বাচ্চু আরও অবাক হয়, কোনও সময় বাবুমশাইকে সে পাটভাঙা ধুতি শার্ট ছাড়া দ্যাখেনি। এমনকী এ-বাড়ির বড়দা মেজদারাও এ-বেলা ও-বেলা

পাটভাঙা ধুতি-শার্ট গায় দেয়। বাবুমশাইয়ের সাদা গোঁফ। মাথায় সাদা চুল, মাথার উপর কোনও অদৃশ্য লোক থেকে কেউ গোপনে টানা পাখায় হাওয়া করছে। বিশাল দশাসই এমন একজন গম্ভীর মানুষকে দেখলে এমনিতেই হৃৎকম্প শুরু হয়। তাকে তিনি ডাকছেন। সে কাঁপছিল। কেমন শীত শীত করছিল তার।

সে হয়তো ভয়ে মূর্ছা যেত। বাবুমশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে পরির নজরে পড়ে যাওয়া শতগুণে ভাল।

আর তখনই, কী এক জাদুমন্ত্রে সে নিমেষে নিজেকে ফিরে পেয়েছিল। চাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল।

'বেশ করেছিস। এখন দেখবারই বয়স। কোথায় কোথায় ঘুরলি বল!'

বাবুমশাইয়ের 'বেশ করেছিস' এই কথায় তার সব ক্ষোভ, অভিমান জল হয়ে গিয়েছিল।

সহজেই বলে ফেলেছিল, 'আমাকে তো ইন্দু ডেকে নিয়ে গেল।'

'কী মিথ্যুক! কখন তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম! না, আমি কিচ্ছু জানি না। বাচ্চু মিছে কথা বলছে।' ইন্দু তাকে তেড়ে এসেছিল।

'তুই যে বললি, চল পরি দেখবি!' বাচ্চুও ছাড়বার পাত্র নয়।

'ও মা! কী বলছে, তুই বানিয়ে বানিয়ে এত মিছে কথা বলিস! কখন বললাম, কখন, বল!'

বাবুমশাই কী ভাবলেন কে জানে, 'ঠিক আছে— তোমরা দু'জনেই সত্য কথা বলছ। কী হল তো? তুমিও যাওনি, বাচ্চুও তোমাকে দেখেছে সঙ্গে যেতে।'

বাচ্চু হতবাক। এটা কী করে হয় সে বুঝতে না-পেরে বোকার মতো তাকিয়েছিল।

বাবুমশাই বলেছিলেন, 'সারাটা বিকেল ঘুরে বেড়ালি বাচ্চু, ঘুমালি না, আজ রাতে কত সুন্দর পালাগান আছে জানিস। দেখবি কী করে! কেবল তো ঘুমে ঢুলবি।' তারপরই রামসুন্দরের খোঁজ। বুড়োমানুষ, খাকি উর্দি গায়ে থাকে। একসময় ডাকসাইটে পাইক ছিল বাড়ির, বুড়ো হয়ে যাওয়ায় ছোড়দিমণির সকাল-বিকালের পাহারাদার।

বাঙ্কুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এবার গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে।' বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, 'ওকে কিছু বোলো না। ছেলেমানুষ, ঘুরবেই তো। তোমাদের মতো নাক ডাকিয়ে সে ঘুমাবে কেন!'

বাবুমশাইয়ের খাসবেয়ারা এসে খবর দিল, রামসুন্দর মঠের চাতালে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। সামান্য নেশাভাঙের অভ্যেস আছে। দেবী এসেছেন ধরায়— মা আনন্দময়ী, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে— এ-সময় একটু বেচাল কেই-বা না হয়। তা ছাড়া পালা দেখার জন্য রাত্রি জাগরণ। কী বুঝে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, ডাকতে হবে না। বাঙ্কু, তুই আমাদের সঙ্গে দশেরার মেলায় যাবি। কী, ইন্দুর কী মত?'

'হ্যাঁ, বাবা। বাঙ্কু আমাদের সঙ্গে দশেরার মেলায় যাবে। জানো বাবা, বাঙ্কুটা না বোকা। কী বোকা না বাবা, লক্ষ্মীর কাছে যেতেই চায় না!'

'ভারী বোকা!' আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্কু ইন্দুর উপর কী কারণে যে খেপে গেল কে জানে! সে বলেছিল, 'আমি যাব না।'

'তোর ঘাড় যাবে। যাবে না! দেখেছ বাবা তোমার কথা অমান্য করে! কী সাহস!'

বাবুমশাই হাসলেন। ভারী পরিতৃপ্ত হাসি। জীবনে এই সুসময় মানুষ একদিন পার হয়ে চলে যায়— তারপর তো সারাজীবন রুক্ষ মাঠ, দাবদাহ, জটিলতা। এমন এক ভীরু বালকের ছবি জীবনে কার না পকেটে আছে।

তিনি কী ভেবে বলেছিলেন, 'আমি বললে ঠিক যাবে। কী রে, যাবি না? তোর জেঠিমা, আমি, তুই, ইন্দু, হাতির পিঠে চড়ে দশেরা দেখতে যাব। তুই, ইন্দু মেলায় ঘুরে বেড়াবি। বিন্নির খই, লাল বাতাসা খাবি— কী মজা, না রে। আমি তো দিদির হাত ধরে মেলায় গেলেই বিন্নির খই, লাল বাতাসা খেতাম,' বলে তিনি চোখ বুজে গড়গড়া টানতে থাকলেন।

কে কী বুঝল বাঙ্কু জানে না। সবাই ধীরে ধীরে সরে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল বাঙ্কু কাছারিবাড়ির বারান্দায় উঠে একবার দেখেছিল, তিনি গড়গড়া তেমনই নিবিষ্ট মনে টানছেন।

৪

এবারে পূজার নাও আবার আসছে। সে পরপর তিনবার পূজায় নাও এলেই লুকিয়ে পড়ত। তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। বড়পিসি বলতেন, 'ও যাবে না। দুগ্গা দুগ্গা বলে রওনা হয়ে যাও।'

কিন্তু এবারে বড়জ্যাঠা তাকে ডেকে বললেন, 'কী রে, যাবি তো? না, আবার পালাবি? ভয় কী, বড় হয়ে গেছিস!'

সে কিছুই বলতে পারছে না। পূজার ছুটি হয়ে গেছে। মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত তাদের পড়া থেকেও ছুটি। এ-সময় কেউ পড়াশোনা করলে দেবী ক্ষুণ্ণ হন। বড়পিসির এক কথা, 'ক'টা দিন না-পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। দেবীর কোপ বড় না পড়াশোনা বড়, বুঝি না। পরীক্ষায় পাশফেল তাঁর হাতে। পড়ে তোমরা ঘণ্টা করবে!'

পড়াশোনা করে ঘণ্টা বাজানোর চেয়ে পড়াশোনা না-করে ঘণ্টা বাজালে আফশোস থাকে না। বড়জ্যাঠাও এ-ব্যাপারে পিসির সাম্রাজ্যে নাক গলাতে চান না। লক্ষ্মীপূজার পরদিন কলাপাতায় দেবদেবীর নাম লিখে আবার পড়তে বসা। পূজার ছুটি শেষ হলেই বার্ষিক পরীক্ষা। এই একটা উচাটন আছে বাচ্চুর। পূজার আনন্দই মাটি। গৃহশিক্ষক ফিরবেন পূজা শেষ করে। লক্ষ্মীপূজার পর বড়জ্যাঠা তাদের নিয়ে বসেন। বাচ্চুর ক্লাস এইট। সে বড় হয়ে গেছে! চার বছর আগে সে যা ছিল, কিংবা দেবী যা ছিলেন, তারা আর তা নেই।

বড়জ্যাঠা বৈঠকখানার বারান্দায় প্রায়-সময় বসে থাকেন। শহর থেকে আসার সময় কিছু বই সঙ্গে আনেন। বাড়ির কাজ-কামের ঝামেলায় তিনি থাকেন না। তবে তিনি কোনও বিষয়ে একবার সিদ্ধান্ত নিলে, আর কারও সাধ্য থাকে না তা থেকে নড়াবার। বাচ্চুর কাছে তার বড়জ্যাঠা কোমলে-কঠোরে আশ্চর্য এক মানুষ। কথা কম বলেন। তারা ছুটির দিনগুলিতে এমনিতেই একটু বেশি চনমনে হয়ে ওঠে— যেমন, বর্ষায় নৌকা নিয়ে বিলে ভেসে যাওয়া, কিংবা ধানের জমিতে নৌকা ঢুকিয়ে, কোথায় কতদূরে ধানগাছ কীভাবে নড়ে দেখার আনন্দই আলাদা। বাতাসে নড়ে, না গাছের গোড়ায় মাছের নড়ানড়ি! তারা মাছ শিকারে গেলে মাছ আছে কি নেই টের পায় ধানগাছের

নড়ানড়ি দেখে। বিলেন জমিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আর পঞ্চুকাকা শিকারি বাঘের মতো হুঁশিয়ার— তার মতো মাছ-শিকারি এ-অঞ্চলে খুব কমই আছে; একবার তো সেই এক বিশাল ঢাইন মাছের পাল্লায় পড়ে তাদের বিলের জলেই রাত কাটাতে হয়েছিল। এক-হলায় মাছ গেঁথে ফেলেছে ঠিক, কিন্তু কবজা করা যাচ্ছে না। বাচ্চু নৌকায়। বড়দা, মেজদাও নৌকায়। বিলের জল গভীর, যেন এখানেই রাবণরাজার পাতালপ্রবেশ ঘটেছিল! আর কী কালো জল! যতদূর চোখ যায় কালো জল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। মাছেরা ধানখেতে শ্যাওলা খেতে উঠে আসে। অজস্র পোকামাকড়, মাছেরা টুপটাপ ধরে খায়। তারা কী করে বুঝবে, পঞ্চুকাকার মতো জাঁদরেল শিকারি ঘাপটি মেরে বসে আছে বিলের ঠিক কিনারে।

সেই পঞ্চুকাকাও জ্যাঠাকে দেখলে কাবু।

জ্যাঠার অনুমতি ছাড়া সে শিকারেও যেতে পারে না।

জ্যাঠার অনুমতি ছাড়া নৌকা ঘাট থেকে ভাসাতে পারে না।

জ্যাঠার কথাতেই তাদের মতো বিচ্ছুদের নিয়ে মাছ-শিকারে যেতে হয়েছিল। বড়দা বায়না ধরেছিল, পঞ্চুকাকার সঙ্গে যাবে। পঞ্চুকাকার এক রা, 'না।'

বড়দা আর কী করে, 'এই বাচ্চু, যা না, বড়জ্যাঠাকে গিয়ে বল।'

বাচ্চু বলতেই হাঁক, 'এই পঞ্চা!'

'আজ্ঞা যাই।'

'যাবি যখন এদের নিয়ে যা।'

জলে ভেসে গেছে দেশ। হা-ডুডু খেলাও যায় না, উঠোনে যে জায়গা আছে— ভেতর কি বার-বাড়ির সব জায়গায় হয় পাট, না-হয় পাটকাঠির আঁটি। সারা দিনমান পাট শুকানো, পাটকাঠি শুকানো, বৃষ্টি এলে সব তোলা। এসব কাজ শেষে পঞ্চুকাকার মাছ-শিকার। দয়ালকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে শিকারে বের হতে চেয়েছিল— কিন্তু বাধ সাধল বড়দা। সে বলেছিল, যাবে। সুতরাং আর কী করা!

বড় বড় মাছ যা-সব নদী-নালা থেকে উঠে এসেছিল তারাও আবার বড় গাঙে ফিরে যাবে। জলে টান ধরলেই, জল পচে যায়। মাছেরা খাবি খায়

পচা জলে, বিলের সর্বত্র মাছেরা ভেসে বেড়ায়। জোর বৃষ্টি হলে আবার কী হয় কে জানে, মাছেরা তখন ভেসে থাকে না, নদীতে জলের নীচে পাখনা নাচিয়ে নেমে যায়। পঞ্চুকাকা সব খবর রাখে। এত গভীর জলে মাছ-শিকারে যেতে সাহস পায় পঞ্চুকাকা আর তারকমাঝি। পঞ্চুকাকা সেবারে মাছ গেঁথে বিষম বিপাকে পড়ে গেল। কে জানে, এই গভীর বিলের তলায় কী আছে, কে না আছে! বড় নদী মেঘনা বিলের উপর দিয়ে চলে গেছে। কার কোন ভগ্ন রাজপ্রাসাদ পাড় ভেঙে ফেলে রেখে গেছে জলের তলায়, সেখানে কারা বসবাস করে জানা যায় না। মাছ-শিকারের নেশায় কত শিকারি জান দিয়েছে। মাছটার রুপালি বরন, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাঁ করলে একটা আস্ত মানুষ গিলে খেতে পারে। সাধ্য নেই কেউ কবজা করে। বিলের জলে টান ধরলেই মাছটা লেজ তুলে ভেসে বেড়ায়— কত শিকারি মাছটার খোঁজ পেয়ে ছুটে গেছে এক-হলায় গেঁথে তুলতে— পারেনি। জান গেছে, না-হয় পাগল হয়ে গেছে।

বাচ্চুদের ভয় ছিল সেই মাছটাই পঞ্চুকাকা গেঁথে ফেলল কিনা। গরান গাছের মতো ভেসে উঠলে বুকে জল থাকে না শিকারিদের। বাচ্চুরা মনে মনে প্রমাদ গুনছিল। বড়দা চিৎকার করছিল, 'সুতো ছেড়ে দাও পঞ্চুকাকা। আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ওরে বাবা, পাহাড়ের মতো দ্যাখো জলে ঘূর্ণি উঠছে— বিশাল কোনও অপদেবতা, মাছের হতে পারে, কিংবা কুমিরের হতে পারে, সারারাত এভাবে কাঁহাতক আর পারা যায়।' কোথায় যে নিয়ে যাচ্ছে টেনে নৌকাটাকে বুঝতেও পারছে না তারা। দন্দির বাজার অনেক দূরে। লণ্ঠনের আলো জলে ভেসে গেল। কে এই সুমার বিলে লণ্ঠনের আলো নিয়ে হেঁটে যায়— আর তখনই পঞ্চুকাকা সংজ্ঞা হারাল। বাচ্চু উপায়ান্তর না-দেখে সুতো কেটে দিয়েছিল। পরদিন দুপুরে ফিরে এলে, পঞ্চুকাকার চোখ-মুখ দেখে জ্যাঠা বলেছিলেন, 'কী রে চোরের মতো মুখ চুন করে রেখেছিস কেন! গেলি শিকারে, ফিরে আসার কথা সাঁজ লাগলে, ফিরলি রাত পার করে! কী হয়েছিল? না একটা মাছ, না কচ্ছপ।'

সব শুনে বড়জ্যাঠা বলেছিলেন, 'বিলের সেই ঢাইনমাছের পাল্লায় পড়েছিলি? ওটা ধরে কার সাধ্য। কেন যে যাস, বুঝি না। যাক, রক্ষা পেয়ে

গেছিস, সেই ভাগ্য।' পরদিনই গৃহদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ভোগ রান্না হল। ব্রাহ্মণভোজন করালেন বড়পিসি। একমাত্র তাঁরই কৃপায় বিলের অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এইসব বিলে, কিংবা কোনও প্রাচীন অশ্বত্থের নীচে, জীর্ণ মঠ কিংবা মন্দির যে ভাল জায়গা নয়, সব দুষ্ট আত্মারা গোপনে ঘোরাফেরা করে, পিসি মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করেন। বাচ্চুরও ভাল লাগছিল না, ওটা কী তবে— গরান গাছের মতো একবার ভেসে উঠল, আবার ডুবে গেল— যেন তাদের দেখিয়ে দিল সে কে?

এইসব ঘটনাপ্রবাহ থেকেই বাচ্চু নিজের মতো এক পৃথিবী গড়ে তুলেছে।

তাই জ্যাঠা কী বুঝে যে বললেন, 'পূজায় নাও আসবে, এবারে আর লুকিয়ে থাকিস না।'

বিলের জলে মাছ-শিকার করতে গিয়ে তার সাহস বেড়েছে। নয়তো পঞ্চুকাকার আগে তার মূর্ছা যাবার কথা! সে বলেছিল, 'দেখি।'

দেখি কি আর সাধে বলা! ইন্দু তাকে গেলে কী মজা দেখাবে কে জানে। সেই ভয়েই যায় না।

আবার ইন্দুর জন্য পূজার ক'টা দিন তার মনও খারাপ থাকে।

৫

দশেরা হচ্ছে। কত লোকজন! নৌকা। আলো জ্বলছে। নদীর চড়ায় প্রতিমা তোলা হচ্ছে। কার প্রতিমার কী সাজ, দেখে পুরস্কার বিতরণের পালা। কেউ ধুনুচি-নৃত্য করে রুপোর মেডেল পেল। কোথাও জিলিপি ভাজা হচ্ছে। কোথায় রঙিন ঝুঁমঝুমি খেলনা পাওয়া যায়— ছোটো। কাঠের হাতি কেনা যায়। কোথাও বাজি পুড়ছে। বাবুমশাইরা চেয়ারে বসে আছেন— উপরে শামিয়ানা টাঙানো। বুকে ব্যাজ লাগিয়ে ভলান্টিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবুদের পাইক পেয়াদা সব উর্দি পরে বন্দুক হাতে সারা মেলা পাহারা দিচ্ছে। আর বাজি পুড়ছে। কতরকমের হাউই-বাজি, কোনওটা উপরে উঠে মন্দির হয়ে

গেল। কোনওটা দেবী প্রতিমা হয়ে গেল। আবার বাচ্চুর মনে হয়েছিল, ওই যে হাউই উড়ে যাচ্ছে, সেটা আর নেমে আসবে না। আকাশে নক্ষত্র হয়ে ভেসে থাকবে।

হাতিকে সাজানো হয়েছে চন্দনের ফোঁটায়। মাথায় রঙিন রুপোর ঝালর, পিঠে জাজিম। হাতিটা নদীর চরে মেলার মধ্যে দুলছে। বিসর্জনের বাজনা বাজছে। নদীর বুকে হ্যাজাকের আলো ভেসে যাচ্ছে। প্রতিমা ভেসে যাচ্ছে। নাচ হচ্ছে প্রতিমার সামনে। ঢাকের বাজনা নদীর জল বেয়ে কোনও এক তেপান্তরের মাঠে হারিয়ে যাচ্ছিল কেবল— আর ইন্দু তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্টিমারের আলোতে তারা দু'জন নদীর পাড় ধরে ছুটছিল। রামসুন্দর-পেয়াদা লক্ষ রাখছে। ইন্দু এসে নদীর ঘাটলায় বসল। তাকে দেখলেই সবাই পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। কেউ কেউ সেলাম দেয়। কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না মেয়েটার।

এমনিতেই ধন্দ আছে মনে বাচ্চুর। তবে এত মানুষের ভিড় যে সে হারিয়ে যাবে না। কান পাতলে হাতির ঘণ্টা বাজছে শোনা যায়।

ইন্দু বলেছিল, 'আয়। বিন্নির খই কিনে খাই।'

হাতে তাদের নতুন চকচকে তামার পয়সা।

ইন্দু ফ্রকের কোঁচড়ে বিন্নির খই নিল, দু'পয়সার লাল বাতাসা।

ইন্দু তার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বলেছিল, 'চল, ঘাটে গিয়ে বসি। বাজি পোড়ানো দেখি। বিন্নির খই খাই।''

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

ইন্দুর কোঁচড়ে বিন্নির খই, লাল বাতাসা।

ইন্দুর গায়ে কী সুন্দর ঘ্রাণ।

ইন্দু একটা লাল বাতাসা কামড় দিয়ে খেল, তারপর তার দিকে লাল বাতাসা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খা। মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। খেয়ে দ্যাখ, কী ভাল না-খেতে!'

সে শুধু বাতাসা খাচ্ছিল বলে ইন্দু বলেছিল, 'বিন্নির খই খাবি না? নে, খা। এক কামড় লাল বাতাসা, এক মুঠ বিন্নির খই। নে মুখে দে। দ্যাখ, কী নরম না! মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়।'

সত্যি সে বিন্নির খই এর আগেও খেয়েছে, মেলায় গেলে বিন্নির খই লাল বাতাসা না-খেলে মেলা দেখা হয় না। চারপাশের মানুষজনের ভিড়, আর কোথাও কোনও চাঁপা গাছে স্বর্ণচাঁপা ফুটে থাকার মতো তারা দু'জনে ঘাটে বসে বিন্নির খই খেয়েছিল। আসলে ইন্দুর এমন সুন্দর ব্যবহার সে কখনও আশা করেনি। নিজে না-খেয়ে কোঁচড় মেলে ধরে বলছে, 'এই কী রে, লজ্জা কী, খা না। দ্যাখ না আমি খাচ্ছি।' তারপর কখন যে দেখল খইয়ের ভেতর একটা বাতাসা আরও নীচে পড়ে আছে! কখন বিন্নির খই শেষ টের পায়নি, কখন বাতাসা শেষ জানে না। তখনও বাজি পুড়ছিল, ঢাক বাজছিল, হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল, আরতি হচ্ছিল প্রতিমার সামনে, তারপর ঝুপঝাপ নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন— কেমন এক আশ্চর্য বিষাদে ডুবে গিয়ে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

শেষে সেই ইন্দু এমন উপদ্রব শুরু করে দিল যে, ভাবা যায় না। ইন্দু তাকে নিয়ে কী করতে চায়, সে বুঝতে পারত না। ইন্দু যেমন লাল বাতাসা বিন্নির খই খাইয়ে তাকে মজা পেত, আবার তাকে ডিগবাজি খাইয়েও মজা পেত।

'কই বাচ্চু! কোথায় গেলি!'

বাচ্চু বাবার পাশে লুকিয়ে আছে।

'বাচ্চু, দেখে যা।'

বাচ্চু বাবার বিশাল তক্তাপোশের নীচে ঢুকে বসে আছে।

'মেজদা, বাচ্চুকে দেখেছ!'

কাছারিবাড়িতে ঢুকে ইন্দু এ-ঘর ও-ঘর উঁকি দিত।

'খুড়ামশাই, বাচ্চু গেল কোথায়? সকাল থেকে দেখছি না। শৈলমাসি বসে আছে।'

বাচ্চু জানে কেন বসে আছে।

সকালবেলায় সুগন্ধ আতপ চালের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ ভাজা— বাবার বউঠানের অন্দর-লাগোয়া ঘরে বাল্যভোগের ব্যবস্থা। পইতা হলে তিনবেলা অন্ন গ্রহণ নিষেধ। কচিকাঁচারা, বিশেষ করে যাদের পইতা হয়নি তারা সকালে সেই শ্বেতপাথরের মেঝেয় বসে বাল্যভোগ সারে। ইন্দুর পাশে বসে সে খায়। ইন্দুটা তখন তার মাছ বেছে দেবে— যেন সে মাছ বেছে খেতে জানে

না। কী যে রাগ হত। জেঠিমা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'ও নিজেই পারে। তোর আর পাকামি করতে হবে না।'

কে শোনে কার কথা। সে ক্লাস ফোরে পড়ে। সে দাদাদের সঙ্গে বর্ষায় নৌকা করে স্কুলে যায়। শীত-বসন্তে হেঁটে যায় দেড় ক্রোশ পথ, কী রাগ না লাগে!

'এভাবে ভাত মাখে। কিচ্ছু জানিস না। ভাত ফেলছিস কেন। এই, আর খাবি না। এটুকু খেলে মানুষ বাঁচে!'

'মাছটা বেছেও খেতে শিখিসনি!'

বাচ্চুর কিছু কু-স্বভাব আছে। সে মাছ খায় ভাত খাওয়া শেষ হলে। তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার স্বভাব। ইন্দু তাকে কিছুতেই মাছ ছাড়া ভাত মুখে দিতে দেবে না। কী যে খারাপ লাগত। জোর খাটাত তার উপর।

সে সব পারে, আর ইন্দুর কাছে কিছুই পারে না। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা কাকে বলে, ইন্দুর সঙ্গে থেকে বুঝেছে। সেই ইন্দু খুঁজতে এলে, সে এক লাফে হয় আলমারির আড়ালে, নয় কাছারিবাড়ি পার হয়ে হলুদের জমিতে উবু হয়ে বসে থাকত। শত ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দিত না।

'বাচ্চু. .উ...উ!'

আর বাচ্চু!

'এই ডিগবাজি খেতে জানিস!'

বাচ্চু খুব বড় মোড়লের মতো বলেছিল, জানে।

'খা, দেখি।'

বাচ্চু একবার ডিগবাজি খেল।

'হয়নি!'

'হয়েছে।'

'হয়নি বলছি। মাটিতে মাথা ঠেকে গেল কেন। দেখবি!' ইন্দু দৌড়ে ডিগবাজি খেয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল। আবার দাঁড়িয়েই ডিগবাজি খেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল! সার্কাসে সে এমন খেলা দেখেছে। ইন্দু যে কার কাছে শিখল এসব সে জানে না। ইন্দু ডিগবাজি খেয়ে দেখাল। মঠের সামনে-পেছনে বিশাল জায়গা জুড়ে নদীর পাড়ে সবুজ ঘাসের লন। আর, দোপাটি,

টগর, বেলফুল, গোলাপ বাগান, ফাঁকে ফাঁকে বসার জন্য লোহার বেঞ্চি। বাবুমশাইয়ের বাবার চিতায় নতুন মঠে কত কারুকাজ। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। ইন্দু সিঁড়িতে লাফিয়ে উঠত। উঁচু সিঁড়ি, বাচ্চু গুনে দেখেছে, মঠের চাতালে উঠতে গেলে পনেরোটা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। তাকে নিয়ে ইন্দু সিঁড়ি ধরে উঠে যেত, সিঁড়ি ধরে নেমে আসত। চাতালে উঠলে সামনে নদীর চর, নদীর জল, বাজারে যাবার পথ, সব ছবির মতো চোখে ভেসে উঠত। ইন্দু ছাদে গিয়েও তাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পেত না। সবচেয়ে উপদ্রব তার মঠের সিঁড়িতে উঠে গেলে।

নামার সময় ইন্দু এক পায়ে দু'হাতে ফ্রক তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেত। এটা সে পারত না। ইন্দুর জেদ তাকে পারতেই হবে।

'নাম। লাফ দে। পা পড়ে যাচ্ছে কেন। এক পায়ে লাফাতে পারিস না!'

'ভয় লাগছে।'

'দ্যাখ না। ল্যাং ল্যাং খেলিসনি!'

বলে ইন্দু এক পায়ে লাফ দিয়ে নীচের সিঁড়িতে নেমে যেত। এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকত।

'কী রে, নাম না! ভয় কী! আমি পারছি কী করে!'

'না, পারব না।'

'তোর ঘাড় পারবে। পারবে না! খেতে শিখেছিস কেবল। তোর কিচ্ছু হবে না।' বলেই সে এক পায়ে লাফিয়ে নেমে গেল। যেন জোড়া ডানা থাকলে সে উড়েও যেতে পারত। এত হালকা ইন্দু। ইন্দু কি সার্কাসে খেলা দেখায়!

'দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? পা-টা তোল না। বাঁ পা। এই তো ঠিক আছে। এত ভিতু কেন রে তুই!'

কিন্তু সে কেমন আতঙ্কে পড়ে গিয়েছিল। যদি না-পারে, হাত-পা ভাঙবে। সিঁড়ির নীচে গড়িয়ে পড়লে মাথা ফাটবে। এমনকী, সে মরে যেতেও পারে। সে এক পায়ে সিঁড়ি থেকে সিঁড়িতে লাফিয়ে নামতে ভয় পাচ্ছিল।

ইন্দুকে সে যে সমীহ করে, এবং ইন্দুর কথা না-শুনলে ভোগান্তির একশেষ, বাবার কাছে গিয়ে টের পেয়েছে। বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলত ইন্দু। বাবা বিশ্বাস করতেন।

'খুড়ামশাই, বাচ্চু আমাকে ঠেলে ফেলে দিল।'

'কখন! তুই ইন্দু, বানিয়ে বানিয়ে কেবল মিছে কথা বলিস!'

'বা রে, তুই গাছ ছুঁয়ে এসে আমাকে ঠেলে ফেলে দিলি না!'

'আমি, না তুই!'

বাবার তখন গম্ভীর গলা, 'বাচ্চু, ইন্দু তোমার দিদি হয়। বয়সে বড়। তাকে তুমি ঠেলে ফেলে দিলে! এত সাহস তোমার! বাঁদর কোথাকার। আর তোমাকে নিয়ে আসা হবে না। সারাদিন ইন্দুর পেছনে লেগে থাকো!'

তারপর বাবা ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'সত্যি, বাচ্চুকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। গেলে বাঁচি। নালিশ, নালিশ আর নালিশ।'

তার তখন চোখ ফেটে জল চলে আসত। ইন্দু চলে গেলে বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। বাবা তাকে বাঁদর বলায় সে অভিমানে সবার আড়ালে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। বাবার কাছে সে যা বলে, মিছে কথা, ইন্দু যা বলে সব সত্যি কথা! ইন্দুই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কে আগে গাছটা ছুঁতে পারে এই বলে দু'জনেই দৌড়েছিল। দৌড়ে কেন ইন্দু তার সঙ্গে পারবে! ইন্দুর আগে ছুঁয়ে দিতেই কী রাগ। তার কাছে এসে রুখে দাঁড়িয়েছিল। 'কেন আমার আগে ছুঁলি!'

ইন্দুর জেদ, তাকে বলতে হবে, ইন্দু আগে গাছ ছুঁয়েছে। তারও জেদ, না, সে আগে ছুঁয়েছে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই ঠেলে ফেলে দিল তাকে! ফেলে দিয়ে বাবার কাছে দৌড়ে গেল! এত পাজি! এত নচ্ছার ইন্দু। বাবাকে কত সহজে মিছে কথা বলল, বাচ্চু আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে! জানিস মিছে কথা বললে পাপ হয়। তুই এত বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলতে পারিস। তুই কী রে! মনে মনে বাচ্চুর কত অভিযোগ যে জমা হত। কাকে নালিশ দেবে। জেঠিমাকে। জেঠিমা শুনলে হয়তো বলে দেবেন, তুমি বাচ্চুর পেছনেও লেগেছ! তোমাকে নিয়ে যে কী করব! যদি বলেন তবে আর রক্ষা আছে, কীভাবে কোন দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় গজাবে আর তাকে নিয়ে নতুন উপদ্রব শুরু করে দেবে, কে জানে!

মুশকিল বাচ্চুর, ইন্দু এসে তাকে ডাকাডাকি না-করলেও কেমন খারাপ

লাগত। হলুদের জমিতে হলুদ গাছের আড়ালে সে ঘাপটি মেরে বসে আছে—ইন্দু ডাকছে, 'বাচ্চু...উ...উ!'

'এই সুকুমার, বাচ্চুকে দেখেছ?'

'না তো দিদিমণি।'

'পাজিটা গেল কোথায়!'

'জানি না তো।'

'বাচ..চু...উ...উ।'

নদীর পাড়ে সেই ডাক এক অন্তহীন রহস্যের কথা বলত যেন। সে না-পেরে সেই গোপন হলুদ গাছের নীচে বসে সাড়া দিত।

'কু...উ...।'

'বা...চ...চু...উ।'

'কু...উ...উ...উ...উ।'

বাচ্চুর সাড়া দেবার এই প্রক্রিয়া ইন্দুর চেনা হয়ে গেছে।

'তুই কোথায়?'

সে কোথায় লুকিয়ে আছে বলত না। এমনকী, হলুদের জঙ্গল থেকে সে উঠেও দাঁড়াত না। কোমর-সমান সব সবুজ হলুদ গাছ। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় হলুদ গাছের বড় লম্বা পাতা ভিজে। তার সারা গায়ে জল, আর অসহ্য মশার কামড়। ইন্দুর উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য সব কষ্ট সে সহজেই সহ্য করতে পারত— কারণ তার 'কু' শব্দটি ইন্দুর মাথায় পোকা ঢুকিয়ে দিতে পারে। আশপাশে কোথাও পাজিটা লুকিয়ে রয়েছে। অন্ধের মতো তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। করুক। শত উপদ্রবের ভিতরও বাচ্চু এতে মজা পেত।

'কোথায় তুই?'

'কু-উ!'

'কোথায় তুই বলবি তো!'

'কু-উ।'

এই এক খেলা কখনও নিরন্তর মাথায় ঢুকে গেলে যা হয়, শুধু প্রতিধ্বনি।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকলে এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি ভেসে যায়।

ইস, ইন্দুটা ঠিক টের পেয়ে গেছে, এদিকেই আসছে। বাচ্চু নুয়ে যে পালাবে তারও উপায় নেই। পালাতে গেলেই গাছগুলি নড়বে। আর তখনই টের পেয়ে যাবে, বাচ্চু হলুদের জমিতে বসে আছে।

সে খুব সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। সামান্য বাতাস নদী থেকে উঠে আসায় গাছের পাতায় নড়ানড়ি মিশে আছে। বেশি নড়ানড়ি না হলেই হল। সে প্রায় একটা কচ্ছপের মতো এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় সরে যাচ্ছে। ইন্দু পাগলের মতো একবার হলুদের জমিতে ঢুকে গাছ ফাঁক করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে, আবার দৌড়ে যাচ্ছে নদীর খাতে, সেখানে বিশাল যজ্ঞিডুমুর গাছের নীচেও আছে বড় আড়াল— কিংবা নদীর পাড়ে আছে সব বিশাল বৃক্ষ— যে-কোনও বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাচ্চু কু-উ করতে পারে!

'হতভাগা নচ্ছার, একবার খুঁজে পাই, দেখো তোমাকে কী করি!'

ইন্দু হলুদ জমি থেকে কাছারিবাড়ির পেছন— সব জায়গায় তাকে খুঁজছে।

বাচ্চু হলুদের জঙ্গল সামান্য ফাঁক করে দেখছে আর সরে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে গলায় তার একটিই উচ্চারণ, 'কু-উ'।

ইন্দু অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

ইন্দুকে অধৈর্য করে দিতে পারলেই তার মজা। তখন তার মনে থাকত না এর প্রতিক্রিয়া কতটা হবে। ইন্দু শেষ পর্যন্ত কী করে বসবে।

ইন্দু তাকে খুঁজতে নদীর চরে নেমে গেলে সে হলুদ জমি থেকে উঠে দাঁড়াত। ইন্দু নদীর খাতে নেমে গিয়ে ডাকছে, 'বাচ্চু, ভাল হবে না বলছি, শৈলমাসি তোর ভাত নিয়ে বসে আছে। আমরা কেউ খাইনি।'

বাঃ, আরও মজা। শৈলমাসি রান্নাবাড়ির কাজ করে না— পাকের ঠাকুর সদানন্দর কাজ রান্নাবাড়ি সামলানো। ইন্দুর মা'র নিজস্ব ফুট-ফরমাশ খাটে শৈলমাসি। সকালের বাল্যভোগ সেই করে। ইন্দুকে খুঁজতে পাঠিয়েছে, না ইন্দু নিজেই ছুটে এসেছে তাকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য!

বোঝো মজা। বাবাকে আর নালিশ দিবি! বাবাও কেমন যেন, তার কথার কোনও গুরুত্ব দেন না। তখন বাবাকে যে কী নিষ্ঠুর মনে হয়! ইন্দু কখনও

মিছে কথা বলতে পারে বাবা বিশ্বাসই করে না। তখন যে তার কী রাগ হত না! ক্ষোভে-দুঃখে কান্না গোপন করা ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় থাকত না।

ইন্দু দেখে ফেললে তাকে খেপাবে! 'এ মা, তুই কাঁদছিস। কী বোকা রে।' তারপরই যাকে দেখবে ডেকে ডেকে বলবে, 'জানো, বাচ্চু না গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।'

ব্যস, হয়ে গেল।

অজস্র প্রশ্ন, 'কেন কাঁদছিলি!'

'কেউ তোকে মেরেছে!'

'পেট ব্যথা করছে!'

'শরীর খারাপ! বাড়ির জন্য মন কেমন করছে!'

কান্নার যে একটাই হেতু, আর সে সামনে দাঁড়িয়ে তার কান্নার কথা বলে বাহবা নিচ্ছে বলতে পারে না। বাবা যে কত নিষ্ঠুর বলতে পারে না। ইন্দু যেন তখন তাকে আরও পেয়ে বসে।

'কোথাও লেগেছে তোর?'

'না।'

ইন্দু হাঁটু গেড়ে বসবে পায়ের কাছে, 'কোথায় লেগেছে, দেখি।'

'বলছি লাগেনি!'

বাচ্চু তখন ইন্দুর এই ছলনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও ছুট লাগায়। তার খুব বেশি দূর যাওয়া হয় না। আবার সেই নিষ্ঠুর বাবার কাছেই তাকে ফিরে যেতে হয়। সেখানেও রক্ষা নেই। ইন্দু হাজির।

'খুড়ামশাই, বাচ্চু না গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বোকার মতো একা একা কাঁদছিল!'

বাচ্চুর মনে হয় তখন ইন্দুকে ধরে একদিন সত্যি পেটাবে। বুঝতে পারবে তখন বাচ্চু বোকা না ধূর্ত। না পারলে, হাত কামড়ে দিয়ে পালাবে।

৬

খুঁজুক ইন্দু। সে শুধু কু-উ করে যাবে। গোপনে আর বাবার উপর অভিমান করে কাঁদবে না। বরং সে ঠিক করেছে, সত্যি একদিন মঠের সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। বিকেল হলেই তো তাকে নিয়ে যাওয়া চাই মঠের সিঁড়িতে। ইন্দু যেমন লাফিয়ে এক পায়ে নেমে আসতে পারে বাচ্চুকে তাই পারতে হবে। না-পারলে, ইন্দুর পরাজয়ের শেষ নেই।

মাথা না-ঠেকিয়ে ডিগবাজি খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হবে, দু'হাতে ভর রেখে পা উপরে তুলে হেঁটে যেতে হবে— ইন্দুর আবদারের শেষ নেই। ইন্দু পারবে, সে পারবে না, হয় না। তাকে দিয়ে আজ্ঞে-আপনিও করাতে পারল না। তাকে হাতির পিঠে ওঠানো গেল না। তাকে দিয়ে ডিগবাজি খাওয়ানো গেল না, একেবারে অকর্মার ধাড়ি। ডিগবাজি খায় ঠিক, কিন্তু মাটিতে মাথা লেগে যায়। ইন্দু সার্কাসের মেয়েদের মতো ডিগবাজি খেতে পারে কিন্তু বাচ্চু পারে না।

একদিন ইন্দু দাঁড়িয়ে তাকে ডিগবাজির পর ডিগবাজি খাওয়াল।

আবার।

আবার। হল না।

কতবার যে এই আবার, শেষে সে আত্মরক্ষার জন্য যা সবসময় করে থাকে, বাবার তক্তাপোশের নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। খুঁজে পায় না।

নিজের মনেই ইন্দু মাঝে মাঝে কথা পর্যন্ত বলত, 'কোথায় যাবি! আমাকে ফাঁকি। আচ্ছা...' বলেই ঠোঁট কামড়ে ছুটত। সকালবেলা। প্রাসাদের ওপারে সূর্য উঠে গেছে। নদীর চরে ঝাউবনের ছায়া, শরতের শিশির কি বৃষ্টির জল বোঝা ভার— ঘাস ভিজা, ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে। দূরে-অদূরে নৌকা, পাড়ে ডিঙিতে রান্না করছে মাঝিরা, কিংবা আরও দূরে মাঝ-গাঙে ভেসে যাচ্ছে মুলি-বাঁশের বেড়ি, পানসি নৌকা, ছোট-বড় হাঁড়ি-পাতিলের নৌকা— কোথায় যে যায়! দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদীর এই চলে যাওয়া দেখতে দেখতে কেমন যেন ও তন্ময় হয়ে যেত। আসলে নৌকাগুলি ভেসে চলে গেলে এমন মনে হত তাদের। ভাটার টানে ভেসে যায়।

নদী তাদের ফেলে কোথায় যে যায়।

পূজায় নাও আসার দিন যত এগিয়ে আসছে তত বাচ্চু ভাবছে যাবে কি যাবে না' 'র বছর আগে সে মহা অপরাধ করে ফেলেছিল। কিন্তু অবাক, ইন্দু সেই প্রথম গোপন করে গেল— সে কি জানত বাচ্চু ইচ্ছে করেই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। ঠোঁট কেটে গেছে। যেন কোনও কষ্ট নেই। ফ্রক দিয়ে রক্ত মুছে থুতু ফেলছে। দাঁত নড়ে গিয়েছিল।

এমন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে বাচ্চু সারা বিকাল পালিয়েছিল।

তাকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

বাচ্চু গেল কোথায়।

বাচ্চুর মনে হয়েছিল, বাবা জানতে পারলে ঠাসঠাস করে গালে চড় বসিয়ে দেবেন। 'হতভাগা, পাজি, নচ্ছার', এবং সে ভেবেছিল একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটবে। নদীর চরে নেমে একা একা চলে গিয়েছিল বাজার পার হয়ে— তারপর সেই কেল্লার ধ্বংসস্তূপের পাশে একটা ছোটমতো মাঠ আবিষ্কার করেছিল।

সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল মা'র কথা ভেবে। তার কেন যে মা'র কথা মনে হতেই হুহু করে কান্না পাচ্ছিল জানে না। সে কি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে! কী না করেছে ইন্দু! তাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে নদীর ঘাটে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকা পার হয়ে গেছে।

কেবল ডাকছে, 'আয়।'

'কোথায়?'

'আয় না।'

তারপরই সামনের নৌকায় উঠে বলেছিল, 'চল, আমরা নদীর সঙ্গে চলে যাই।'

'সেটা কোথায়?'

'নদী যেখানে গেছে।'

কীসব অবাক কথা বলত ইন্দু। কোথায় কত দুর নদী চলে যায় বাচ্চু জানবে কী করে। সে যাবে না। ইন্দুও ছাড়বে না। সে একবার প্রায় ডিঙি

উলটে জলে পড়ে গিয়েছিল। ইন্দু তাকে টেনে তুলেছে। অনেক দূর থেকে রামসুন্দর ছুটে আসছে।

'আজ্ঞে, ও দিদিমণি কোথায় যাচ্ছেন?'

কে শোনে কার কথা!

বাজারের ঘাটে যতদূর চোখ যায় নদীতে নৌকা লেগে আছে। গাঁয়ের মানুষেরা চলে আসে নৌকায়। খাল-বিল পার হয়ে নদীতে নেমে যায়। ভরা গাঙে যেন নৌকার অজস্র বাহার। এক-মাল্লা, দো-মাল্লা, কত রকমের নাও। ছই দেওয়া, ছই ছাড়া। কোনও নৌকায় পাটাতন আছে, আবার কোনওটায় নেই। নৌকায় লাফিয়ে গেলে যা হয়, কাত হয়ে যায়, শরীর টলে যায়, কিন্তু ইন্দু ঠিক ফ্রক সামলে একেবারে শেষ নৌকায় উঠে ছইয়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত। চরের উপর দিয়ে বুড়ো মানুষটা উর্দি পরে ছুটছে। হায় হায় করছে। এতে ইন্দুর মজা আরও বেড়ে যেত।

কোথাও পাড় ভাঙছে— ঝুপ-ঝুপ। নদীর গভীর জলে ভেসে যাচ্ছে উপড়ে-পড়া গাছ। কিন্তু ইন্দুর কোনও হুঁশ নেই। নদী-নালা, চরের জমি, ওপারের ঘন মেঘের মতো ভেসে থাকা গ্রামগঞ্জ ইন্দুকে বোধহয় টানে। আর সেই রামসুন্দর কাদায় নেমে নৌকায় উঠতেই ইন্দু নৌকার দড়ি খুলে দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের মুখে পড়লে যা হয়, ঘুরে গেল নৌকাটা। আর তিরগতিতে ছুটে চলল। বাচ্চুর ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। মাঝ গাঙে নাও। দূর থেকে মানুষজনের চিল্লাচিল্লি শুনতে পাচ্ছিল। নৌকাটার মাথামুন্ডু ঠিক থাকছে না। ইন্দু পাটাতনে ধেই ধেই করে নাচছিল।

'কোথায় যাচ্ছিস ইন্দু!'

'নদী যেখানে গেছে।'

ইন্দুই এমন কথা বলতে পারে। জল ঘোলা। নীচ থেকে মনে হয় ঘূর্ণিতে বালি প্রবল বেগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। মনে হয় জলের গভীরে কোনও দৈত্য তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। বাচ্চু ভয়ে কাঠ। নৌকা ডুবে গেলে কী হবে! সে সাঁতার জানে না। ইন্দু সাঁতার জানে কি না জানে না।

ইন্দুর এই বিপজ্জনক খেলা সে পছন্দ করত না। ইন্দু কেমন চারপাশ

দেখছে বিহ্বল হয়ে। আর মাঝে মাঝে বাচ্চুর হাত উপরে তুলে পাড়ের লোকদের দেখাচ্ছে।

পাড়ে পাড়ে লোকজন ছুটছে। নাও ভাসিয়ে দিয়েছে রামসুন্দর। ঘাটে সব মানুষজন উপচে পড়ছে। পাঁচ আনা শরিকের বাবুমশাইয়ের ছোট কন্যে ভেসে চলে যাচ্ছে।

আসলে পুজার নাও আসার দিন এগিয়ে আসতে থাকলেই দস্যি মেয়েটা তার মধ্যে ক্রমে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করত যে, তার যাওয়া হয়ে উঠত না।

আর যায়!

সমবয়সি বাচ্চুকে পেয়ে কতরকমের বাহবা পাবার জন্য ইন্দু যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নৌকার পাটাতনে উবু হয়ে নদীর জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, কখনও চুপচাপ বসে ছিল, পাখিরা উড়ে যাচ্ছে পাল্লা দিয়ে, সে যেন পাখির আগে দ্রুত যেতে চায় কোথাও। সেটা কোথায় বাচ্চু এখনও ঠিক বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে সেই দৃশ্যটাই তাকে তাড়া করে। সে সেই কেল্লার ভগ্নস্তূপের মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না, জানে না ইন্দুর শেষ পর্যন্ত কী হল, সে ইন্দুকে ফেলে দিয়েছে, না ইন্দু নিজেই পড়ে গেছে, তার তো মনে আছে, ইন্দু যখন লাফিয়ে নামছিল, সে ধাক্কা মারতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল, কে যেন বলে উঠেছিল, 'বাচ্চু, ইন্দু তোর বন্ধু। ইন্দু তোকে ভালবাসে। তুই ওকে ঠেলে ফেলে দিবি!'

বাচ্চু সেই নির্জন বনজঙ্গলে, ঘাসের ভিতর শুয়ে কার জন্য কান্না পাচ্ছিল ঠিক যেন টের পায়নি।

মা'র জন্য, না ইন্দুর জন্য!

কে তার পাশে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেছিল!

সে কে!

কেমন ভুতুড়ে মনে হয়েছিল, ইন্দু নিজেই লাফ দিতে গিয়ে পড়ে গেছে। সে ফেলেনি তবে!

সেদিনই সে বুঝেছিল, সে একা না। আর কেউ তার পাশে পাশে থাকে। সেই তাকে সজাগ করে দেয়।

প্রতিবারই সে মনে করিয়ে দেয়, আবার যাবি! লজ্জা করে না! তোকে

কত হেনস্থা করেছে। আমি হলে কিছুতেই যেতাম না। ওর কাছে যা খেলা, তোর সেটা মরণ।

সত্যি যদি নৌকা ডুবে যেত!

যদি সিঁড়ি থেকে পড়ে যেত!

হাতির পিঠে ইন্দুর মতো সে উঠতেই পারবে না। হাতিটা খেপে যেতে পারত, খেপে গেলে হাতি শুঁড়ে পেঁচিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলে দিত, কিংবা পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করত। ইন্দুর মতো হাতি তাকে মান্য করবে কেন! কিংবা সেই সুপারির বনে হারিয়ে যাওয়া, আকাশে পরি-দর্শন, মাঝে মাঝে মনে পড়লেই ভৌতিক কিছু মনে হয়। ইন্দু আদপে দুটো, একজন বাবুমশাইয়ের কন্যা, আর-একজন ছাদের কোনও বাচ্চা পরি। সে যখনই পাঁচ আনা শরিক জমিদারবাড়ির কথা ভাবে, তখনই দুই ইন্দু তাকে তাড়া করে।

প্রতিবারই মনে হয়েছে, আসল ইন্দু তাকে খেতে বসলে মাছের কাঁটা বেছে দিত, ভাত মেখে দিত, কখনও তার চুল আঁচড়ে দিত। আর নকল ইন্দু কখনও পরি হয়ে যেত, হাতির পিঠে চড়তে বলত, ডিগবাজি খাওয়াত। নকল ইন্দু আসলে পরি ছাড়া কেউ না।

৭

সকালে নাটমন্দিরে কী ভিড়! কত লোক সকাল থেকে পূজা দেখতে আসছে। অঞ্জলি দিতে হবে। নতুন জামা-প্যান্ট পরে তারা কাছারিবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সদর দেউড়ি পার হয়ে দূর গাঁ থেকে সব-বয়সের মানুষেরা দেবীদর্শনে ছুটছে। বাচ্চুও পূজামণ্ডপে ঘুরঘুর করত সারাদিন। প্রতিমার সামনে বসে, অসুর-সিংহের লড়াই দেখত, আর বলত, ঠিক হয়েছে! বুকে থাবা বসিয়ে দিয়েছে সিংহটা, অসুরের বুক থেকে রক্ত পড়ছে, টপটপ করে রক্ত পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। অথচ দেবীর চোখে আশ্চর্য মায়া, যেন শরতের সকালে শিউলি ফুল ছড়িয়ে রেখে গেছে গাছের নীচে। বুকে রক্ত দেখেও দেবীর মুখ এত প্রসন্ন কেন সে বুঝতে পারত না। কিংবা আরও সকালে,

তখনও রাত ফরসা হয়নি, কাছারিবাড়ির বারান্দায় হাঁক, 'বাচ্চু, শিগগির ওঠ।'

বাচ্চু বলত, 'বাবা, আমাকে কে ডাকছে?'

'ইন্দু ডাকছে। যাও। বাগানে পূজার ফুল তুলতে যাবে।'

তার উঠতে ভয় করত। কোন ইন্দু! আসল না নকল! ছাদের পরির নজরে সে যদি সত্যি পড়ে গিয়ে থাকে তবে তো ভয় পাবারই কথা! দুই ইন্দুই তাকে নিয়ে মজা করতে পারে।

সে বলত, 'সত্যি ইন্দু ডাকছে?' বাবার পিঁঠে মুখ গুঁজে দিত।

বাবা উঠে বসতেন। জানালা খুলে দেখতেন, বারান্দায় সত্যি কে দাঁড়িয়ে! কাছে এসে বলতেন, 'বাচ্চু, তুই বড় হয়েছিস। এত ভয় কেন! ইন্দু সাজি হাতে দাঁড়িয়ে আছে।'

সে কী করে যে বোঝায় এত ভয় কেন তার! ইন্দু তখনও ডাকছে, 'বাচ্চু, শিগগির আয়। সব ফুল চুরি হয়ে যাবে।'

এটা ঠিক পূজার ক'টা দিন, যারা ফুল তোলে তাদের ত্রাস থাকে। ইন্দু একা যাবে না, আরও সঙ্গে কেউ থাকবে। মাঠের দিকটায় কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া টপকে, তিন আনা, দু' আনা, এমনকী দু'পয়সার শরিকের বাবুদের ছেলেরা ফুল চুরি করে নিয়ে যায়। রাত থাকতে এই ফুল তোলার আশ্চর্য এক নেশা, সে বারান্দায় বের হলেই ইন্দু তার হাতেও একটা সাজি ধরিয়ে দিত। তারপর সেই ফুলের বাগানে, শিউলিতলায়, স্থলপদ্ম গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করার জন্য ছোটাছুটি। আকাশে শেষরাতের নক্ষত্র, সারা আকাশ গভীর নীল এবং দেবীর মতো প্রসন্ন। এ সময়েও থাকত তার সঙ্গে আসল ইন্দু।

তার মনে হত, দেবদেবীর ফুল নিয়ে পরিরা কখনও তার সঙ্গে মজা করার সাহস পাবে না।

ইন্দুর সঙ্গে থাকত নন্দবউ।

ইন্দু স্থলপদ্ম গাছের ডালে উঠে ফুল তুলে আনত।

ইন্দু কি জানে না, স্থলপদ্ম গাছের ডাল খুব নরম হয়, ডাল ভেঙে পড়ার ভয় থাকে!

কিন্তু ইন্দু অনায়াসে এতটা হালকা হয়ে যেতে পারত যে, একেবারে গাছের

শেষডালে ফুটে-থাকা ফুলটিও সহজেই আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারত।

তার যে তখন কী বুক কাঁপত!

'এই ইন্দু, পড়ে যাবি।'

ইন্দু ফুলের ডালে, পাতার আড়ালে বসে মজা করতে ভালবাসত। সংশয় তখন, এত হালকা হয়ে যেতে পারে একমাত্র পরিরা। না-হলে স্থলপদ্ম গাছে উঠে পাতলা ডাল থেকে কে পারে ফুল তুলে আনতে! ইন্দুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। লাফ দিয়ে নেমে আসত। আর সাজিতে ফুল সাজিয়ে, চার-পাঁচ সাজি ফুল সংগ্রহ করে ফেলত। ফুলচোরদের কাছে ইন্দু যমের চেয়েও বেশি ঝামেলার। তাকে দেখলেই টপাটপ কাঁটাতার টপকে সব ফুলচোর নদীর পাড়ে অদৃশ্য হয়ে যেত।

বাচ্চুর পাশে দাঁড়িয়ে তখন কে যে বলত, 'কোন ইন্দু আসল বল দেখি?'

'আমি বলব কী করে!'

'তোকে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?'

'কেন, ইন্দু!'

'ইন্দু যে তোর বাবার কাছে গিয়ে বলল, তুই ফেলে দিয়েছিস?'

'আমি কখন ফেললাম!'

'এবারে বুঝে দ্যাখ, তুই বলছিস ফেলিসনি, ইন্দুও বলেছে তোকে ধাক্কা দেয়নি, তবে কে দিল!'

'ইন্দুই দিয়েছে। বাবার কাছে গিয়ে মিছে কথা বলেছে।'

'তা হয়? বল, সে ধাক্কা দিলে নিজেই গিয়ে বলতে পারে, খুড়ামশাই, বাচ্চু আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল! মিছে কথা ইন্দু বলে না, এটা বলছি না, সবাই বলে। তুইও বলিস। কে তবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, ভেবে দেখ।'

বাচ্চু তখন পড়ত মহাফাঁপরে। তাদের মধ্যে তৃতীয় আর-একজন তবে আছে। সেই সব নষ্টামির মূলে। ইন্দুর জন্য তার মন খারাপ করত। এত ভাল মেয়েটাকে সে এত ভয় পেয়েছে!

'তবে তুমি বলছ ইন্দুর বেশে কেউ কাজটা করত! আসল ইন্দু জানতে পারত না।'

'হতে পারে।'

তার এই দ্বিতীয় সন্তানটি যত বড় হয়ে উঠছে তত তাকে তাড়া করছে।

এবারে সে পূজার নাও এলে আর পালিয়ে থাকবে না। বরং ইন্দুকে নিয়ে খুঁজতে বের হবে, কিংবা বলবে, 'ইন্দু, সত্যি করে বল, তুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলি লক্ষ্মীর কাছে, তুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলি সুপারির বনে, না অন্য কেউ?'

এই এক রহস্য টের পেলেই মনে হয়, আর-একজন ইন্দু ঠিক আছে। এবারে দু'জনে যুক্তি করে তাকে ধরবে। ছাদের উপর ভাল মানুষটির মতো বাচ্চা পরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বের করে দেবে। ছাদের কার্নিশের শেষপ্রান্তের পরিটাই সবচেয়ে বাচ্চা। দু'হাত তুলে পাখা মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ইন্দু বলেছে। তবে পরিটাকে সে একদিনই দেখেছে, সাঁঝবেলায়। আর দেখেনি। এবারে গেলে ইন্দুকে নিয়ে ছাদে উঠে ভাল করে দেখবে, গায়ে হাত দেবে, সত্যি পাথরের না ইন্দু মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে নিজেই পরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

কারণ সে তো ইন্দুর সঙ্গে কতবার অন্দরের সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে গেছে। কতবার গায়ের কাছে বসে পরিদের দেখতে দেখতে বলেছে, 'এমা, এরা জামা-কাপড় পরে না!'

তারপর ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলত, 'জামা-কাপড় নেই কেন রে!'

'তুই বোকা আছিস বাচ্চু। জামা-কাপড় পরলে শরীর ভারী হয়ে যাবে না! উড়তে কষ্ট হবে না! শরীর হালকা না-থাকলে পরিদের দেশে উড়ে যাবে কী করে!'

ইন্দুর এই অকাট্য যুক্তিকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না। সে অবাক হয়ে বলত, 'তাই!'

কিন্তু বাচ্চা পরিটার কাছে ইন্দু তাকে নিয়ে যেত না। এমনকী, এখন মনে হয়, বাচ্চা পরিটাকে রোজ সে দেখতেও পেত না।

ছাদে উঠলেই খুঁজত। সব পরিরা এক পায়ে ভর দিয়ে উড়ে যাবে বলে পাখা মেলে দিয়েছে। বাচ্চা পরিটাকে খুঁজে পেত না। বিশাল ছাদ, ফুটবল খেলার মাঠের মতো। বাবুমশাইয়ের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনে ভরতি। ইন্দুর বয়সি আর যারা ছিল, কেউ তার খেলার সঙ্গী ছিল না। এমনকী, ছাদে উঠে

গেলেও একা যেত। শুধু ইন্দু সঙ্গে থাকত। এমনিতেই ছোটদের ছাদে ওঠার নিয়ম নেই। অন্দরের সিঁড়ির মুখে মতির মা সর্বক্ষণ সজাগ।

'কে ছাদে গেল! কে ছাদে গেল!'

'কেউ না। একদম চুপ।'

মতির মা চুপ। ইন্দুকে বোধহয় যমের মতো ভয় পেত।

তবু তার চোপা ষোলো আনা, 'যেই হন ছাদে যাওয়া বারণ। যান যদি, খুব সাবধানে। ঝুঁকবেন না। কু-বাতাসে কী না হয়। পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি।'

কু-বাতাসটা কী সে জানে না। ইন্দুই বলেছিল, 'কু-বাতাস বুঝিস না! তোর না কী যে হবে! বাড়ি থাকলে, মানুষজন থাকলে, কু-বাতাস থাকে। তার ইচ্ছে হলে, তোকে নিয়ে নদীর জলে উড়িয়ে ফেলতে পারে। তুই টেরও পাবি না। বাচ্চাদের পেলে ওদের খুব মজা। ছাদে ওঠা বারণ। একা পেলে কু-বাতাসের কী মরজি হবে কে জানে!'

সুতরাং ছাদে উঠলেও পালিয়ে উঠতে হত। যখন খুশি ওঠা যেত না। যখন খুশি ইন্দু ছাদে নিয়ে যেত না। কিংবা ইন্দু বলত, 'বাচ্চা পরিটা আজ আসবে। সাঁঝবেলায় উঠে যাস, দেখতে পাবি।'

'তুই কোথায় থাকবি?'

'ছাদেই থাকব।'

মাঝে মাঝে কেন যে সে সেই বাচ্চা পরিটাকে দেখার জন্য ঘোরে পড়ে যেত! সে আসলে বাচ্চা পরিটাকে দেখেইনি। ইন্দুই বলেছিল, এই যে দেখছিস ফাঁকা জায়গাটা, এখানে ও এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মরজি হলে আসে, মরজি না হলে আসে না।

একটা জায়গা, ঠিক কোনার দিকে, বাঁধানো শ্বেতপাথরের পদ্ম। কিন্তু পরি নেই। সব পরিই শ্বেতপাথরের পদ্ম থেকে যেন ফুটে বের হয়েছে। কখনও ইন্দু বলত, 'এরা সব জলপরি।'

'তুই যে বললি পরিরা বরফের দেশে থাকে?'

'বরফের দেশেও থাকে, আবার কোনও নির্জন হ্রদেও তারা খেলা করে বেড়ায়। হিমালয় পাহাড়ে গেলে দেখা যায়। বাবা বলেছে, হিমালয় পার হয়ে গেলে মানস সরোবরে পরিরা থাকে। এটাও বরফের দেশ। মাঝে মাঝে নাকি

বরফ গলে গেলে ঝুপঝাপ পরিরা সব লাফিয়ে পড়ে জলে।'

এমন সব বিস্ময়কর খবর তাকে শুধু ইন্দুই দিতে পারত।

সে সাঁঝবেলায় চুপি চুপি সদর দেউড়ি পার হয়ে সোজা চলে গিয়েছিল অন্দরমহলের দিকে। ঘরে ঘরে প্রসাধন করছে মেয়েরা। রাতে পূজা দেখতে বের হবে। না-হয় নাটমন্দিরে গিয়ে বসবে। কিংবা আরও রাত বাড়লে 'নৃসিংহ-অবতার' পালা দেখতে যাবে, কাজেই বিশাল লম্বা করিডর ধরে কে যায়, খেয়াল রাখার কথা না। বাড়ির ভিতরে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় হ্যাজাক ঝুলছে। ঝাড়-লণ্ঠনে লাল-নীল বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কেউ। যেন কোনও রূপকথার দেশ হয়ে গেছে চারপাশটা। ঠাকুরদালানের পেছনটায় এসে সে ভাবল, একবার ইন্দুর ঘরে ঢুকবে। তার ঘরের জানালা খোলা। খাটে সাদা ধবধবে বিছানা। মাথার কাছে তার পড়ার টেবিল। ভিতরে শুধু একটা শেজবাতি জ্বলছে। খুবই নিষ্প্রভ। ভিতরের দিকটা কেমন অন্ধকার। যদি ইন্দু ছাদে গিয়ে না থাকে— তাকে একা তুলে দিয়ে কু-বাতাসের মুখে ফেলে দিতে চায়— সেই আতঙ্কে সে ইন্দুর ঘরে উঁকি দিয়ে যখন দেখল সে নেই, তখন কথামতো ঠিক ছাদে উঠে গেছে ভেবেছিল।

সে চুপিচুপি ছাদে উঠে অবাক। ছাদে জ্যোৎস্না দুধের মতো সাদা। দূরে নদীর জল। পালের নাও, রাস্তায় আলোর রোশনাই। আর নবমী পূজার ঢাক বাজছে। তার ভিতরেও গুড়গুড় করছে কত ভয় বাদ্যকরের বাজনার মতো।

ছাদে কেউ নেই।

এত বড় ছাদ যে, সে একা বেশি দূর যেতে ভয় পাচ্ছে। পা টিপে টিপে হাঁটছিল। নদীর দিকের কার্নিশে সাদা পরিরা আবছামতো ভেসে আছে জ্যোৎস্নায়। ইন্দু সঙ্গে না-থাকলে সে ভরসাই পাবে না, এত দূর হেঁটে গিয়ে সে বাচ্চা পরিটাকে দেখার।

সে ডেকেছিল, 'ইন্দু, তুই কোথায়!'

কারণ ছাদের শেষপ্রান্তে, কিংবা চিলেকোঠার আড়ালে যদি ইন্দু লুকিয়ে থাকে!

কোথা থেকে কে যেন বলল, 'আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না! ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। এই ভূত, এগিয়ে আয়।'

ঠিক ইন্দুর গলা। আর দূরে জ্যোৎস্নায় বাচ্চা পরিটা সত্যি পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে দূর থেকে দেখেই কেমন বিভ্রমে পড়ে গিয়েছিল, পরি না অন্য-কিছু। দু'হাত তুলে, পাখা ছড়িয়ে ছোট্ট পরি তবে সত্যি হাজির। কিন্তু ইন্দু কোথায়। সে দূর থেকেই সারি সারি পরিদের শেষপ্রান্তে বাচ্চা পরিটাকে ভাল করে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইন্দু পাশে না থাকলে এত বড় বিশাল ছাদের শেষপ্রান্তে হেঁটে যাবার ক্ষমতাই হবে না। ওর শরীর কেমন করছিল।

সে চিৎকার করে ডাকল, 'ইন্দু, শিগগির আয়। বাচ্চা পরিটা এসেছে। উড়ে যাবে। তুই কোথায়?'

'বলছি না এখানে! আয় না। কাছে আয়।'

তারপরই সে দেখছিল, নদীর পাড় ধরে ল্যান্ডো যাচ্ছে, ঘোড়ার কদম পর্যন্ত শুনতে পেল। শান বাঁধানো রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে ক্লপ ক্লপ। তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল, ইন্দু কি ঠাকুর দেখতে বাবুমশাইয়ের সঙ্গে বের হয়ে গেল! অষ্টমী পূজার দিন তো সেও সন্ধ্যায় বাবুমশাইয়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হয়েছিল। সঙ্গে ইন্দু। ইন্দু কি ভয় দেখাবার জন্য তাকে একা ছাদে ফেলে ঠাকুর দেখতে বের হয়ে গেল! যে ইন্দুর গলা নকল করে ডাকছে সে আসলে সেই বাচ্চা পরি! আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে কী ত্রাস! হাত-পা কাঁপছে। হাঁটুতে বল নেই। সে দৌড়ে পালাতে গেলেই কোত্থেকে ইন্দু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল। সে বিশ্বাসই করছিল না, ইন্দু হতে পারে। ইন্দুর বেশে কোনও কু-বাতাস হাজির। কী আশ্চর্য সুঘ্রাণ! সে কিছুটা বিহ্বল হয়ে যেতে যেতে দৌড়ে ছিটকে সিঁড়ি ধরে সেই যে ছুট দিয়েছিল আর পিছু ফিরে তাকায়নি।

নীচে নেমে আসতেই চারপাশটা দিনের বেলার মতো ফরসা। লোকজন এবং তারই বয়সি মেয়েরা ছেলেরা চিৎকার করছে, 'এই বাচ্চু, ছুটছিস কেন? কী হয়েছে!'

আর কী হয়েছে। তার কাছে সবটাই তখন বিশাল ভূতের সাম্রাজ্য। একটাও মানুষ নয়। এমনকী, নাটমন্দির, ধূপের গন্ধ, ধুনুচির নৃত্য, দেবীর মুখ ধোঁয়ায় আবছা। সবই যেন সেই কু-বাতাসের প্রভাবে। ঢাকিরা ঘুরে ঘুরে

ঢাক বাজাচ্ছে, ঢাকের পিছনে পালক গোঁজা, গলায় রুপোর মেডেল বড় ঢাকির— এত চেনা সব, অথচ মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল। সে যেন সবই ঘোরে পড়ে দেখছে। কেউ বাবুমশাই না, কেউ মতির মা না, ইন্দু বলে কেউ থাকতে পারে তাও সে মানতে রাজি না। কেবল বাবার কাছে গেলে, সে টের পাবে, ঠিকঠাক আছে সব। বাবার শরীরে সে সবসময় চেনা একটা গন্ধ পায়। বাবার শরীর ছাড়া এ-গন্ধটা কারও গায়ে নেই। সেই যে আশ্চর্য সুঘ্রাণ, সেই যে কু-বাতাস, তাও তার চেনা নয়। কেমন চাঁপা ফুলের গন্ধ।

দ্রুত ধাবমান অশ্বের মতো ছুটে সদর দেউড়ি পার হয়ে কাছারিবাড়ির সামনে হাজির হতেই তার সব আতঙ্ক উধাও। বাবা গরদের পাঞ্জাবি গায়ে, পাট-ভাঙা ধুতি পরে, কাঁধে পাট-করা চাদর ফেলে কোথায় বের হচ্ছেন। সে ছুটে গিয়ে বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তার দিকে অবাক চোখে তিনি তাকিয়েছিলেন।

'কী হয়েছে তোর! এত হাঁফাচ্ছিস কেন! কোথায় গিয়েছিলি!'

সে বলেছিল, 'বাবা, ছাদে না সেই বাচ্চা পরিটা এসে গেছে।'

'তাই নাকি! কখন এল!'

'আমি এইমাত্র দেখে এলাম!'

'তাই বুঝি! তুই যে কত কিছু দেখতে পাস। আমরা কেন যে পাই না!'

'সত্যি বাবা!'

'আমি কি মিথ্যে বলছি!'

বাবা তার কথায় কোনওদিন গুরুত্ব দেন না। তার যে কী কষ্ট হয় তখন।

'আমি যাব আপনার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'পূজা দেখতে।'

বাচ্চু জানে, এই জমিদারবাড়িতে সবার এক-একটা আলাদা গোষ্ঠী আছে। যেমন তার দাদারা জমিদারবাড়িতে গিয়েই বাবুমশাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেল। তাকে তারা সঙ্গে নেয় না। সকালবেলায় কোথায় যে দাদারা পাখি-শিকারে গেল! ঘাট থেকে নৌকায় উঠল। বড়দা মেজদা সেজদাকে নিয়ে বাবুমশাইয়ের বড়পুত্র মেজপুত্র নৌকা ভাসিয়ে চলে গেল। সঙ্গে মাঝি

মকবুল মিঞা। নদীর চড়ায় কোথায় সব বুনো হাঁস উড়ে এসেছে, সেখানেই গেল তারা শিকারে। সঙ্গে একনলা বন্দুক। তার ইচ্ছে ছিল, বন্দুকটা একবার হাতে নিয়ে দেখে। বড়দা এমন ধমক দিল যে, সে আর হাতে নিয়ে বন্দুকটা দেখবে দূরে থাক, কাছে যেতেই সাহস পায়নি।

বাবাও যাবে রক্ষিতমশাইয়ের সঙ্গে। রক্ষিতজ্যাঠা খাজাঞ্চিখানায় কাজ করে। গলায় কণ্ঠি। বাবা তাকে বাড়ি বাড়ি পূজার মহাপ্রসাদ ভোগ খাবার সময় সঙ্গে নেন, কিন্তু সাঁঝ লাগলে প্রতিমা দেখার সময় সঙ্গে নেন না। সে বাবুমশাইয়ের ল্যান্ডো গাড়িতে ইন্দুর সঙ্গে সপ্তমী-অষ্টমীর প্রতিমা দেখে এসেছে। আজও ইন্দুর সঙ্গে যাবার কথা। কিন্তু ইন্দুটা যা করল! ইন্দু যে পরি হয়ে যেতে পারে, বাবা কেন, কেউ বিশ্বাস করবে না। পরিটা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। ইন্দু কিংবা কোনও বাচ্চা পরির নজরে সে পড়ে গেছে সে-কথা জানাবার তার সাহসই নেই। হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়। দু'-একবার যে চেষ্টা না করেছে তা নয়। কিন্তু দাদাদের এক কথা, তোর মাথায় ছিট আছে। কেবল বাবা তখন সাহস দেন। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'পরি থাকবে না কেন? তুমি-আমি যেমন সত্য, এই গাছপালা, নদী, মাঠও সত্য। ফুল ফল হাওয়া জল কোথায় বিস্ময় লুকিয়ে নেই বলো! বাচ্চু পরির কথা জানতে চাইলেই তোমরা তাকে পাত্তা দিতে চাও না। এটা বড়ই খারাপ স্বভাব তোমাদের।'

আজ যা হল শেষে! কী করে যে বোঝাবে!

বাবা বললেন, 'চলো। প্যান্ট-শার্ট পালটে নাও। জুতো পরে এসো।'

সে এক লাফে বাবার ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট বদলে কোনওরকমে জুতো-জোড়া গলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে একা ঢুকতেও গা হিম হয়ে যায়। বসে থাকলে আরও। বাবার সঙ্গ ছাড়া সে আর কারও সঙ্গ চায় না।

আর সেই নদীর পাড় ধরে যাবার সময় যা হয়— বাবাকে দেখলেই লোকজন রাস্তা ছেড়ে দেয়। নুয়ে সালাম জানায়, কিংবা হাত জোড় করে নমস্কার করে। বাবাও হাত তুলে কপালে ঠেকান। তখন বাবার সঙ্গে হাঁটতে কী যে অহংকার। মনেই হয় না সে বাচ্চু, ছাদে উঠে বেশি দূর যেতে সাহস পায়নি। শরীর হিম হয়ে আসছিল।

বাবুমশাইদের আট-দশ শরিকের সবার বাড়িতেই দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে।

তারপর বাজার পার হয়ে গোলক সরকার, আরও দূরে গেলে রূপগঞ্জ থানার পূজা, এভাবে এত প্রতিমা একসঙ্গে দেখার সৌভাগ্য বাচ্চুর কোনওদিন হয়নি।

বাবুদের পুরানো বাড়ির পূজাই আদি পূজা। বাড়িটা ভগ্নস্তূপের মতো দেখতে। দেওয়ালে শ্যাওলা। অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে দেওয়াল থেকে। শুধু নাটমন্দির কোনওরকমে টিকে আছে। সব বাবু তাই চাঁদা করে এই পূজা নির্বাহের খরচ দেন। বাবা পুরানো বাড়ির পূজায় ক'টা পাঁঠা বলি হবে ঠিক করে দেন। মোষ বলির দিন বাবা নিজে মোষের কাটা মুন্ডু মাথায় করে নিয়ে গেছেন। হাড়িকাঠে বিশাল মোষটাকে তুলে দিতে গিয়ে মানুষজনের চিৎকার, চেঁচামেচি, মন্ত্র উচ্চারণ আর ঢাকিদের ঘুরে ঘুরে বাজনা, কিংবা যখন হাজার-হাজার জালালি কবুতর উড়ে দিঘির জলে ছায়া ফেলে চলে যেত, বাচ্চু কেমন এক অতীব বিস্ময়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত।

সেই বাচ্চু পুরানো বাড়ি গিয়ে থ। মণ্ডপের সামনে চেয়ার পাতা। ইন্দু একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। বাবুমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেবীর সামনে। দূরে ল্যান্ডো গাড়ির ঘোড়া তিন পায়ে খাড়া হয়ে আছে।

তা হলে কি ইন্দু ছাদেই যায়নি।

আসলে পরিটাই কি তাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল!

বাচ্চু আরও অবাক, ইন্দু চুরি করে তাকে দেখছে, অথচ একটা কথা বলছে না। চোখে চোখ পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, যেন বাচ্চুকে সে চেনেই না।

হ্যাজাকের আলোতে ইন্দুর মুখ চকচক করছে। পাশের একটা হ্যাজাক দপদপ করে নিভে গেল। বাবুমশাই মণ্ডপের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়েই আছেন। বাবা, রক্ষিতমশাই আর দেবীপূজার তন্ত্রধার নিত্যকালী, কুমারীপূজা নিয়ে কীসব কথাবার্তা বলছেন।

ইন্দু তাকে ডাকল না।

ইন্দু তাকে দেখে ছুটে এল না!

চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে আর কাগজ ভাঁজ করে নিবিষ্ট মনে কী বানাবার চেষ্টা করছে।

তারপর ইন্দু কাগজটায় ফুঁ দিতেই একটা দোয়াত হয়ে গেল।

কাগজটা ভাঁজ করে চ্যাপটা করতে করতে খুলে ফেলল।

সামান্য একটা ছোট্ট কাগজ নৌকা হয়ে গেল।

বাচ্চুর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে কাগজটা কেড়ে নেয়। তুই, ইন্দু আমাকে একা ছাদে পাঠিয়ে, নিজে বের হয়ে পড়েছিস পূজা দেখতে! তুই এত স্বার্থপর! নিষ্ঠুর! আমার যদি কিছু হত! জানিস, আজ না বাচ্চা পরিটা নেমে এসেছিল। ঠিক হুবহু তোর গলায় আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সত্যি বলছি! কিন্তু ইন্দু মুখ কুঁচকে রেখেছে। ঠোঁট বাঁকিয়ে রেখেছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না।

ইন্দুর হাতের ভাঁজ-করা কাগজটা কখন উড়োজাহাজ হয়ে গেল! দেবী-আরাধনার সময় সেই উড়োজাহাজ বাতাসে ছুড়ে দিয়ে ইন্দু ছুটতে থাকল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে উড়োজাহাজটা ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে।

ঠাকুর-দালানে দেবীও যেন দেখছে ইন্দুর এই খেলা কত মজার। দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গরা, কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী চালচিত্রে বাঁধা পড়ে আছে, নইলে ইন্দুর এই মজার খেলায় তারাও যোগ দিত। অথচ বাচ্চু ছুটে গেল না। সে বাবার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। ইন্দুকে আর সে কখনও বিশ্বাস করবে না। ইন্দুর কথায় সে আর যেখানে-সেখানে ছুটবে না। ছাদে তো নয়ই।

৮

দিঘির পাড় ধরে মানুষজন আসছে। দিঘির পাড়ে অশ্বত্থতলায় আছে ছোট ছোট কুঁড়েঘর। পাশে নদী থেকে একটা খাল কুটিরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। সেখানে থাকে সাধুবাবা ললিতমহারাজ। যাওয়া-আসার পথে সবাই একবার আশ্রমে ঢুকে থানে মাথা ঠোকে। বাচ্চুও আসার আগে থানে মাথা ঠুকে বলেছিল, সাধুবাবা পরির হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। বড়ই জ্বালাচ্ছে। আর দুটো দিন ভালয় ভালয় রেখো। তারপরই নৌকায় ফিরে যাওয়া। পুরানো বাড়িতেও তার একই প্রার্থনা, পরি জ্বালাচ্ছে। ঠাকুর, তুমি দেখো আমাকে। কে পরি আমি জানি না। এই যে শামিয়ানার নীচে উড়োজাহাজ ভাসিয়ে ছুটে যাচ্ছে, সে না অন্য কেউ!

বাচ্চু দেখেছিল, বাবুমশাইয়ের সঙ্গে ইন্দু চলে যাচ্ছে। বাবার আড়ালে সে দাঁড়িয়েছিল বলে দেখতে পায়নি। পাঁচ আনির জমিদারের খুবই প্রতাপ— পূজামণ্ডপে গেলে সবাই সন্ত্রাসে পড়ে গিয়েছিল। কাছে যেতে সাহসই পায়নি। পেয়াদা সুকুমার ঝালরের পাগড়ি মাথায়, আচকান গায়ে ছোটাছুটি করে। ল্যান্ডোর পেছনে পাদানিতে দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মূর্তির মতো। পায়ে চকচকে জুতো, পূজার সময় গায়ে রংবাহারি পোশাক।

ল্যান্ডো যায়।

ল্যান্ডোর ঘোড়া তাল ঠোকে পায়ে পায়ে।

নদীর জলে প্রাসাদের প্রতিবিম্ব ভাসে। সারি সারি পামগাছ কত দূর চলে গেছে। স্টিমারঘাট পার হয়ে নদীর পাড়ে পাড়ে দু'ক্রোশের মতো পথ। তার পাশে সব জমিদারবাড়ি, ফুল-ফলের বাগান, দিঘি, পদ্মফুল, হরিণ, ময়ূর সব মিলে এমন রূপকথার পৃথিবীতে বাচ্চু কত বেমানান ইন্দুকে দেখে টের পেয়েছিল।

সেই ইন্দু তাকে ডাকল না।

সেই ইন্দু তার সঙ্গে কথা বলল না।

সেও আর-এক দুঃখ। ক্ষোভ, জ্বালা— ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গিয়ে ইন্দুর চুল টেনে দেয়। কিন্তু বাবুমশাই সঙ্গে— তার সাহস নেই।

উড়োজাহাজটা পড়ে আছে ঘাসের উপর। বাচ্চু পা টিপে-টিপে উড়োজাহাজটার কাছে গিয়ে সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখল। তারপর উড়োজাহাজটা হাতে নিয়ে দেখার সময় মনে হল কাগজে কিছু লেখা— সে ভাঁজ খুলে দেখল, ইন্দুই লিখেছে, কাল দশরায় মেলায় যাব। বিন্নির খই, লাল বাতাস খাব। রাগ করিস না, কেমন? নীচে ইন্দুর সুন্দর হস্তাক্ষরে সই, ইতি, ইন্দুমতী। তারপর আর রাগ পুষে রাখা যায়! বাচ্চুর ক্ষোভ, জ্বালা নিমেষে জল হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু!

এই কিন্তুটাই এতদিন তাকে ভাবিয়েছে।

এই কিন্তুটাই এতদিন তাকে তাড়া করেছে।

পুজার নাও আসার দিন যত এগিয়ে আসে তত তার ইন্দুর কথা মনে পড়ে

যায়। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ উড়ে গেলে ইন্দুর কথা মনে পড়ে যায়। কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে। ইংরেজরা হারছে। জার্মানি জিতছে। জ্যাঠামশাই বৈঠকখানায় বসে যুদ্ধের গল্প করেন। কোন রণক্ষেত্রে ইংরেজদের ছাল-চামড়া তুলে নিয়েছে তার গল্প করেন। হের হিটলার, মুসোলিনি, যত সব বীরগাথা— বাচ্চু চায় ইংরেজরা হারুক। হারলেই তাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এমন মনে হয় তার। তা ছাড়া হাতি লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে যায়। লক্ষ্মী ইন্দুকে বড় ভালবাসে।

ছাদের পরির কথা মনে পড়ে যায়। পরিরাও ইন্দুকে বড় ভালবাসে।

সবই শেষে এলোমেলো হয়ে যায় ভাবতে ভাবতে। এই ভাবনাই কাল হয়েছিল তার। পূজার নাও এলে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। সে বাড়িতেই থাকে, তবু তার যাবার কোনও আগ্রহ থাকে না।

বড়জ্যাঠামশাই স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢোকার সময় বললেন, 'এবারে কী ঠিক করলি বাচ্চু? যাবি, কি যাবি না?'

সে রা করেনি।

বড়পিসি বলল, 'বাচ্চু, তোর একা থাকতে ভাল লাগে! পূজার ক'টা দিন বাবুদের গাঁয়ে যাবি না, তোর বাবা এত করে লেখে, বাচ্চুকে সঙ্গে পাঠাতে। তুই যাস না। মনিব কী ভাবে! তোর আতঙ্ক কেন এত বুঝি না!'

বাচ্চু এখন বড় হয়ে গেছে। তার আর আগের মতো পরি নিয়ে মাথাব্যথাও নেই ঠিক— তবু সেই রহস্যময় পৃথিবীতে ইন্দু কত বড় হয়ে গেছে সে জানে না। ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধবিমান উড়ে গেলে সে মাঠে নেমে যায়। ইন্দুকে দেখার ইচ্ছেটাই প্রবল, সে বোঝে। উড়োজাহাজের সঙ্গে ইন্দুর কী যেন একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু ইন্দুর মধ্যে যদি সেই দুষ্ট আত্মা ভর করে থাকে— দুষ্ট আত্মারা পারে না হেন কাজ নেই, কালু চন্দের এমন সুন্দর বউটাকে কী করে ফেলেছিল! ছেঁড়া তেনাকানি পরে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকত। বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকত। মাঝে মাঝে মূর্ছা যায়। কত ওঝা এল। ঝাড়ফুঁক করল— কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর বনদুর্গাপুর থেকে এল একজন জটাধারী কাপালিক। সে যজ্ঞ করল পুরো তিনদিন ধরে। যজ্ঞে পাঁঠার মুন্ডু উৎসর্গ করা হল। গোটা মুন্ডু ঝলসে গেলে চিমটা দিয়ে তুলে এনে তার মগজ বের করে

খাওয়ানো হল। যজ্ঞের হবির সঙ্গে পাঁঠার ঘিলু খাওয়ার পর সাতদিন নিরম্বু উপবাস। সাতদিন অন্ধকার ঘরে বেতকাঁটার ওপর হাঁটা, সে দুর্ভোগ চোখে দেখা যায় না! এমন সুন্দর পা রক্তাক্ত। তারপর সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে শুইয়ে রাখা হল। পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

দুষ্ট আত্মা এত ক্লেশ সহ্য করতে না-পেরে সেই যে খাঁচাছাড়া হয়ে গেল আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

নিরাময় হয়ে গেল কালু চন্দের বউ।

এসব চোখের উপর সে দেখে দেখে বুঝেছে, ইন্দুর উপরেও কোনও দুষ্ট আত্মা ভর করে থাকতে পারে।

যেমন সেদিন সোমেশ ভুঁইয়ার ছোট মেয়ের উপর চিনিসপুরের কালী এসে সজ্ঞানে ভর করল।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হল।

কন্যার নাম ভগবতী। ভগবতীর উপর মা ভর করেছেন। ভগবতী সারাদিন কিছু খায় না। শনি-মঙ্গলবার প্রশস্ত দিন— সেদিন ভগবতীর নিরম্বু উপবাস। সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে ডুব আর ডুব। ডুবের সীমা-সংখ্যা নেই। শত ডুব। হাজার ডুব। চোখ জবাফুলের মতো লাল টকটকে। লালপাড়ের কোরা শাড়ি পরনে। দেবীর স্নানের সময় ঢাক বাজে, ঢোল বাজে।

পুকুরপাড়ে তিলধারণের জায়গা থাকে না। ভগবতী সাক্ষাৎ জননী। স্নান সেরে যাবার পথে হত্যে দাও। যার যা মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ভেজা চুলের জল একফোঁটা-দু'ফোঁটা ধরে নেওয়ার জন্য মানুষের সেই কাঙালপনা সে চোখের উপর দেখে এসেছে। বড়পিসি, মা, জেঠিরা বাড়ি ঝেঁটিয়ে চলে যান। ভগবতীর তখন আর-এক রূপ। ভগবতীকে চেনাই যায় না। চিনিসপুরের কালী বড়ই জাগ্রত দেবী। কাঁচা-খেকো দেবী ভর করলে কার আর সাহস থাকে ট্যাঁ-ফোঁ করার। মান্য করারই রীতি। আর কতরকমের গল্পগাথা তৈরি হয়ে যায়— ডাক্তার জবাব দিয়েছে। কবিরাজ বলছে, তেনাকে ডাকুন। ধন্বন্তরি ফেল। সে-সময় ভগবতীর করুণা লাভ। এখন বরেন্দ্রমোহন হাঁটা-চলা পর্যন্ত করেন।

মায়ের এত বড় কৃপা! আর এসবও তার মনে নানা কিসিমের ধন্দ ঢুকিয়ে

দেয়। সে বিশ্বাসও করতে পারে না আবার অবিশ্বাসও করতে পারে না।

বাচ্চু এবারে একা ছাদে উঠে সাঁঝবেলায় ইচ্ছে করলে পরির খোঁজে ঠিক যেতে পারবে। ভয়-ডর কমে গেছে। আগে সে রাতে ঘরে একা শুতে ভয় পেত, এখনও পায়, এমনকী, টিন-কাঠের ঘরের জানলার পাশে রাতে একা শুতেও তার ভয়। অন্ধকারে কার হাত যে কখন কীভাবে লম্বা হয়ে পাকা ফলটির মতো ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাবে কে বলতে পারে! বাড়ির চারপাশে বনজঙ্গল, প্রকাণ্ড নিমগাছ এবং রাতের অন্ধকারে জোনাকির চোখ তাকে কিছুটা কাবু করে রাখে ঠিক, তবে আগের মতো সেই আতঙ্ক আর নেই। সে সেদিন সাঁঝবেলায় বেনেবাড়ির পাশ দিয়ে পর্যন্ত হেঁটে চলে এসেছে! বেনেদের মেজবউ গলায় দড়ি দিয়েছিল— তার দুষ্ট আত্মার প্রভাব থাকবে বেশি কী! সে বাড়িটার কাছে এসেই এক দৌড়। মাঝিবাড়ির খাল পার হয়ে পালেদের আমবাগানে ঢুকতেই শুনতে পেয়েছিল, ঠাকুর-বৈকালী শেষে ছোটকাকা কাঁসি-ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। সে রামনাম জপ করতে করতে বাড়ির উঠোনে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

এইসব তার এখনও আছে— তবে আগের মতো দিনের বেলায় অচেনা জায়গায় কোনও অপরিচিত কাউকে দেখলে ভাবতে পারে না, আসলে, ওই যে কাক, বিড়াল, কিংবা কুকুর এবং মানুষ যেই হোক না— সে তেনাদের কেউ হতেই পারেন। দিনের বেলায় সে এখন এত সাহসী যে আস্তানা-সাবের দরগা পার হয়ে পর্যন্ত চলে আসতে পারে। কবরখানায় মিনার, মসজিদ, নতুন কবর। আর রসুন গোটার গাছ। আর চারপাশে খানাখন্দ, বিলের জল, ফসলের জমি এবং নিরন্তর এক নির্জনতা— দিনের বেলায় সে সহজেই সেসব জায়গায় একা যেতে পারে। গা-ছমছম করে ঠিক, তবে কেউ তাকে তাড়া করে না।

এটাই বোধহয় বড় হবার লক্ষণ!

আগে তাড়া করত ইন্দু। তারপর তাড়া করত ইন্দুর বেশে কোনও বাচ্চা পরি। সে এখন ভাবলে নিজের মনেই হেসে ফেলে, ইস, সে কী ভিতুই না ছিল। এমনকী লক্ষ্মীকেও মনে হত হাতি না। ইন্দু মন্ত্র পড়ে হাতি বানিয়ে রেখেছে! না হলে ইন্দু কী মাথামুণ্ডু বলে, আর হাতিটা তাই করতে থাকে। ইন্দু

কত সহজে একদিন শুঁড়ের ডগায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে তাকে মজা দেখাচ্ছিল।

সুতরাং পূজার নাও এলে এবারে যাবে।

অলিমদ্দি-কলিমদ্দি আসবে। দু'দিন, কখনও তারা তিনদিনও থেকে যায়।

শুভদিন, শুভযাত্রা না-দেখে বাড়ির ঘাট থেকে নৌকা ছাড়া হয় না।

পূজার দিনে অলিমদ্দি-কলিমদ্দি নাওয়ে রংবাহারি ছই লাগিয়ে দেয়। মালি-শোলার কাজ থাকে ছইয়ের উপর। ফুল-ফল আঁকা থাকে। পাটাতন এত মসৃণ যে লাফিয়ে উঠলে পিছলে পড়ার উপক্রম। গাবের কষ খাওয়ায় বর্ষা আসার আগে। তাতে কাঠ মজবুত থাকে। অলিমদ্দি-কলিমদ্দি তাদের নাও ছাড়া অন্য কোনও কথা জানে না। একটা সামান্য কাঠের নাও মানুষের কত প্রিয় অলিমদ্দি-কলিমদ্দির গল্প শুনলে টের পাওয়া যায়।

পূজার নাও আসার সময় হলেই শিউলিতলায় সাদা ফুল, রঙ্গন গাছে ঝাঁকড়া ফুল, দোপাটি গাছে লাল-নীল রঙের ফুল— শুধু ফুলের বাহার। শরতের আকাশ গভীর নীল— আবার কখন কোত্থেকে মেঘ উড়ে আসে, বাড়িঘর গাছপালা মাঠ অন্ধকার হয়ে যায়। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামে। শরতের বৃষ্টি আসে, যায়। মাথার উপর ঝুলে থাকে না। এই রোদ, এই বৃষ্টি, প্রজাপতিরা উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। গঙ্গা-ফড়িং লাফিয়ে বেড়ায় ধানগাছের ডগায়। ঘাসের মাথায় বোয়ালে-ফড়িং চুপচাপ উড়ে এসে বসে। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ঢাকের বাদ্য বাজে।

ঠাকুর একমেটে হয়, দোমেটে হয়, ঠাকুরের রং থেকে চক্ষুদান এক আশ্চর্য প্রতীক্ষার কথা বলে। বিসর্জনের বাজনা বাজলেই, বাচ্চুর চোখ ছলছল করতে থাকে। সকালে বিসর্জনের বাজনা বাজতেই তার সেবারে মনটা ভারী বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। দেবী চলে যাবেন। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ মামার বাড়ি এসেছিল, দেবী বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে মন তো খারাপ হবেই।

বাচ্চু বাবার সঙ্গে সকাল সকাল নদীর ঘাট থেকে স্নান সেরে সেদিন ফিরেছিল। ভিতরবাড়িতে সে যায়নি। গেলেই কষ্টটা বাড়বে। তাকে ইন্দু বিন্নির খই লাল বাতাসা খাওয়াবে বলেছে। বাবুমশাই বলেছেন, হাতির পিঠে তাঁরা নদীর চরে নেমে যাবেন দশেরা দেখতে। অতএব সুখবর আছে তার, তবু

মন খারাপ। বিসর্জনের বাজনা শুনেই সেদিন আর সকালে কোথাও যায়নি। ইন্দু কী ভেবেছিল কে জানে! ইন্দুর সেই কাগজ ভাঁজ করে দোয়াত, নৌকা, এরোপ্লেন বানানোর দৃশ্যটা তার মনে পড়ছিল। সে বাবার কাছ থেকে সাদা কাগজ চেয়ে নিয়েছে। ভাঁজ করে নৌকা বানানো যায় কী করে চেষ্টা করছিল। ইন্দু পারে, সে পারবে না, হয় না!

কিন্তু সে কিছুতেই একটা সামান্য কাগজকে ভাঁজ করে কিছুই করতে পারছে না।

কী করে যে ইন্দু করল! কে আর জানে!

সে বড়দার কাছে গেল, সেজদার কাছে গেল, কেউ পাত্তা দিল না।

ইন্দু আর যাই করুক দাদাদের মতো তাকে অগ্রাহ্য করে না।

৯

ইন্দুর উড়োজাহাজটা আসলে একটা চিঠি, ইন্দু খুবই চালাক, সে ধরাও পড়ল না, উড়োজাহাজ ভাসিয়ে হাওয়ায় ল্যান্ডোতে চলে গিয়েছিল। আর উড়োজাহাজটা ঠিক তার পায়ের কাছে এসেই পড়েছিল পাক খেতে খেতে। সে রাগে ওটার দিকে তখন তাকায়নি। ইন্দুর কোনও কিছুতে ওর যে কোনও আগ্রহ নেই, জানানো দরকার। সে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল— পরে কী যে হয়, সে নিজের এই জেদ বজায় রাখতে পারেনি, সে পা টিপে টিপে গিয়ে উড়োজাহাজটা হাতে নিয়েই অবাক।

ইন্দু তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে যখন, তখন ইন্দুর কাছেই যাওয়া যাক।

সে টুলের উপর বসে বারবার চেষ্টা করেও যখন নৌকা, দোয়াত কিংবা উড়োজাহাজ, কিছুই বানাতে পারল না, তখন নিজের উপরই চটে গেল।

সে কী রে বাবা! ইন্দুর মতো তার একবিন্দু ক্ষমতা নেই। ইন্দুর মতো তার মগজও পরিষ্কার না। সেই ইন্দুর কাছে কখনও মাথা সোজা করে রাখা যায়!

আসলে সে স্কুলে গেলে কাগজের জাদুবিদ্যাটা সবাইকে দেখাতে পারত।

সবাই বাচ্চুকে বলত 'দেখি, দেখি, কী করে বানালি। আমাকে একটা বানিয়ে দে।' সে তার বন্ধুদের কাছে গুরুত্ব পেয়ে যাবে— কাজেই কাগজের জাদুবিদ্যা সে যতক্ষণ রপ্ত করতে পারছিল না, ততক্ষণ বড় অস্বস্তি ছিল মনে। ইন্দুটা যে কী। এত বেলায়ও তার পাত্তা নেই। একবার ভাবল, বাল্যভোগের খবর নিয়েই সে হয়তো আসবে। 'এই বাচ্চু শিগগির আয়। তোকে খেতে দিয়েছে। চল।' বাল্যভোগেরও খবর নেই।

কিন্তু তার আগেই ইন্দু কখন এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি। কাগজটা বারবার ভাঁজ করছে, খুলছে, হচ্ছে না। আবার ভাঁজ করছে, খুলছে, হচ্ছে না। সে উবু হয়ে বসে এত নিবিষ্ট মনে কাগজের নৌকা বানাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল যে, চারপাশে কী ঘটছে একদম খেয়াল রাখেনি। ইন্দু কখন এসে চুপচাপ নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে টের পায়নি। বাবুমশাইয়ের গুরুদেবের পালকি কখন সদর দরজা পার হয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল জানে না।

ইন্দু ওর পেছনে ঝুঁকে দেখছে, অথচ সে কিছুই টের পাচ্ছিল না। এমনকী কাছে কোথাও থাকলে সে ঠিক বোঝে ইন্দু এসে গেছে। সে যে কী নেশায় পড়ে যায় জানে না। তখনই ছুটতে থাকে, কারণ ইন্দুকে আবিষ্কার করার মধ্যেও আছে তার অপার আনন্দ। ইন্দুর শরীরে মিষ্টি ঘ্রাণ, ওর ফ্রকে আতরের গন্ধ, অথচ সেদিন সে এতই নিবিষ্ট ছিল কাগজ নিয়ে যে, কিছুই টের পায়নি।

আর সহসা দেখেছিল, কে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তার কাগজটা ঝট করে হাত থেকে কেড়ে নিল।

'ইন্দু, তুই!'

'দে, আমি বানিয়ে দিচ্ছি।'

বাচ্চু একেবারে বিগলিত। সে জানত, ইন্দু ঠিক টের পাবে— ইন্দু যেখানেই থাকুক টের পাবে কাগজটা নিয়ে সে খুব বিড়ম্বনায় পড়ে গেছে। কিছুতেই নৌকা, দোয়াত কিংবা উড়োজাহাজ বানাতে পারছে না।

সামনে এসে ইন্দু মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর বলল, 'দেখ। ভাঁজ করলাম, কেমন। দেখ, দু'দিকের ভাঁজ কোনাকুনি উলটে দিলাম। তারপর

দেখ, আর-একটা ভাঁজ। খুলে দিলাম ভাঁজটা। আবার খুলে দিলাম। কী দেখলি, নৌকা হয়ে গেল।'

'দে, আমি বানাচ্ছি।'

বাচ্চু ভাঁজ করল ঠিক। পরের ভাঁজটা উলটো হয়ে গেল।

'হল না।'

ইন্দু আবার দেখাল। খুব ধীরে ধীরে, তারপর কাগজটা বাচ্চুর হাতে দিয়ে বলল, 'নে, কর।'

বাচ্চু ইন্দুর কথামতো ভাঁজ করে দোয়াত বানিয়ে ফেলল। এবং উড়োজাহাজও।

ইন্দু তারপর বলেছিল, 'জানিস, বাবার গুরুঠাকুর এসে গেছে। লোকটা ভাল না। কী মতিগতি বোঝা যায় না রে! বাবা তটস্থ হয়ে থাকেন। তাঁর সেবাযত্নে ত্রুটি হলে, আমরা নাকি কোপে পড়ে যাব। আমাদের সব ভস্ম হয়ে যাবে। যা বলবে তাই করতে হবে। না করলে সর্বনাশ।'

বাচ্চু গুরুঠাকুরের কথা কোনও আগ্রহ নিয়ে শুনছিল না। সে কাগজটা নিয়ে নিবিষ্টই ছিল। ভুলে না যায়, সেজন্য কখনও দোয়াত, কখনও কলম, কখনও নৌকা কিংবা উড়োজাহাজ বানিয়ে কাছারিবাড়ির মাঠে ছোটাছুটি করছিল। দেখলে বোঝা যায়, এক বালকের থাকে অনন্ত আগ্রহ— নীল আকাশ, শরতের কাশফুল এবং ঢাকের বাজনা বাজলে ভিতরে কী যে হয়— তারপর নীল আকাশের নীচে কাগজের উড়োজাহাজ, কিংবা নদীর জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেবার মজাই আলাদা।

বাচ্চু টেরই পায়নি, ইন্দু বড় ভাল মেয়ে হয়ে গেছে। সে যেখানে যাচ্ছে, ইন্দু তাকে অনুসরণ করছে। ইন্দু চুপচাপ। তার মধ্যে কোনও দাপাদাপি নেই। সে বাচ্চুর সেই মজার খেলা দেখছে কোনও আগন্তুকের মতো। কে বলবে, বাচ্চু এই জমিদারবাড়ির আমলার ছেলে। তার দাপাদাপি, নদীর চরে ছুটে যাওয়া, উড়োজাহাজ ভাসিয়ে ছুটে যাওয়ার মধ্যে আছে অনন্ত এক যাত্রা, মানুষের এই যাত্রার সঙ্গী ইন্দু। ইন্দু শুধু বাচ্চুর ফুটফরমাশ খাটছিল।

নদীর জলে কাগজের নৌকাটা ভাসিয়ে দিলে ইন্দু বলেছিল, 'বাচ্চু, যাবি, নদী যেখানে যায়?'

বাচ্চু হঠাৎ ইন্দুর মুখ দেখে কেমন আঁতকে উঠেছিল। 'কী রে ইন্দু, তোর কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি রে?'

'মুখ কালো করে রেখেছিস কেন?'

'জানিস, গুরুঠাকুর এলে বাবা কেমন জলে পড়ে যান।'

'জলে পড়ে যান কেন?'

'কী জানি!'

তারপরই ইন্দু তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে বসেছিল। খানিকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'জানিস, বাবার গুরু সিদ্ধাই লোক। যা বলবেন, তাই নাকি ফলে যাবে।'

'ধুস!'

বাচ্চু কোনও পাত্তা দেয়নি।

'ধুস বলছিস? তুই জানিস, বাবা সারারাত গুরুকে পাখার হাওয়া করেন। বাবা জেগে থাকেন। সকালে উঠে পাদোদক খান। আমাদের সবাইকে খেতে হয়।'

'তুই খাস!' পা-ধোওয়া জল কেউ খায় সে ভাবতেই পারে না। তাদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছেন। তাঁর স্নানের জল চরণামৃত হয়ে যায়। তারা ঠাকুরের চরণামৃত নেয়, কিন্তু কোনও মানুষের পা-ধোওয়া জল তারা খায়নি।

১০

আসলে পুজোর নাও বাচ্চুকে এবারে বড়ই গোলমালে ফেলে দিল। যতদিন যায়, ইন্দুর নির্যাতন মনে থাকে না। কোথায় যেন ইন্দুর একটা দুঃখ আছে। শিউলি ফুলের মতো দুঃখটা গাছের বোঁটায় লেগে নেই, মাটিতে ঝরে পড়েছে। সেদিন সকালবেলায় পাদোদক খাবার নামে ইন্দুর মুখে কী বিরক্তি। ইন্দু বোধহয় পালিয়ে তাই চলে এসেছিল।

ঠাকুরদালানে পঙ্খের আশ্চর্য কারুকাজ। পাশের ঘরে গুরুদেব দশমীর দিন এসে ঢোকেন। সেখানেও আছে সাদা পঙ্খের কাজ— ময়ূরের ছবি, বুনোহাঁসের উড়ে যাওয়া। কোনও বিহারে বুদ্ধ অবতারের ছবি। গুরু জগৎপতি সর্বজ্ঞ মহাতান্ত্রিক। গুরুঠাকুরের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কক্ষটি দশমীর দিন খুলে দেওয়া হয়। ইন্দুকে বোধহয় খোঁজা হচ্ছিল। বাবুমশাই নিজে বের হয়ে এসেছিলেন। ইন্দু পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছিল। বাচ্চু না বললে, ইন্দুকে সেদিন বোধহয় কেউ খুঁজে পেত না। বাচ্চুই ইন্দুকে বলতে গেলে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ইন্দু অভিমানে কেঁদে ফেলেছিল।

'বাচ্চু, তুই এই!'

আর কোনও কথা বলেনি। ইন্দু বাবুমশাইয়ের পেছনে হেঁটে গেল। তার দিকে ফিরে আর তাকায়নি। জগৎপতি সর্বজ্ঞ মানুষটি কেমন কে জানে। বাবাও এসে খুঁজতে শুরু করেছেন তাকে।

বাবা তাকে দেখেই বলেছিলেন, 'কোথায় থাকিস হ্যাঁ? কখন থেকে খোঁজা হচ্ছে! শিগগির চল। তিনি আশীর্বাদী ফুল দেবেন।'

বাচ্চু বলেছিল, 'তিনি কে বাবা?'

বাবা বলেছিলেন, 'তিনি অবতার।'

অবতার কথাটা তার মনে আছে। কেমন একটা ভয়-আতঙ্ক অবতার শোনার পর।

বাচ্চুর মনে আছে, ঠাকুরদালানে তখন কী ভিড়! প্রতিমা কেউ দেখছে না। দুগ্‌গা ঠাকুরকে এত একা পড়ে থাকতে সে কখনও দেখেনি। সবাই ভিড় ঠেলে অবতারের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠছে। তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাঁটু মুড়ে বসানো হয়েছে। তার দু'হাত অঞ্জলির মতো বাবা এগিয়ে ধরলেন। বাচ্চুর ভিরমি খাবার মতো অবস্থা। গায়ে রক্তাম্বর। কপালে সিঁদুর লেপা। শরীরে চন্দনের গন্ধ। তিনি হাওয়ায় হাত ঘুরিয়ে ফুল তুলে আনছেন। অবতারের এই বিভূতি সে চোখের উপর দেখে তাজ্জব। কেমন সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল মুহূর্তে। অবতারের পায়ে চন্দন কাঠের খড়ম। শ্বেত পাথরের বিশাল গামলায় পা ডোবানো। সেই জল যে-যার মতো সংগ্রহ করে নিচ্ছে। একপাশে বাবুমশাই হত্যে দিয়েছেন।

ইন্দুর বেয়াদপির বোধহয় শেষ নেই। কে যেন বলল, 'ইন্দুকে আদর করার জন্য সর্বজ্ঞ কাছে টেনে নিতেই এক ঝটকায় সে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর কাছারিবাড়িতে, তারপর নদীর চরে কাশবনে।'

কাছারিবাড়িতে তার পাশে আলগা হয়ে বসেছিল, কাগজের নৌকা বানিয়েছিল সবই গোপনে। কারণ বাচ্চু কাছারিবাড়ির বারান্দার শেষদিকের থামের আড়ালে অন্ধকার ঘুপচিতে বসে আছে। কারও টের পাওয়ার কথা না। কোথায় গেল ইন্দু, খোঁজ খোঁজ কিংবা বাবুমশাই ইন্দুর আচরণে হতভম্বও হয়ে যেতে পারেন। কী হয়েছিল সঠিক বাচ্চু জানে না। তবে বোধহয় বাবুমশাই হত্যে দিয়েছিলেন অবতার মানুষটির কাছে এই আশায়, ইন্দুকে বাবাঠাকুর আপনি সুমতি দিন। ইন্দু ঘরে থাকতে চায় না, বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, নদীর জলে নৌকায় ভেসে যায়, সুপারির বনে পরি হয়ে যায়। পায়ের শেকল খুলে নদীর চরে হাতির পিঠে নেচে বেড়ায়। লক্ষ্মীও হয়েছে তেমনই। ইন্দু ছাড়া কিছু বোঝে না। তার উপর কোনও অশুভ প্রভাব পড়তেই পারে— বাবুমশাই এসব কারণে হত্যে দিতে পারেন।

বাবুমশাইয়ের এমন অসহায় অবস্থা সে কখনও দেখেনি। যে মানুষ হেঁটে যান, ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খান— বিশাল খানদানি ঘোড়া নিয়ে আসা হয় বিকেলে— সূর্যাস্তের আগে তিনি হাওয়া খেতে বের হন, কিংবা ল্যান্ডোতে যাবার সময় সড়কের মানুষজন একপাশে সরে দাঁড়ায়, সেলাম দেয়, কিংবা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে— সেই মানুষ এতটা অসহায় হয়ে পড়ায় বাচ্চুর কেন জানি ইন্দুর উপরই রাগটা গিয়ে পড়েছিল। 'তোর জন্য বাবুমশাইয়ের এই হেনস্তা ইন্দু! তুই ভাল হবি না!'

তবে শেষে কী হয়েছিল সে জানে না, কারণ দশমীর দিন বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠতেই আবার সব ঠিকঠাক। প্রাসাদের উপর থেকে কালো ছায়া সরে গেল। গুরুদেবের পালকি চলে গেলেই বাচ্চুর কেন যেন মনে হয়েছিল, যাক রাহুমুক্তি ঘটল এতক্ষণে।

তারপর নদীর পাড়ে বসে বিন্নির খই লাল বাতাসা। দু'জনে মুখোমুখি বসে থাকা। নদীর জলে প্রতিমার ছায়া— আর আশ্চর্য এক বিষাদে বুক ভার হয়ে গিয়েছিল বাচ্চুর। বাজি পুড়ছে, হাউই উড়ছে, ধুনুচি-নৃত্য হচ্ছে, ইন্দু তাকিয়ে

আছে নদীর দিকে। নদীর ঘাটলায় ইন্দু বিন্নির খই খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল খুব। অথচ তার সঙ্গে ইন্দু আর খারাপ ব্যবহার করেনি। এমনকী পরদিন সকালে নদীর ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দেবার সময় বলেছিল, 'বাচ্চু, আবার আসবি।' বলেই এক দৌড়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর একদিন সত্যি পুজোর নাও এসে গেল।

অলিমদ্দি-কলিমদ্দি পুজোর নাও নিয়ে এল। আখ, আনারস নামানো হল। মাসের সওদা বাবা পাঠিয়ে দেন, চাল ডাল তেল নুন— সব টেনে নামানো হচ্ছে।

সঙ্গে এবারে বাবার চিঠি। বাবার চিঠি এবারে বেশ লম্বা। বড়জ্যাঠামশাইকে লেখা।—

> শ্রীচরণেষু দাদা, শত শত কোটি প্রণাম নিবেদক পূর্বক জানাইতেছি, বাচ্চুকে এবার পূজা দেখিতে পাঠাইবেন। বাবুমশাই বারবার বলিয়াছেন, বাচ্চু যেন চলিয়া আসে। বাবুমশাইয়ের জীবনে সুখ নাই। ইন্দু কেমন হইয়া গিয়াছে। কথা বলে না, চুপচাপ নিজের ঘরে বসিয়া থাকে। স্নান, আহার সময়ে করে না। মাঝে মাঝে কেমন স্মৃতি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। সে কিছুই মনে করিতে পারে না। বাবুমশাইয়ের ধারণা, তাঁর গুরুদেব অবতার বিশেষ জগৎপতি সর্বজ্ঞের কোপেই ইহা ঘটিয়াছে। অবতারস্বরূপ এই তপস্বীকে ইন্দু একদম ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাঁহার আগমন ঘটিলে ইন্দু নানা প্রকারে উপদ্রব শুরু করিয়া দিত।

বাচ্চু শুনছিল।

জ্যাঠামশাই বারান্দার জলচৌকিতে বসে চিঠিটি পড়ছেন। পাশে ইজিচেয়ারে ঠাকুরদা লম্বমান। ঠাকুমা, বড়পিসি থামে হেলান দিয়ে বসে আছেন। দরজার আড়ালে মা দাঁড়িয়ে। বাবা কী লিখেছেন তা জানার খুবই আগ্রহ। যদিও বাচ্চু জানে, বাবা মাকে মাঝে মাঝে আলাদা চিঠি লেখেন, কবে আসতে পারছেন, জানান মাকে— কিন্তু প্রতিবার যে চিঠি আসে না, মাকে আলাদা চিঠি লেখেন না বাবা, মাকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তা

টের পেয়েছিল। জমিদারি কাজে হ্যাপার শেষ নেই। কোর্ট-কাছারি, দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে শহরে উকিলের কাছে বাবাকেই ছোটাছুটি করতে হয়, বাচ্চু অবশ্য তা জানে। এই চিঠির মধ্যে মা'র সম্পর্কে কিছুই লেখা থাকবে না বাচ্চু জানে— তবু একজন প্রবাসী মানুষের চিঠি মাকে কতটা আকুল করে রাখে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বাচ্চু টের পেয়েছিল। তখন যে কী রাগ হয় বাবার উপর। তিনি পুজার সময় বাড়ি তো আসেনই না, তার উপর বাড়ি খালি করে সবাইকে নিয়ে যায়— মা তখন কী যে নিঃসঙ্গ, সে টের পায়। এ কারণে বাবার উপর তার ক্ষোভ জন্মাতেই পারে— যদিও এসময় ইন্দুর স্মৃতিবিভ্রম তাকে সবিশেষ পীড়িত করছিল। অবতারস্বরূপ জগৎপতি সর্বজ্ঞও বুঝলেন না, ইন্দু একটু বেশি চঞ্চল স্বভাবের। ইন্দু গাছপালার মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালবাসে। এমন সুন্দর পরির মতো মেয়েটার উপর কারও কোনও ক্ষোভ থাকতে পারে! ইন্দু তো তাকেও কম পীড়ন করেনি— তাই বলে সে কখনও বলেছে, ভগবান ইন্দুকে খোঁড়া করে দাও! মজা বুঝুক!

'তাঁহার আগমন ঘটিলে ইন্দু নানা প্রকারে উপদ্রব শুরু করিয়া দিত', জ্যাঠামশাই চিঠিটার এখানেই কিছুক্ষণ নুয়ে কী দেখলেন— বোধহয় বাবার হস্তাক্ষর বুঝতে পারছেন না। চোখে কিছুটা কমও দেখেন। ভারী লেন্সের চশমা খুলে কাচ মুছে ফের পড়লেন :

> ইন্দুর উপর দুষ্ট আত্মা ভর করিয়াছে সর্বজ্ঞ এমন বিধান দিয়া গেছেন। ইন্দুকে আর ঘরের বার হইতে দেওয়া হয় না। তবু ইন্দু কী প্রকারে যে, এত সুরক্ষিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, রাতে কোথায় বাহির হইয়া যায়! কারণ সকালে তার দরজা খুলিলে দেখা যায়, সে তার কক্ষে নেই। সুপারির বাগানে ঘাসের উপর ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে তার উপর আরও সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করায় সে কেমন নির্বোধ এবং স্মৃতি-বিভ্রমে ভুগিতেছে। মাঘ মাসের অমাবস্যায় কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মহামায়ার পূজা এবং যাগযজ্ঞের, সর্বজ্ঞের বিধানমতো, ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
>
> বাবুমশাইয়ের ইচ্ছা এই ঘোর বিপদে বাচ্চু কাছে থাকিলে ইন্দু শান্তি পাইবে।

বাচ্চু দেখল, বড়দা বারান্দায় উঠে গেছে। জ্যাঠামশাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমাদের যেতে লেখেননি?'

'তোমরাও যাবে।'

বাচ্চুর কেমন খারাপ লাগল ভেবে, ইন্দুর ঘোর বিপদ! তা ইন্দুর উপর দুষ্ট আত্মা কবে থেকেই ভর করে আছে! সে তো কারও অনিষ্ট করে না। তবে ইন্দুর স্মৃতিবিভ্রম ঘটে কেন! কী হয়েছে! ইন্দু তাকে নিয়ে কম হয়রানি করেনি। ইন্দুর মধ্যে এই এক দৌরাত্ম্য আছে— তবে ইন্দুর মতো ভাল মেয়েও হয় না। তাকে কত আদর করে লাল বাতাসা বিন্নির খই খাইয়েছে। সে ইন্দুর জন্য ভারী কষ্টে পড়ে গেল।

আর এ-সময়েই অলিমদ্দি কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাবু, একখানা কথা আছে। আসেন।'

অলিমদ্দি এটুকু বলেই হাঁটা দিল। ভিতরবাড়ির কাফিলা গাছটার নীচে এসে চারপাশটা দেখল। কেউ নেই। উঠোনে চাটাইয়ে ধান— রোদে শুকাচ্ছে। দু'-একটা কাকের উপদ্রব। একটা কাক নিরামিষ ঘরের চালে বসে কা-কা করছিল। বড়পিসি কাকটাকে তাড়াবার জন্য হন্যে হয়ে ঢিল ছুড়ছেন। বড়ই অশুভ ডাক। তারপর আরও অসংখ্য কাক কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল, আর ডাকছে— কা-কা-কা। বড়পিসির যা বাতিক— কাকেরা কি আগে থেকেই কোনও অমঙ্গলের খবর টের পেয়ে যায়! বড়পিসির এক কথা, 'লক্ষণ ভাল বুঝছি না। ওরে তোরা কে কোথায়! মরেছিস! কাকগুলোকে তাড়াতে পারছিস না!'

বাচ্চুর এখন এসব কথায় কান দেবার সময় নেই। সে অলিমদ্দির নৌকায় উঠে গেল চুপিচুপি। কুয়োতলা পার হয়ে বাঁশঝাড়ের নীচে বর্ষায় কাঠ ফেলে ঘাট বানিয়ে ফেলা হয়। সে লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে যেতেই অলিমদ্দি ট্যাক থেকে একটা কাগজ বের করে দিল। বলল, 'ইন্দুদিদি কইছে, চুপিচুপি এটা আপনের হাতে যেন দিই।'

বাচ্চুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ইন্দু তাকে চিঠি দিয়েছে। তাও আবার গোপনে! কী না জানি লিখেছে!

চিঠি খুলে অবাক। মাত্র একটা লাইন, 'মা কালীর দিব্যি বাচ্চু, তুই আসিস।

না এলে ঠিক দেখবি নদীর পাড়ে হারিয়ে গেছি।'

আসলে বাচ্চু বোঝে এই ক'টা কথার মধ্যে ইন্দুর আরও অনেক কথা লুকিয়ে আছে। ইন্দুর স্মৃতিবিভ্রম, কিংবা ইন্দু দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, বাবার এসব উক্তির পিছনে কোনও রহস্য আছে।

সে না-গেলে বুঝতেই পারবে না রহস্যটা কী।

এত রহস্য থাকলে হয়! তার কত কাজ। ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। কত পড়া বাকি। কিন্তু ইন্দুর মুখ ভেসে উঠতেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। রহস্য কি একটা! যেমন ছাদের বাচ্চা পরিটা নেই, থাকেও না, মাঝে মাঝে সে প্রাসাদের ছাদে উঠে দেখেছে, সব পদ্মফুলে পরি উড়ে যাচ্ছে, কেবল কোনার দিকের পদ্মফুলটায় কোনও পরি নেই। অথচ সেই আবছা আলো-অন্ধকারে দূর থেকে সে দেখেছে, সেখানেও আছে বাচ্চা একটা পরি, তাকে ডাকছিল, 'আয় না, ভয় কী! কাছে আয়।' কিন্তু সে কাছে যেতে সাহস পায়নি— এসব রহস্য সে জানতে চায় বলেই এবারে তার যাওয়া। কিন্তু ইন্দু যদি একটা ঘরে বন্দি থাকে, সে তাকে নিয়ে ঘুরতেই পারবে না। ছাদে উঠতে পারবে না। সে বলল, 'ইন্দু কী করে চিঠি দিল!'

অলিমদ্দি বলল, 'মাতির মাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। বলেছে, কেউ জানতে পারলে, ইন্দুদি মাতির মা'র গর্দান নেবে।'

যা ইন্দু গর্দান নিতে পারে। ইন্দুর পাহারায় যেই থাকুক, তাকে ভয় পায় না, এমন কেউ থাকতে পারে না। আর ইন্দু প্রসন্ন থাকলে, সে দু'হাতে শুধু দিতে ভালবাসে। আম জাম নারকেল সুপারি হলুদ যখন যা মিলবে জমিতে, সে লুকিয়েচুরিয়ে দিয়ে দেয়। রাজার ভাণ্ড ফুরোয় না। বাবার কাছ থেকে দরকারে টাকা-পয়সা নেয়, বাচ্চু জানে, কেউ ইন্দুকে ফুসলে টাকা হাতাচ্ছে। সেই ইন্দুর ঘোর বিপদ। কারণ চিঠিতে বাবা আরও লিখেছেন, বাবুমশাই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় প্রায় শয্যা নিয়েছেন। কী যে হবে!

পূজার নাও এসে গেলে বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এবারে সবার মনে খটকা। জগৎপতি সর্বজ্ঞ কি কাপালিক? বাচ্চুর এমন কেন জানি সংশয় দেখা দিল মনে। কাপালিক সে স্বচক্ষে দেখেনি। সে দুটো-একটা উপন্যাস পড়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসও পড়েছে। এতে সে দেখেছে, একজন

কাপালিকের কপালকুণ্ডলার মতো একটি মেয়ের দরকার হয়। তন্ত্রসাধনায় কী না হয়। সে তাল-বেতালের গল্পও পড়েছে। শ্মশান, কিংবা কোনও গভীর বনজঙ্গলে কাপালিকেরা থাকে। তন্ত্রসাধনায় কোনও কুমারী মেয়ের দরকার হয় বলেই হয়তো কপালকুণ্ডলাকে কাপালিক বড় করে তুলেছিলেন।

তবে দৈব বিষয়টি তাকে মাঝে মাঝে খুব তাড়া করে। বাড়িতে বাবা একবার ফিরে এসে গল্প করেছিলেন— এ-যাত্রায় কৃষ্ণপদ রক্ষা পেয়ে গেল, সর্বজ্ঞ রক্ষা করলেন। কঠিন অসুখ, ডাক্তার-কবিরাজ জবাব দিয়ে গেছেন— বাবুমশাই সর্বজ্ঞের শরণ নিলেন। আসলে সর্বজ্ঞও বলেছেন, চাই সমর্পণ এবং বিশ্বাস। বাবা বলেছিলেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। সর্বজ্ঞ বাবুমশাইয়ের বিকারগ্রস্ত পুত্রকে তন্ত্রসাধনায় বাঁচিয়ে দিলেন। সে এক ঘোর— কেউ বিশ্বাসই করবে না, কী এক অলৌকিক উপায়ে সর্বজ্ঞ কৃষ্ণপদকে শূল টংকেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'ধর! বাবাকে জাপটে ধর! জাপটে ধরলে, হাতে কিছু পেয়ে যাবি। যা পাবি ধরে ফেলবি। নদীর চড়ায় শূল টংকেশ্বর বালির উপরে মাথা তুলে জেগে থাকেন। বর্ষায় জলের তলায়। জল নেমে গেলে শূল টংকেশ্বর বালির তলায় চাপা পড়েন। বালি খুঁড়ে তাঁকে জাগিয়ে দিতে হয়।' কৃষ্ণপদ সেই মূর্তিকে জাপটে ধরতেই হাতে কী পেয়ে গেল!

সর্বজ্ঞ বলছেন, 'পেলি?'

'হ্যাঁ পেয়েছি।'

'চেপে ধর।'

'ধরেছি।'

'কী মনে হচ্ছে!'

'নড়ছে।'

'নড়ুক, একদম মুঠ খুলবি না।'

তবু কৃষ্ণপদ মুঠোর ফাঁকে যা দেখেছিল, অবাক হবারই কথা, একটি কালো রঙের ব্যাং। ঠ্যাং দেখেই চিনতে পেরেছিল ওটা একটা ব্যাং।

সর্বজ্ঞের নির্দেশ, 'এবারে ভক্ষণ কর!'

কৃষ্ণপদ মানে মেজদা, লম্বা গৌরবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। মেজদা ইতস্তত করছিলেন। একটা আস্ত ব্যাং তো খাওয়া যায় না। গিলে ফেলাও যায় না। বাচ্চুর তো বাবার বলার ভঙ্গিতেই ওক উঠে এসেছিল। সে মরে গেলেও একটা আস্ত ব্যাং কিছুতেই চিবিয়ে খেতে পারত না, কিংবা গিলে ফেলতেও পারত না। গিলে ফেললেও ব্যাং পেটে গিয়ে লাফাতে শুরু করলে আর-এক বিপদ।

মেজদা ইতস্তত করবে, বেশি কী! করতেই পারে।

বাবা হলেও তাই করতেন। বাবুমশাই নিজে হলেও।

সর্বজ্ঞের চক্ষু নাকি তখন রক্তবর্ণ। তাঁর কপালে রক্তচন্দনের প্রলেপ। নদীর চরে তখন নাকি সূর্যাস্ত হচ্ছিল। মানুষ-সব ভেঙে পড়েছে। এই অবতারস্বরূপ মানুষটির কৃপালাভ খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। নদীর পাড়ে ডেরা বানিয়ে কত মানুষ হাজির। সর্বজ্ঞের বিভূতি দেখার পরম সৌভাগ্য লাভ কাশীবাসের শামিল। কিন্তু কৃষ্ণপদ ঘাড় পাতছে না। বাবুমশাই সব গেল তবে— এমন ভাবছেন। সর্বজ্ঞও ছাড়বেন না— তাঁর এক কথা, এক উচ্চারণ, 'ভক্ষণ করো। দেবাদিদেব চান, তুমি ইহা ভক্ষণে আরোগ্য লাভ করো।'

মেজদাও নাকি স্থির। অস্থিচর্মসার। তবু স্থির। পুরো তিন মাস শয্যাশায়ী— প্রবল জ্বর, আর বমি, এবং বিছানার সঙ্গে মেজদা মিশে গিয়েছিলেন। হাতির পিঠে করে তাঁকে ভৈরব নদীর পাড়ে দুর্গম মহামায়ার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে পাইকপেয়াদা, বাবুমশাই, বাবার বউঠান, এমনকী ইন্দুও নাকি সঙ্গে গিয়েছিল। বাবাঠাকুর অর্থাৎ সর্বজ্ঞের হোম, তাবিজ এবং হবিষ্য পালনে নিরাময়ের মুখেই মেজদাকে হাতির পিঠে তিনি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশাল ছাতা মেলে ধরে বসেছিলেন সর্বজ্ঞ নিজে। বনদুর্গাপুরের লাগোয়া বাবুর সব জমিজমা আশ্রমের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন সর্বজ্ঞ। প্রতিবিধানে পুত্রের জীবনদান।

সত্যি একে জীবনদান ছাড়া আর কী বলে!

সর্বজ্ঞ নাকি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, দেখি। আমার হাতে অর্পণ করো। তোমার খেতে যখন অরুচি!'

মেজদা মুঠ খুলে ওটি সর্বজ্ঞের হাতে দিতে গিয়ে ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন।

অবাক হয়ে সকলে দেখল সর্বজ্ঞের হাতে কলাপাতায় একটি চাঁপাকলা। সঙ্গে প্রসাদী ফুল।

সর্বজ্ঞ বললেন, 'দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপা। এবারে মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে ফেলো। তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।'

পুত্রের জীবনদানের পর বাবুমশাইয়ের আরও ঘোর আসক্তি সর্বজ্ঞের উপর। তিনি সন্তুষ্ট থাকলে সব তাঁর ঠিকঠাক থাকবে এমন ভেবে থাকেন। তিনি সর্বজ্ঞের নির্দেশমতো সকাল পাঁচটায় ওঠেন। নদীর জলে প্রাতঃস্নান, আহ্নিক, প্রার্থনা। মঠের শিবলিঙ্গের পাশে সর্বজ্ঞের বিশাল ফোটো। সেখানে তিনি ঢোকেন, ধূপ-দীপ জ্বেলে আহ্নিক, প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ। সারাদিন প্রায় বাবুমশাই মঠেই পড়ে থাকেন। শনিবার হবিষ্যান্ন নামগান, তাঁর নামেই নদীর নাম, ঘাটের নাম, বাজারের নাম, এমনকী বিদ্যালয়ের নামও।

বাবা বাড়ি এলে, এই অবতারটির কৃপালাভ সম্পর্কে অজস্র গল্প বলে থাকেন। সে নিজেও এই সর্বজ্ঞের প্রতি কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছিল। এত বড় মানুষ, তাঁকে উৎপাত করা যে ইন্দুর ঠিক হয়নি, তাও সে বোঝে। ইন্দু তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে, তাই বলে ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা!

সেদিন বিকালেই ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ার কথা। পরদিন সকালে পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু বড়পিসির কী হয়েছে কে জানে। তাঁর নিষেধ, ঘাট থেকে আজ নাও ছাড়া হবে না। এমনিতেই বাড়িতে সব-কিছু পাঁজি-পুঁথির নির্দেশমতো হয়।

কোনওদিন লাউ, কোনওদিন বেগুন অথবা শাকান্ন আহার হয়, পাঁজি-পুঁথি দেখে ঠিক করা হয়। যাত্রা শুভ কি অশুভ এবং কোন সময় যাত্রা করা হবে, তাও ঠিক করা হয় পাঁজি দেখে। আজ বিকেলে যাত্রা শুভ, তবু এক রা পিসির— কারণ সারাদিন বাড়িতে যেভাবে কাকের উপদ্রব গেছে, তাতে করে আর যাই করা যাক, ঘাট থেকে নৌকা ছাড়া যাবে না। কখন ঝড় উঠবে, বৃষ্টি-বাদলায় নদীর জল ফুঁসবে কে বলতে পারে। যদিও আকাশ ফরসা, সারাবাড়িতে অজস্র ফড়িঙের ওড়াউড়ি, কাক-পক্ষীরাও চঞ্চল নয়, কেবল

কিন্তু কাক দুপুরে উৎপাত করে যেতেই পিসির মেজাজ খারাপ। নানাপ্রকারের উদ্‌বেগ— তার উপরে সর্বজ্ঞ যে বাবুমশাইয়ের পরিবারের উপর ইন্দুর উৎপাতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, এটাও পিসির কাছে ঘোর বিপাক।

যিনি জীবনদান করতে পারেন, তিনি জীবন নিতেও পারেন— কার কোপ কার ঘাড়ে এসে পড়বে কে জানে!

কিন্তু বাচ্চু কেন যে ইন্দুর চিঠিতে ঘোর বিপদের খবর পেয়ে মনমরা হয়ে গেছে। এবারে সে ভেবেছিল, ইন্দুর পরি-দর্শন, কিংবা ছাদের কার্নিশে সত্যি বাচ্চা পরি নামে কি না, কিংবা ইন্দুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে পরি-রহস্য উদ্ধারের সে চেষ্টা করবে— সবই এখন সাত বাঁও জলে।

বাচ্চু পারলে যেন উড়ে গিয়ে এখন ইন্দুর পাশে দাঁড়াতে চায়। সে পিসির সঙ্গে বিকেলবেলাতেই হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। পুজোর সময় মনের মধ্যে এক অপার আনন্দ জেগে যায়। শিউলি ফুল ফোটে। উঠোনের শিউলি গাছটায় কী ফুল! ঝেঁপে ফুল এসেছে। সকালবেলায় গাছের নীচে সব ফুল ঝরে যায়— কেমন সাদা নকশাকাটা শতরঞ্জির মতো। জলে নৌকা যায়, নদীতে নৌকা যায়— কলের গানে বাজনা বাজে। কখনও ভাটিয়ালি গান অথবা রামপ্রসাদী। নৌকায় উঠে গেলেই সুদূরে হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। ইন্দুর চিঠি সব মাটি করে দিয়েছে। স্থলপদ্ম গাছটায় বড় বড় ফুল ফুটে আছে। সে কলাপাতায় স্থলপদ্ম তুলে রেখেছিল ইন্দুকে দেবে বলে।

বড়পিসির এক রা, নাও ছাড়বে না।

সে জ্যাঠামশাইয়ের পাশে গিয়ে বসেছিল। জ্যাঠামশাই বৈঠকখানা ঘরে গাঁয়ের মানুষজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। জ্যাঠার পিছনে দাঁড়িয়ে বাচ্চু বলল, 'কী হবে নাও ছাড়লে?'

জ্যাঠামশাই ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কী ভেবে বললেন, 'ধন্দ। তা তোমার বড়পিসির যখন ধন্দ উপস্থিত— নৌকা ছেড়ে লাভ নেই। সে উচাটনে থাকবে। একটা তো রাত!'

তার যে কী রাগ হচ্ছিল! পিসির মায়াদয়া নেই— তারপরেই মনে হল, কাল সকালে উঠে পিসি আবার কী বলবেন কে জানে, পিসির মেজাজ কেমন থাকবে কে জানে, সারাদিন বাড়িতে কার উপর কী কু-দৃষ্টি পড়বে

সেই ভয়েই তিনি শঙ্কায় থাকেন। সকালে উঠেই গোবরজলে সারা ঘর-বাড়ি, উঠোন, বাগান, যেখানে যখন বাড়ির মানুসজন হাঁটাহাঁটি করে, সেখানেই পিসির গোবরজলের ছড়া। এতে তিনি আশ্বস্ত থাকেন। কোনও দুষ্ট আত্মা বাড়িতে ঢুকে না পড়ে, নানারকম মানুষের ছোঁয়াছুঁয়িতে বাড়িঘর অপবিত্র না হয়— এই এক দুর্ভাবনায় পিসি কাহিল। আর বাড়িতে পিসির উপর কথা নেই, সুতরাং পিসি যদি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ফেলেন, তবে আর-এক গেরো। তিনি দেখতেই পারেন। ইন্দুর উপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে শোনার পরই ঠাকুরঘরে ঢুকে চরণামৃত সবার হাতে ডেকে দিয়েছেন। তারপর ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা তুলে বাচ্চুকে ডেকে দিয়েছেন, বড়দা মেজদা সেজদা কেউ বাদ যায়নি। যেন ফুল-বেলপাতা পকেটে থাকলে, দুষ্ট আত্মার প্রভাবে পড়তে হবে না। সবসময় ফুল-বেলপাতা পকেটে নিয়ে ঘুরতে বলেছেন।

এত সবের পরও দুর্ভাবনা, সকালে উঠে যদি বলেন, পূজায় নাও খালি যাবে, কেউ যাবে না, জেনেশুনে তো আর ভূতের বাড়িতে তাঁর ভাইপোদের মরতে পাঠাতে পারেন না!

জমিদারের না হয় সর্বজ্ঞ আছেন, তাদের কে আছে! সর্বজ্ঞের কৃপালাভ কে না চায়। কিন্তু বাড়িতে যত বিড়ম্বনা জ্যাঠামশাইকে নিয়ে। তিনি চিঠিটা পড়ে যে খুবই হতাশ হয়েছিলেন বোঝা যায়। চিঠি পড়ে শুধু বলেছিলেন, 'সব বুজরুকি। দুষ্ট আত্মাটা আবার কী। মানুষের মৃত্যুর পর কী থাকে! কেন যে সংসারে উদ্ভট সব বিপাক সৃষ্টি করা হয়, বুঝি না। ইন্দু তো শুনেছি খুব ভাল মেয়ে। বাবুমশাইয়ের সঙ্গে দেশভ্রমণে গেছে। তার চোখ খুলে যেতেই পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে বড়পিসি মুখঝামটা মেরে বলেছিলেন, 'বড়দা, তুমি আর শনি ডেকে এনো না। সংসারের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে কথা।' বলে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছিলেন।

কার উদ্দেশে এই প্রণিপাত বাচ্চু বুঝতে পারেনি। কে ঠিক, কে বেঠিক, সে বুঝতে পারে না।

কৃষ্ণপদদার জীবনলাভের খবর পেয়েও জ্যাঠামশাই ঠাকুরদেবতা সম্পর্কে বিচলিত হননি। শুধু বলেছিলেন, 'প্রকৃতিই হেতু। কৃষ্ণপদ বাঁচবে কি মরবে, সে কি কেউ ঠিক করে দিতে পারে।'

বড়পিসির এক কথা, 'তুমি জানো না দাদা, সর্বজ্ঞ ডাকিনীবিদ্যা, যোগিনীবিদ্যা জানে। সে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎও বলে দিতে পারে। তুমি আর যাই করো, তাঁকে অবজ্ঞা কোরো না। তিনি তো সব টের পান। তাঁর কোপে আর সংসারটাকে ফেলে দিয়ো না!'

বাচ্চু বড়ই বিপাকে পড়ে যায়, কালু চন্দের বউয়ের উপরও তো দুষ্ট আত্মা ভর করেছিল। আরে... আরে! সেই লোকটাই তো! তার যেন মনে হয়েছিল, লোকটাকে কোথায় দেখেছে। তার দিকে সেই তান্ত্রিক, না কাপালিক, বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল। তিন দিন ধরে হোম, নাম-কীর্তন, জটাজূটধারী তান্ত্রিক— আচ্ছা তিনিই কি সর্বজ্ঞ! সে তো শুনেছে মহাকাপালিক এসেছেন গাঁয়ে। গাঁয়ের সব মানুষ চন্দদের বাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কেবল জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, 'ইস, বউটার কপালে এত দুর্গতি। মানসিক রোগী, শহরে নিয়ে যা। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা— না কোথা থেকে সব ওঝা, সাধু-সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক ডেকে আনা হচ্ছে! কালু শেষ পর্যন্ত তার গুরুদেবের ফাঁদে পড়ে গেল!'

বাচ্চুর মনে আছে, সব মনে পড়ছে। কাপালিক বলেছিলেন, দুষ্ট আত্মা ছেড়ে গেলে তিনি বুঝতে পারবেন। কারণ যাবার আগে কিছুই-না-কিছু বাড়ি-ঘরের অনিষ্ট করে যাবেই। গিয়েছিলও। যজ্ঞ, পাঁঠার মুন্ডু পুড়ছে যজ্ঞে, তার মগজ এবং পোড়া কলা খাইয়ে দেবার পর সাত দিন সাত রাত ঘরে আটক। বেত কাঁটার উপর হাঁটাহাঁটি— দুষ্ট আত্মা আর থাকে! লেজ তুলে পালিয়েছে। তবে যাবার সময় বাড়ি-ঘরের অনিষ্ট করে গেছে। কালু চন্দের বড় টিনের চৌচালা ঘরটি আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল।

১২

বড়পিসিকে নিয়ে বাচ্চুর দুর্ভাবনা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকল। দাদারা ভলিবল খেলতে চলে গেছে প্রতাপ চন্দের গোলাবাড়িতে। সে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে যদি একটা স্বপ্ন দেখে ফেলে তবে কেমন হয়। সে যদি দেখে, সর্বজ্ঞের চোখে জল। তিনি উপাসনায় বসে আছেন। হরিণের চামড়ার উপর

বসে তিনি ধ্যানে মগ্ন। অথচ অবিরাম অশ্রুপাত এবং যদি বাচ্চু সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তিনি চোখ মেলে তাকান, তারপর হাত তুলে তাকে অভয় দেন, এবং কোনও মন্ত্রপূত প্রসাদী ফুল দিয়ে বলেন, 'যা, তোকে অমর, অজর করে দিয়ে গেলাম। তোর জন্যই আমি হিমালয়ে যেতে পারছিলাম না। তোর কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি চলে যাচ্ছি।' হিমালয়ে তো কেবল বরফ পড়ে, তিনি সেখানে ধ্যানে মগ্ন হবেন বলে চলে যাবেন, যেতে পারছিলেন না— কেবল বাচ্চুকে প্রসাদী ফুল দেওয়া হয়নি বলে, তবে কেমন হয়! অন্তত পিসি যেভাবে উচাটনে পড়ে গেছেন, তাঁকে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখাবে না, হয় না। পিসির স্বপ্নকে কাটান দেবার জন্য তারও একটা স্বপ্ন দেখা দরকার। আর এটা এমন মোক্ষম স্বপ্ন হয়ে যাবে যে, পিসি আর এক দণ্ড স্থির থাকতে পারবেন না। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে নাও ছেড়ে দিতে বলতে বাধ্য হবেন। সর্বজ্ঞ বাচ্চুকে প্রসাদী ফুল দেবেন বলে অপেক্ষা করছেন। না পাঠিয়ে পারে!

বাচ্চুর এই অভিসন্ধি মাথায় আসতেই সে হালকা হয়ে গেল। সামনে পুকুরের জল, কিন্তু মিছে কথা বললে যে পাপ হয়, আর পাপ হলেই রোগ-ভোগ, আর যদি সর্বজ্ঞ সত্যি সিদ্ধাই হয়ে থাকেন, তবে তিনি তো জেনে ফেলবেন তার অভিসন্ধির কথা। বড়পিসিকে যদি স্বপ্নে বলে দেন, 'তোর ভাইপোটি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় মেতেছে। ভাইপোটির সামনে ঘোর দুর্যোগ।' তবেই গেছে!

সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না। যত রাগ গিয়ে পড়ছে ইন্দুর ওপর। তুই কী ইন্দু, তোদের সর্বজ্ঞকেও পরি-দর্শন করাতে চেয়েছিলি! তুই তাঁকে ছাদে নিয়ে গিয়েছিলি বাচ্চা-পরিটা দেখবেন বলে! কিংবা তুই কি তাঁর কমণ্ডলু নদীর জলে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলি! তুই পারিস না হেন কাজ নেই। আমি না গেলে যে বুঝতেও পারব না, তোর ঘোর বিপদ কতটা বিপজ্জনক।

ইন্দু লিখেছে নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে। মা কালীর দিব্যি দিয়ে লিখেছে। না গেলে, এও আর এক মহাপাপ। মা কালীর দিব্যি সোজা কথা! কিন্তু সে তো পিসিকে চিঠির কথা বলতে পারবে না। বাবাকে বাবুমশাই বলেছে বাচ্চু যেন আসে। ইন্দুই হয়তো বাবুমশাইকে দিয়ে বাবাকে চিঠি লেখাতে বাধ্য করেছে। তবু তার সংশয় থাকতে পারে। সে যা একরোখা ছেলে, জেদের

বশে না-ও যেতে পারে। ইন্দু হয়তো বুঝতে পেরেছে— তাকে এতটা হয়রানি করা ঠিক হয়নি।

যেন ইন্দু নিজে চিঠি লিখে বাঙ্কুর কাছে পরোক্ষে মার্জনা ভিক্ষা করেছে।

এত সব মনে হতেই সে স্থির থাকতে পারল না। পুকুরপাড় ধরে হেঁটে গেল। অলিমদ্দি ঘাটে অজু সেরে উঠে গেছে। দু'ভাই ঘাসের উপর গামছা পেতে নামাজ পড়ছে। অলিমদ্দি আগে বাড়ির রান্না খেত। কলাপাতা কেটে এনে ঢেঁকিঘরের ছানছাতলায় দু'ভাই খেতে বসত। বড়পিসি দু'ভাইকে আলগা করে ভাত দিত, ডাল-তরকারি দিত। দু'ভাই কলাপাতায় ভাত উঁচু করে নিত মঠের মতো। তারপর ঠিক ভাতের মাঝখানটায় গোলমতো গর্ত করে নিত। বড়পিসি ডাল ঢেলে দিলে ভাত হড়হড় করে নেমে যেত। অলিমদ্দি-কলিমদ্দি ভাত ঠেলে ডাল গড়িয়ে যেতে দিত না। সামনে বসে দু' ভাইয়ের পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দেখতে দেখতে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে যেত। ভাতের গোলমতো জায়গা থেকে ডাল-ভাত তারা হাপুস-হাপুস খেত। পাতার এখানে-সেখানে থাকত ভাজা, তরকারি, মাছ, টক-দই। ডাল-ভাতের সঙ্গে কখনও ভাজা, কখনও তরকারি, কখনও টক-দই চাটনির মতো চেটে-চেটে খেত।

সেই অলিমদ্দি-কলিমদ্দি হজ করে এসেছে বলে ভিতর-বাড়িতে যাবে না। নৌকায় দু'ভাই রান্না করে খাবে। দু'জনের মতো চাল-ডাল বের করে দেওয়া হয়েছে। বাঁশঝাড়ের নীচে বর্ষার জলে নৌকায় তারা রান্না করে খাবে। নামাজ শেষ হলেই নৌকায় উঠে গিয়ে বসবে। গাছ থেকে শুকনো ডাল আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে। ভারী মজার জীবন দু'ভাই-এর। অথচ তার কেন যে আজ এত মন খারাপ! কিছুই উপভোগ করতে পারছে না। সে পুকুরপাড় ধরে হেঁটে খেজুরতলায় দাঁড়িয়ে গেল। যতদূর চোখ যায় শুধু বর্ষার জল থইথই করছে। শাপলা ফুল ফুটে আছে। পুকুরের জলে পদ্মফুল।

বাঁশঝাড়ের ঘাটে নৌকা বাঁধা। জলে ছলাত ছলাত শব্দ। নৌকা হাওয়ায় দুলছে। সে কিছুক্ষণ নৌকায় উঠে বসে থাকল। অলিমদ্দি উঠে এসে দেখল, বাঙ্কুবাবু নৌকার গলুইয়ে চুপচাপ বসে আছে। হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট গায়। বাঙ্কুবাবুকে তারা কত ছোট দেখেছে, সেই বাবু এখন শুধু বাতাসে বাড়ছে। দেখলে মনেই হবে না, বাঙ্কুবাবু ক্লাস এইটে পড়ে।

মহা ফাঁপরে পড়েছে বাচ্চুবাবু, দেখেই বোঝা যায়। অলিমদ্দি বলল, 'কী গো বাবু, মুখ ব্যাজার কেন?'

বাচ্চু কেমন ধরা পড়ে গেছে। সে বলল, 'আমরা কাল সকালে যাচ্ছি তো!'

অলিমদ্দি বলল, 'বড়দিদির হুকুম কী হবে কে জানে!'

এতে বাচ্চু আরও দমে গেল। তার জেদ বেড়ে গেল। যা হয় হবে। সে দরকারে সকালে উঠে তার বানানো স্বপ্নের কথা বলে দেবে। বড়পিসি টেন্ডাই-মেন্ডাই করলে ছাড়বে না। যদি বড়পিসি সত্যি বলে দিতে পারেন অভিসন্ধির কথা, তবে বুঝবে, সর্বজ্ঞ সত্যি অবতার বিশেষ। না বলতে পারলে বুঝবে, সে যা করবে সর্বজ্ঞের বাবারও ক্ষমতা নেই ধরার।

এইসব সাত-পাঁচ চিন্তায় রাতে তার ভাল ঘুম হল না। কতক্ষণে রাত পোহাবে। তারা শোয় বৈঠকখানা ঘরে। একদিকের তক্তাপোশে শোয় জ্যাঠামশাই। বড় চৌকিতে তারা চার ভাই। মাথার সামনে জানালা। জ্যোৎস্না উঠলে জানালায় এক নিরবধি সুষমা তৈরি হয়। শরতের জ্যোৎস্না কেমন পাগল করে দেয় তাদের। গাছপালা, বনজঙ্গল, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত তখন ঘুমোয় না। জ্যোৎস্নায় বাইরের পৃথিবী কেমন মায়াময় হয়ে ওঠে।

সে বারবারই আজ জেগে যাচ্ছে। কতক্ষণে সকাল হবে। সকাল হলে পিসির কী মর্জি হবে, এই শঙ্কায় সে বারবার বিছানায় উঠে বসছে। তার কেমন ভয়ও ধরে গেল। বাচ্চু, তুই এত বিচ্ছু ছেলে, তুই আমাকে নিয়ে মজা করছিস! আমি তোকে স্বপ্নে প্রসাদী ফুল দেব বলেছি! মিছে কথা বলার আর জায়গা পেলি না। সকাল হোক বুঝবি।

আর আশ্চর্য, সকাল হতে-না-হতেই বড়পিসির গলা, 'ওরে, তোরা ওঠ। তোদের জামা-প্যান্ট-ধুতি গুছিয়ে রেখেছি সব। সকাল সকাল রওনা না-হলে কত রাত হয়ে যাবে জানিস!'

তা ঠিক, দশ ক্রোশ পথ নদী-নালা ভেঙে, বর্ষার মাঠ পার হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। পিসি তা হলে টেরই পাননি তার অভিসন্ধির কথা। সর্বজ্ঞ জানেন না, সে কী ভেবে রেখেছিল। এতে তার বেজায় সাহস বেড়ে গেল।

সকালবেলায় চার ভাই একসঙ্গে খেতে বসল। গরম ভাত, মাছভাজা,

ডাল। সঙ্গে ঘি। কথা আছে, দুপুরবেলায় বুলতার বাজার থেকে দই-চিঁড়ে কিনে নেওয়া হবে। যদি পালে পালে ঠিক বাতাস লাগে সাঁঝবেলায়, শীতলক্ষ্যায় নাও নিয়ে উঠে যেতে পারবে অলিমদ্দি-কলিমদ্দি।

দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে নাও ছেড়ে দেওয়া হল।

বাচ্চু দৌড়ে গিয়ে ছইয়ের ও-পিঠে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে গেল। জ্যাঠামশাই বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, 'অলিমদ্দি, এদের দেখেশুনে নিয়ে যেয়ো। জলে হাত দিতে দেবে না। ধানের পাতায় হাত দিতে দেবে না। ঝড়ে পড়লে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে দেবে। জল দেখলেই আরও দুটো বেশি হাত-পা গজায় বাচ্চুর।'

দূরে কোথায় বাচ্চু ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। নৌকা ক্রমে গাঁয়ের ঘাট ছাড়িয়ে মাঠে পড়ে গেল। বাচ্চু পাটাতনে ঝুঁকে আছে। পাট কাটা হয়ে গেছে বলে বিশাল গাঙের মতো মনে হয়। জলের নীচে জলজ জঙ্গল। অজস্র পাতি-শাপলা ফুল ফুটে আছে। আর জলের নীচে ডারকিনামাছ, পুঁটিমাছ দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল খুব বেশি না। কলিমদ্দি লগি বাইছে। নদীতে না-পড়লে, বইঠা নামানো হবে না। পাল তোলা যাবে না। তাদের এমন সুন্দর একটা দেশ আছে, কত নদী-নালা, আর বিচিত্র রঙের বাহারি পাখি, পাখির ছায়া জলের গভীরে পর্যন্ত দেখা যায়। স্ফটিক জল, স্বচ্ছ, পাখিরা উড়ে গেলে তার ছায়া কেমন এক পাতালপুরীতে জাদুর দেশ তৈরি করে ফেলে। এমন একটা দেশের মেয়ে ইন্দু। তার কিনা ঘোর বিপদ!

বড়দা বলল, 'ওই দ্যাখ, কুসুমের মামার বাড়ি।'

কুসুমের মামার বাড়ি একবার তাদের বাতাবিলেবু কমপিটিশনে হায়ার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বাচ্চু গোলে খেলে। তবু গুনে গুনে প্রতিপক্ষ এগারোটি গোল দিলে বাচ্চুরা চার ভাই মারধরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে এসেছিল। বড়দার আশঙ্কা এমন অপমানের কথা কুসুমের মামার বাড়ির লোকেরা কখনও ভুলতে পারবে না। যদি টের পায়, কে জানে নৌকা আটকে দিয়ে বলবে কিনা, 'আরে এরাই তো এয়েছিল জয়চন্দ্র শিল্ডে খেলতে। ধর। ধর। আটকে রাখ।'

বাচ্চু দেখছে, কুসুমের মামার বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে বড়দা ছইয়ের নীচে গিয়ে লুকিয়ে আছে। কিন্তু বাচ্চুর বেজায় সাহস। সে কিছুতেই ছইয়ের ভিতরে ঢুকে যাবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কার কত সাহস সে দেখবে।

অবশ্য সেদিন তারা মাঠ থেকেই দৌড় আর দৌড়। হায়ার করা প্লেয়ার, কী খাতির-যত্ন! আস্ত পাঁঠা কেটে ভোজ। এতসব করার পর গুনে গুনে এগারোটা গোল কে সহ্য করে!

কুসুমের মামার বাড়ির লোকেরা 'ধর ধর' বলতেই সোজা ছুটে পগার পার। সেই থেকে বাচ্চুর মেজদা-সেজদা যতবার ছোটপিসির বাড়ি গেছে, কুসুমের মামার বাড়ি এড়িয়ে গেছে। ফাওসার বিল পার হয়ে সোজা যাওয়া যায় কিন্তু সোজা যেতে গেলেই কুসুমের মামার বাড়ি— কে যায়! তবেই হয়ে গেল। ওরা ঘুরপথে বটতলা পার হয়ে ব্রাহ্মণদির রাস্তা ধরে পুরো এক ক্রোশ পথ ঘুরে গেছে। তবু কুসুমের মামার বাড়ির পথে ভুলক্রমেও উঠে যায়নি।

বাচ্চুর ধারণা সে যদি ভয়ে আগে থেকেই কাবু হয়ে যায়, তবে ইন্দুর ঘোর বিপদে বুক আগলে দাঁড়াবে কী করে। সেজন্য সবাই ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলেও সে যায়নি, দাদারা ছইয়ের ভিতর থেকে হাত ধরে টানাটানি করছে, 'এই বাচ্চু, ভাল হবে না, ভিতরে এসে বসে থাক বলছি।'

অন্তত দাদারা চায় কুসুমের মামার বাড়ির দেশটা পার হয়ে গেলে যতক্ষণ খুশি পাটাতনে বাচ্চু দাঁড়িয়ে থাকুক। কারণ ইস্কুলে বিধুভূষণ শাসিয়ে রেখেছে, পেলে তাদের মুন্ডু ছিঁড়ে নেবে। বড়দাই যত নষ্টের গোড়া। বিধুভূষণকে বলেছিল, বাতাবি লেবু কমপিটিশনে তাদের চার ভাইয়ের জুড়ি নেই। বিধুভূষণও গাঁয়ের ক্লাবে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। না হলে কে যায়! বড়দার মতিচ্ছন্ন না-হলে এখনও ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়! বাড়িতেও বলা যায় না— তবে ছোটকাকার একপ্রস্থ প্রহার, পঞ্চুকাকার একপ্রস্থ প্রহার আর গৃহশিক্ষকের এক কথা, 'তোরা ঠাকুরবাড়ির নাম ডোবালি! একটা না দুটো না, গুনে গুনে এগারোটা গোল। ছিঃ ছিঃ তোরা আবার আমার ছাত্র। ঘেন্না ধরে গেল। পড়িয়ে আর কাজ নেই— চললাম।'

এমনিতেই বাড়িতে তাদের নামে অপবাদের শেষ নেই। কোনও গৃহশিক্ষকই এক-দু'বছরের বেশি থাকেন না। তাদের পড়ানোর চেয়ে মাঠে

হাল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ ঢের ঢের সুখের। এসব কারণে বাড়িতে খবরটা চার ভাই-ই চেপে গিয়েছিল। তাদের মাথার উপর অপবাদের বোঝা এত বেশি, বাড়তি অপবাদের আর তারা শিকার হতে চায়নি।

চার বছর বাদে বাচ্চু নয়াপাড়ার পাঁচ আনার জমিদারবাড়িতে পূজা দেখতে যাচ্ছে। চারপাশে জল থইথই করছে। লগি বেয়ে জল নামছে। অলিমদ্দি লগি তুলছে ফেলছে। হাতের পেশি কী মজবুত! কলিমদ্দি পাটাতনে বসে তামাক সাজছে। এরা বুঝতেই পারছে না, তার দাদারা কেন হাত টানাটানি করছে বাচ্চুর।

অলিমদ্দি ভাবল, রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে অসুখ করতে পারে। আর এটাও ঠিক, এই আশ্বিন মাস এলেই মানুষের রোগভোগ বাড়ে। আশ্বিন মাস এলেই বাচ্চুর জ্বর হয়। ভগবানের কাছে বাচ্চুর একটাই প্রার্থনা, হে ঠাকুর, পূজার সময় জ্বরে ফেলে দিয়ো না। শরতের সব মাধুর্য তবে মাটি।

অলিমদ্দি লগিতে ভর দিয়ে বলল, 'ভিতরে যান বাচ্চুবাবু। রোদ লাগাবেন না।'

কিন্তু বাচ্চু কারও কথা শুনছে না। এই নৌকাযাত্রায় গ্রাম-মাঠ, মানুষজন, গাছপালা দু'পাশের, দেখতে না-পেলে মজাটা থাকল কী! এই তো সোলেমান মিঞার বাড়ি দেখা যাচ্ছে, এই তো দু'জন লোক পাট জাগ দিচ্ছে জলে, কোনও বাড়ির ঘাটে নৌকায় আউশের ধান ভরতি। কোথাও পুকুরপাড়ে পাটের আঁটি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। দূর দূর দেশ থেকে জলের সঙ্গে ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্যি। বোধহয় বোধনের বাজনা শুরু হয়ে গেল। মনের মধ্যে বাচ্চুর একটা কাঁটা বিঁধে না-থাকলে সে আরও বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারত। আর তখনই মনে হল— স্মৃতিভ্রম হয় ইন্দুর!

'স্মৃতিভ্রম কী রে দাদা!'

বড়দা ছইয়ের নীচে শতরঞ্চির উপর চিত হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। বড়দা কলেজে ঢুকেছে। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে ঢাকায় থাকে। সে সব নভেল নিয়ে আসে। বাড়িতে পড়ে। বাচ্চু আগে নভেল বিষয়টি বুঝত না। কিন্তু কপালকুণ্ডলা পড়ার পর বুঝেছে— নভেল হল গল্পের বই। মাঝে মাঝে মনে হয় নবকুমার সে। আজকাল এসব ভাবতে তার ভাল লাগে। তাকে ফেলে যদি কোনও ঘাট

থেকে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সেও কোনও এক দুর্গম বনাঞ্চলে ঢুকে যাবে। এই যে রাস্তায় যেতে বাণেশ্বরদির গড় পড়বে, এবং একবার বাবুর হাটে যাবার পথে গড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময়, ঘন বনাঞ্চল আর বড় বড় অর্জুন গাছ দেখে কেন যে তার মনে হয়েছিল এই গড়ের মধ্যেই নবকুমার 'পথ হারাইয়াছিল'। ইন্দুও কি তবে 'পথ হারাইয়াছে'! নইলে লিখবে কেন, 'বাচ্চু তুই আসিস। মা কালীর দিব্যি।' না গেলে ইন্দু নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে ভাবতে গেলেই তার যেন বুকে কষ্ট হয়। বুক টনটন করে।

১৩

রোদ, ঝড়, বৃষ্টি কিংবা স্রোতের মুখে অথবা ঘূর্ণিতে নৌকা ডুবে গেলেও, সে যে করে হোক পাঁচ আনার জমিদারবাড়িতে হাজির হবেই। সব আতঙ্ক সে সহজেই এখন তুচ্ছ বলে ভাবতে পারে।

বড়দা বলল, 'স্মৃতিভ্রম বুঝিস না?'

বাচ্চু এবার ছইয়ের নীচে গিয়ে বসল, তবে মুখ বাড়িয়ে রাখল বাইরে। নৌকা পশ্চিমে যাত্রা করেছে বলে ছইয়ের কিছুটা ছায়া লম্বা হয়ে সামনের পাটাতনে পড়েছে। সেই ছায়াতে বসেও চারপাশের জলা চোখে পড়ে। কিন্তু বড়দার মাথার কাছে গিয়ে বসলে, স্মৃতিভ্রম কী ও কেন, জানার যে তার আগ্রহ আছে টের পাবে বড়দা। স্মৃতিভ্রম হয় কেন? সত্যি সেটা কী— স্মৃতিভ্রম তো আগের কথা ভুলে যাওয়া। যদি তাই হয় তবে ইন্দু লিখল কেন, সে না গেলে ইন্দু নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে। ইন্দু তো নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বারবার বলত, 'বাচ্চু জানিস, নদী কোথায় যায়?'

বাচ্চু বলেছিল, 'মোহানায়।'

'তারপর কোথায়?'

তারপর কোথায় সেও ঠিক জানে না। মানুষ বড় হতে হতে কত প্রশ্নের যে সম্মুখীন হয়। ইন্দুর মধ্যে কোনও উদাস ভাব আছে— তাও সে লক্ষ করেছে। সে কি কোনও গ্রীষ্মের ঋতুতে একা গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকতে

ভালবাসে। কিংবা এই যে আশ্চর্য প্রকৃতি এবং তার ঋতু-বদল, শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা-শরৎ ও হেমন্ত এবং হেমন্তে রাশি রাশি সোনালি ধানের আঁটি বেঁধে যখন মানুষজন ঘরে ফেরে, তখন কি ইন্দু এই মহাবিশ্বে অনন্ত অসীমের বৈচিত্র্য টের পেয়ে উদাস হয়ে যায়!

আবার ইন্দু যখন পালিয়ে সুপারির বনে ঘুরে বেড়ায়, জ্যান্ত পরি দেখাবে বলে প্রলোভনে ফেলে দেয়, সেও কি কোনও প্রকৃতির হেতু! বাচ্চু ঠিক বোঝে না সব। মনের মধ্যে যে গোপন রহস্য ভেসে বেড়ায়, সে তা শুধু অনুভব করার চেষ্টা করে। এইসব গোপন রহস্য বেঁচে থাকার— ইন্দুই তাকে প্রথম খবর দিয়েছে। বলেছে, রাতের নক্ষত্র দেখতে। বলেছে, ওই দ্যাখ, হাউইবাজিটা উড়ে গিয়ে স্বাতী নক্ষত্র হয়ে গেল। কত সব নক্ষত্রের নাম।

সে ছাদে উঠে গেলেও ইন্দু মাঝে মাঝে অপলক আকাশের দিকে থাকিয়ে থাকত। সে বাবুমশাইয়ের কাছে কত কিছু জেনেছে। সেই তাকে বলেছিল, 'দ্যাখ বাচ্চু, ভগবান মানুষের বাঁচার জন্য কত কিছু তৈরি করে দিয়েছেন। অথচ দ্যাখ, সময় হলে মানুষ আবার চলেও যায়। ভেবে দ্যাখ, ফুল ফোটে, শস্য হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, ফুল ঝরে যায়— এতসব হয়— অবাক লাগে না! আমরা মরে যাব একদিন, ভাবতে কষ্ট হয় না!'

এগুলো যে অবাক ঘটনা, বাচ্চু প্রথম জানতে পেরেছিল ইন্দুর কাছ থেকে। অথচ আগে সবই সহজ-স্বাভাবিক, এমনই হওয়ার কথা— যেন সেটা না-হলেই অস্বাভাবিক— কিন্তু কাশফুল তো নদীর চরে হেমন্তে দোল খায়। আগে-পরে খায় না কেন!

গ্রীষ্মে যখন দাবদাহ শুরু হয়, তরমুজের জমিতে গেলে বোঝে এই ঋতুতেই তরমুজ হয়— রসে টইটম্বুর। মিছরির দানার মতো মিষ্টি। কোন কারিগরের এমন হাত— কে তরমুজের পেটে এত রস সঞ্চিত করে রাখে!

ঋতু বদলেও সে অবাক হয়ে যায় এখন। আলাদা মহিমা প্রতিটি ঋতুর। বর্ষার সারা মাঠ সবুজ, তারপর অবিরাম ঝড়-বৃষ্টি, চাষ-আবাদ। কোথা থেকে এত জল এসে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা সব একাকার করে দেয়। আবার সেই জল নেমে গেলে, সারা মাঠ সোনালি রং ধরে। গাছপালায় শীতের কুয়াশা নেমে আসে। মাঠের তিলফুলের চাষ, সাদা তিলফুলে ছেয়ে যায় সারা মাঠ।

কোথা থেকে যে উড়ে আসে অজস্র মৌমাছি, তারা মধু আহরণ করে আবার কোথায় চলে যায়।

ইন্দুর সঙ্গে দেখা না হলে প্রকৃতির এত রহস্য সে বুঝতেই পারত না। সে যখন স্কুলে যায় কিংবা স্কুল থেকে ফেরে, কিংবা একলা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলে বারবার ইন্দুর এইসব বিচিত্র খবর তাকে কেমন মুহ্যমান করে রাখে।

সেই ইন্দুর স্মৃতিভ্রম।

ইন্দু খায় না, চান করে না।

ইন্দু একা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। কী গিয়ে দেখবে সে জানে না। ইন্দু কি এখন লক্ষ্মীর কাছেও যেতে পারে না! সে তো ইন্দুর সঙ্গে সকাল-বিকাল লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বসে থাকত। লক্ষ্মী ইন্দুর সঙ্গে খুনসুটি করতে ভালবাসে, সেবারে সে তাও টের পেয়েছিল।

সর্বজ্ঞ ইন্দুর উপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে— না-হলে ইন্দুর মতো মেয়ে কখনও কালীর দিব্যি দিয়ে লিখতে পারে না, 'তুই আসিস।'

কালু চন্দের বাড়িতে সর্বজ্ঞ যে এসেছিল এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস। সে নানা ছলনায় মানুষকে ফেলে দেয়। কিন্তু বাবুমশাইয়ের বাড়িতে সর্বজ্ঞকে দেখেছে, চাঁচাছোলা মুখ, চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে রক্তাম্বর, কপালে সিঁদুর লেপা। কালু চন্দের বাড়িতে যে এসেছিল, চোখ দেখে বুঝেছিল বাচ্চু, এই তান্ত্রিকপ্রবরকে আগে কোথাও দেখেছে। কিন্তু কোথায় সে তা মনে করতে পারছিল না। ধন্দ ছিল। নৌকায় যেতে যেতে সে ধন্দও জল হয়ে গেল। 'আরে, এ তো সেই, সেই।'

বাচ্চু ছইয়ের বাইরে এসে চিৎকার করে উঠল, 'সেই সেই।'

বাচ্চু দু'হাত তুলে আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করছে। সে যেন টের পেয়ে গেছে, দুষ্ট-আত্মা দমনে সর্বজ্ঞ অনেক দূর যেতে পারে। আসলে নির্যাতনে ফেলে দেওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠা। ইস, এমন সুন্দর মেয়েটাকে পাঁঠার পোড়া মুন্ডুর মগজ খেতে হবে। কোযাকোষিতে গলা মগজ, তরল জলের মতো, সে দূর থেকে দেখেছিল, যজ্ঞের পোড়া হবি, ইস, কালু চন্দের বউয়ের চোখে কী ঘোর— লালপেড়ে শাড়ি পরনে, কপালে বড়

সিঁদুরের ফোঁটা, কুশাসনে উপবিষ্ট, সারাদিন উঠোনে রোদের মধ্যে বসে। চারপাশে ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। সর্বজ্ঞের চেলারা চণ্ডীপাঠ করছে, আর মাঝে মাঝে যজ্ঞের আগুন থেকে পোড়া চামসে গন্ধ। ভাবতেই ওক উঠে আসছিল।

বড়দা বলল, 'কী রে, তুই লাফাচ্ছিস, কী ব্যাপার! 'সেই সেই' বলছিস, আর দৌড়ে ছইয়ের উপর উঠে হাত তুলে চিৎকার করছিস? হয়েছেটা কী তোর। কোমর দুলিয়ে নাচছিস! পড়ে গেলে কী হবে?'

বাচ্চু লাফ দিয়ে ছই থেকে নেমে বলল, 'তোর মনে আছে বড়দা, সেই কাপালিক— মানে কালু চন্দের বউকে, মনে নেই ভূতে ধরেছিল!'

মেজদা বলল, 'ইন্দুকেও নাকি ভূতে পেয়েছে!'

বড়দা ধমকে উঠল, 'ভূত নিয়ে কথা না। আমরা কোথায় এসে পড়েছি দেখ।'

দিনের বেলাতেও গা শিরশির করে ওঠার কথা। পরাপরদির শ্মশান। তার পাশ দিয়ে যেতে হবে। একটা আস্ত মানুষকে কাঠে জ্বালিয়ে দেওয়া— ইস, ভাবাই যায় না। বাচ্চু, বড়দা, মেজদা কখনও শ্মশানে যায়নি। ওরা রাস্তায় শ্মশান পড়লেও ক্রোশখানেক রাস্তা দুর দিয়ে যায়। সুতরাং দুর থেকে শ্মশানের আগুন দেখে বুকটা সবারই ধক করে উঠল। যতই হোক, একজন মানুষের মরে যাওয়া এবং আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়াটা বড় বীভৎস। এ সময় ভূতের কথা না-বলে রাম রাম বলা ভাল। বড়দা নিজের বুকে জামা ফাঁক করে থুতু ছেটাল। দেখাদেখি মেজদা-সেজদাও। কেবল বাচ্চু দূরবর্তী শ্মশানের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে বলল, 'কাপালিকরা খুব পাজি হয়, না রে দাদা!'

আরে বাচ্চুটা বলছে কী! বাচ্চু বুকে থুতু ছিটোচ্ছে না। ভূতের ভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য বড়পিসির টোটকা কাজে লাগাচ্ছে না! কী দুঃসাহস! মেজদা ছই থেকে বের হয়ে বাচ্চুকে ঝাঁকিয়ে দিল, 'কাপালিক পাজি হয় না ভাল হয়, তা দিয়ে তোর কী হবে! হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন! বুকে থুতু ছেটা।'

বাচ্চু ঠিক বুঝতে পারে না, মানুষ মরে গেলে আত্মার কী গতি হয়। বড়পিসি কেন, ছোটকাকাও তো বলেছে, মানুষ মরে গেলে আত্মা বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করে। মানুষকে পুড়িয়ে দিলে আত্মা শ্মশানের চারপাশে

ঘোরাঘুরি করে। ঠাকুরদা বলেছেন, আত্মার বিনাশ নাই। বাচ্চু যত ভাবে অবাক হয়ে যায়, তবে কি আত্মা এখন শ্মশানের বটগাছে কোনও পাখি হয়ে বসে আছে! থাকতেই পারে। তারও ভয় ধরে গেল, তবে সে কেন যে পিসির টোটকা ঠিক আমল দিতে পারছে না, বুঝে উঠতে পারছে না! আত্মাটা দুষ্ট আত্মা নাও হতে পারে। দুষ্ট আত্মা হয় মানুষ আত্মঘাতী হলে কিংবা অপঘাতে মারা গেলে। কিংবা মরার সময় তিথি নক্ষত্রদোষ পেলে।

সেজদা বলল, 'আরে তুই কী দেখছিস! ও বড়দা, দ্যাখ বাচ্চু কেমন হয়ে যাচ্ছে। ইস, ওভাবে তাকায়!'

আসলে বাচ্চু আত্মার কথা ভাবছিল। এই হয়েছে বাচ্চুর মরণ! দাদারা তার কত কিছু ভাবছে। দাদারা তার ভাল চায়। তা ছাড়া ইন্দুর উপর দুষ্ট আত্মা যদি ভর করেই থাকে, পিসির মোক্ষম টোটকা কাজে লাগবে। সে জামার বোতাম খুলে বুকে থুতু ছিটাল। আর আশ্চর্য, দেখল, সে কেমন হালকা হয়ে গেছে। তার সত্যি এতটুকু আর ভয় নেই! সে কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে আর আত্মা পাখি হয়ে যায়, কিংবা দুষ্ট আত্মার আক্রমণে পড়ে যেতে পারে, ভাবতেই পারছে না।

সে বলল, 'আসলে জানিস দাদা, ওই সর্বজ্ঞ না বাবুমশাইয়ের মাথাটি খেয়েছে। ইন্দুর পেছনে লেগেছে।'

বড়দা বলল, 'সর্বজ্ঞ, জানিস, তোকে ইচ্ছে করলে একটা ছাগল বানিয়ে দিতে পারে!'

বাচ্চু বলল, 'সর্বজ্ঞ নাড়ু খায়, না রে দাদা!'

বড়দা খেপে গিয়ে বলল, 'বাচ্চু, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না। জানিস দুষ্ট আত্মাকে চালান দিতে পারে। কেউ তেরিমেরি করলেই, দুষ্ট আত্মা পাঠিয়ে দেয় জব্দ করার জন্য। সব ভাল, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা ভাল না।'

'ঠাট্টা-তামাশা কী করলাম, শুধু বললাম, নাড়ু খায়। ঠাকুর-দেবতারাই তো নাড়ু খায়। আমরা প্রসাদ খাই।'

আসলে বাচ্চুর অকারণ এইসব কথাবার্তা তার দাদাদের ভাল লাগছিল না। অলিমদ্দি হালে বসে আছে। পালে বাতাস লেগেছে। ছইয়ের ওপাশে বাবুরা কী নিয়ে বচসা করছে বুঝতে পারছে না। দড়ির গিটে টান পড়েছে।

ছাগল-বামনি নদীতে নৌকা পড়তেই সাঁ-সাঁ করে নৌকা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'পাশে নদীর পাড়, পাড়ে ফাটল, কোথাও একজন মানুষ নদীর পাড়ে বঁড়শি ফেলে বসে আছে, খড়া জাল পেতে মাছ ধরছে জেলেরা। আর ছোট-বড় ঘাসি-নৌকা উজানে উঠে যাচ্ছে।

বড়দা এবার বাঙ্কুকে না-শাসিয়ে পারল না, 'দেব তোকে নামিয়ে। তোর জন্য আমরা কি সবাই মরব?'

বাঙ্কুর মুখ গোমড়া ছিল। আসলে বাঙ্কু নিজেকে নিয়ে, ভূত নিয়ে কিংবা ঈশ্বরকে নিয়ে কেন যে সামান্য ঠাট্টা-তামাশা করার সাহস পেয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না। সর্বজ্ঞ সত্যি যদি তাকে তুকতাক করে ছাগল বানিয়ে দেয়! সে একটা গাছের নীচে বাঁধা থাকবে। দাদারা তাকে ঘাসপাতা খেতে দেবে। সে কথা বলতে পারবে না। ব্যা-ব্যা করে শুধু ডাকবে, দাদা রে! সব কিছুর একটা সীমা আছে।

আসলে, সে জানে শ্মশানের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলে, কিংবা এলোমেলো কথা বললেই সবাই ভেবে ফেলে কোনও দুষ্ট আত্মার কাজ। ইন্দু জানালায় দাঁড়িয়ে নদীর চর, কাশফুল, ঘাসি-নৌকা, কিংবা রাতের স্টিমার জল কেটে চলে গেলে জানালায় আনমনা হয়ে যেতেই পারে। কেউ ডাকলে জবাব দিতে নাও পারে। সে তার মরজিমতো চলে— তার যদি গোঁসা হয়, তবে সে চিৎকার-চেঁচামেচি করে থাকতে পারে— একজন মানুষকে সহজেই ষড়যন্ত্র করে দুষ্ট আত্মার কবলে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। মাথা খারাপ করে দিতে পারে।

দাদাদের মাথায় কোনও ভূত চেপে নেই। কারণ ইন্দু তো তাদের মা-কালীর দিব্যি দেয়নি যে, তারা না-গেলে ইন্দু নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে! তার মনের মধ্যে যে লড়ালড়ি চলছে— দাদারা টের পাবে কী করে! দাদারা সহজেই এটা-ওটা নিয়ে হইচই করতে পারছে, পাটাতনে শুয়ে বসে থাকতে পারছে, আর ঢাকের বাদ্য শুনে হাত তুলে নাচানাচি করতে পারছে।

সে পারছে না।

সে এভাবেই দেখল, শীতলক্ষ্যায় নৌকা একসময় ভেসে চলেছে। সাঁঝ

লেগে গেছে। সূর্য অস্ত গেল নদীর পাড়ে। দুটো-একটা নক্ষত্র জাগছে। দুটো-একটা লম্ফ জ্বলছে দূরের গাঁয়ে। কোনও গাঁয়ে হ্যাজাকের আলো— মানুষজনের হাঁটাহাঁটি নৌকায় বসেও সে বেশ টের পাচ্ছিল।

বড়দা বলল, 'কী রে বাচ্চু, তুই এত ভাল ছেলে হয়ে গেলি! একেবারে চুপচাপ!'

সত্যি ভাবা যায় না। সে এত চুপচাপ যে, দাদাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। নৌকায় উঠলে তার সত্যি আরও দুটো হাত-পা গজিয়ে যায়। সে পাটাতনে বসে জলে পা ডুবিয়ে রাখে, এই একটা খেলা আছে। জলে পা ঝুলিয়ে রাখলে জলজ ঘাসে পা ঢেকে যায়, এবং অলিমদ্দি-কলিমদ্দির তখন শাসন, 'বাচ্চুবাবু পা দু'খান ওঠান। জলের নীচে কুমির আছে, কখন ঝপাস করে ভেসে উঠবে টের পাবেন না। চোখের পলকে হাওয়া করে দেবে।'

আসলে নৌকা বাইতে যে কষ্ট হয় তার। কখনও তা মুখ ফুটে বলবে না। হাওয়া করে দিতে পারে। জলে ঘূর্ণি, গভীর কালো জল— এবং দু'পাড় দেখা যায় না কখনও। প্রায় সমুদ্রের শামিল। এরই ভিতর থাকে নিরন্তর আকাশ এবং নদীর দু'পাড়ের ছবি। জলের ঢেউ, নৌকার উথাল-পাথাল, অথবা কোনও গঞ্জের মতো জায়গায় নেমে চিড়ে গুড় দই কিনে এনে খাওয়া। কখনও রাত হলে উনুন জ্বেলে, ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল। পাটাতনে বসে খাওয়ার কী যে মজা। লম্ফ জ্বলে, হারিকেন দোলে হাওয়ায়। নৌকা গড়াগড়ি যায়, তাতেও ছইয়ের লম্ফ দোল খায়। তার ছায়া, দাদাদের ছায়া ছোট-বড় হয়ে যায়— এ-দৃশ্য যে উপভোগ না করেছে, সে জানেই না পুজায় নয়াপাড়ার পাঁচআনা জমিদারবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা রূপকথার চেয়েও কত বিস্ময়ের।

অথচ এবারে বাচ্চুর সব গেছে। ইন্দু ঘাটে আসবে কি না জানে না। স্টিমারঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে দেবার খবর আগেই পৌঁছে যায়। হাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে সুকুমার লাঠি হাতে অপেক্ষা করে নদীর পাড়ে। বাবা আসেন। ইন্দুও সঙ্গে আসে। কিন্তু বাচ্চু না গেলে ইন্দুর মন তো খারাপ করবেই। তার নাকি এক কথা, 'খুড়ামশাই, বাচ্চু এল না কেন?'

খুড়ামশাই কী জবাব দেবেন! বড়দাই বলবে, 'আসতে না চাইলে কী করা! পূজার নাও গেলেই কেবল পালিয়ে বেড়ায়।' এতে নাকি ইন্দুর মন আরও খারাপ হয়ে যেত। তারপর রেগে গিয়ে বলত,. আসুক না একবার, মজা বুঝবে।

বড় হবার মুখে বাচ্চু বুঝেছে, এসব ইন্দুর রাগের কথা। এবারে প্রায় সে বিনা নোটিশেই যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু পরে তার নামে বাবা এমনভাবে যখন নোটিশ জারি করেছেন, তখন ইন্দু নিশ্চয়ই জানবে, বাচ্চু ঠিক আসবে। যতই দুষ্ট আত্মা ভর করে থাকুক, সে তাকে নিতে ঘাটে না এসে পারে না।

স্টিমারঘাটের সেই টিমটিমে আলোটা বাচ্চু দূর থেকেও দেখতে পেল। গৌরহরিবাবু স্টেশনমাস্টার। একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে তিনি একা থাকেন। বাবার সঙ্গে খুব ভাব। নৌকার অপেক্ষায় বাবা ওঁর ঘরে একটা কাঠের টুলে এসে বসে থাকেন। খবরের কাগজ পড়েন। নেতাজির অন্তর্ধানের খবর নিয়ে বাবার মুখে কী গরিমা। 'দ্যাখ শয়তানেরা, এবার কী হয়! দেশ থেকে না-তাড়িয়ে তোদের ছাড়ছে না।'

বাবা এবং সুকুমার কেউ যে আসেনি সে দূর থেকেই টের পেল। এলে হ্যাজাক জ্বলত। অর্জুন গাছের নীচে কুয়াশার মতো জ্যোৎস্নায় বাবা তাকে নিয়ে কতদিন বসে থেকে বলেছেন, 'স্টিমার আসার সময় হয়ে গেছে।' তার কেন জানি মনে হত, বাবা বিজয়ার পরদিন থেকেই সাঁঝ লাগলে গৌরহরিজ্যাঠার ঘরে গিয়ে বসে থাকেন। নদীর জল দেখেন। স্টিমারঘাটে সাঁঝ লাগলে বাবার বসে থাকার নেশা।

একটা স্টিমার, তার আলো কত দূরের খবর বয়ে আনে। সেবারে সে অনেক দূর থেকে স্টিমারের আলো দেখেছিল। প্রথমে বুঝতেই পারেনি স্টিমারের আলো এরকমের হয়ে থাকে। স্টিমার নেই, কিন্তু বাউড়ের মুখে স্টিমার ঘোরার সময় যে সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, বাবাই তাকে প্রথম খবর দিয়েছিলেন। তার খুব ইচ্ছে হয়, স্টিমারে উঠে সবটা সে দেখে। কিন্তু সেবারে ইন্দুর এত রকমের হুজ্জোতি ছিল যে, স্টিমারে ওঠার কথাই মনে হয়নি।

দৈত্যের মতো স্টিমারটা। স্টিমারের পেটে খবরের কাগজ। বাবার কী

উৎকণ্ঠা— খবরের কাগজ কতক্ষণে হাতে পাবেন। সারা নদীর জলে কী বিশাল ঢেউ। দু'পাশের ডিঙিগুলো কাগজের নৌকার মতো টালমাটাল। পাড়ে এসে ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

স্টিমার চলে যাবার সময় সে আর ইন্দু একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। নদীর জলে পা ভিজেছে। যেন মনে হত, ওরা দৌড়োলে স্টিমারের আগে চলে যাবে। জলে টান থাকলে জ্যোৎস্নায় এভাবে ছুটে যাওয়ার সময় কত যে আছাড় খেত। আবার উঠে দাঁড়াত। স্টিমারের সঙ্গে তারা পারবে কেন। কিছুটা দূরে গিয়েই হাঁপাত। দু'জনে পাশাপাশি বসে স্টিমারের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখত। যেন এতক্ষণ সারা নদীতে যে প্রাণ জেগে উঠেছিল, স্টিমারটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই তা নিভে গেল। বড় নদীর পাড়ে ঘর-বাড়ি থাকলে কত সুবিধা, এমন মনে হত বাচ্চুর।

এবারে কী হবে কে জানে!

কলিমদ্দি তখন হাঁকছে, 'যে যার বাঁয়ে।'

কারণ স্টিমারঘাটে এসময় নৌকার ভিড় বেশি। যাত্রী নিয়ে যাবার জন্য। যাত্রী তুলে দেবার জন্য। যাত্রীরা স্টিমারঘাটে নেমে নৌকায় পাঁচ-দশ ক্রোশ খাল-বিল ভেঙে আবার নদী থেকে অন্য নদীতে। এ-কারণে কলিমদ্দি-অলিমদ্দি একখানা নাও সম্বল করে কত দেশে ঘুরে বেড়াতে পারে। কখনও সেই মধুমালার কিংবা শঙ্খকুমারের প্রস্তাব শুনতে শুনতে সে হাঁ হয়ে যায়। শঙ্খের ভিতর শাপভ্রষ্ট রাজকুমার তরবারি হাতে ঘোড়ায় চড়ে ছুটলে মনে হয়, সে নিজেই ছুটছে। একটা কালো রঙের ঘোড়াও তার কখনও কখনও বড় দরকারি মনে হয়। ঘোড়ার পিঠে সে আর ইন্দু ছুটছে।

দাদারা তার ঘাটের সিঁড়িতে নেমে যেতে থাকল। সে বুঝল না, সুকুমারদা আসেনি কেন। হ্যাজাক-বাতি জ্বললে সে টের পেত সুকুমারদা আসছে। তবে কি বাবাও আসেননি? ঘাট থেকে স্টেশনের কাছে গিয়ে দেখল, চুপচাপ হারিকেন হাতে বসে আছে রামসুন্দর।

বাবা আসেননি।

ইন্দুও না।

মনটা বেজায় দমে গেল।

রামসুন্দর এবার আরও বুড়ো হয়ে গেছে। ফতুয়া গায়ে, হাতে লাঠি, সে চোখেও ভাল দেখতে পায় না। অলিমদ্দি গিয়ে খবর দিল, বাবুরা এয়েছেন। বাঙ্কুদের সঙ্গে কালো একটা ট্রাঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই। অলিমদ্দি ট্রাঙ্কটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামসুন্দর লাঠি ভর করে হাঁটছে।

বাঙ্কু আর পারল না, বলল, 'বাবা আসেনি কেন?'

যেন বাবা না-এলে, তাদের এই পূজা দেখতে আসা গায়ে পড়ে। ইন্দু না-আসায় বাঙ্কুর এটা আরও বেশি মনে হয়েছে। তাদের জন্য তবে কেউ অপেক্ষায় নেই। না ইন্দু, না বাবা, এমনকী কোনওবার বাবুমশাইয়ের মেজপুত্র ছোটপুত্রও দাদাদের নিয়ে যাবার জন্য স্টিমারঘাটে হাজির থাকে। এবারে কেউ না। বাঙ্কু খুবই দমে গেল। ইন্দুর তবে সত্যি ঘোর বিপদ।

স্টিমারঘাট থেকে সোজা সড়ক, কিছুটা গিয়ে দু'পাশের বড় বড় ঝাউগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রথমেই পড়ে সাত আনা জমিদার সূর্যকান্তবাবুর প্রাসাদ, মাঠ, ফলের বাগান। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সেবারে বাঙ্কু অবাক হয়ে দেখেছিল সব। জেনারেটারের শব্দ ঠিকই শোনা যাচ্ছে। ভটভট করছে। পূজার ক'দিন সাত আনা জমিদারবাড়িতেই জেনারেটারে আলোকসজ্জা তৈরি করা হয়। যেমন সূর্যকান্তবাবুর শখের চিড়িয়াখানাতেও আলোর বাহার। ছবির মতো সব গাছপালা লাগানো, নীচে গ্যাসবাতিও জ্বলছে। আলোর মালা পরে দিঘি, মাঠ পার হয়ে প্রাসাদ সেজে আছে অপ্সরার মতো। ঢাকের বাদ্য নদীর জল বেয়ে যেন উঠে আসছে। মানুষজনের চলাচলও ঠিক সেবারের মতো। কোথাও এতটুকু অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের সামান্যতম আভাস নেই।

অথচ সুকুমার ছিল না। হ্যাজাকবাতি নিয়ে সড়ক ধরে কেউ তাদের নিতে এল না। হারিকেনের আলো এত ম্রিয়মাণ যে বাঙ্কু ভেবেই পেল না, কেন এটা রামসুন্দর নিয়ে এসেছে। রাস্তায় এবং গাছের ছায়ায় দূরবর্তী গাছপালার ভিতর থেকে আলো এসে চুঁইয়ে পড়ছে। জ্যোৎস্না উঠেছে। অকারণ এই হারিকেন নিয়ে রামসুন্দর কেন যে তাদের অপেক্ষায় ঘাটে বসে ছিল, সে বুঝতে পারছে না। ওর বুক ঢিপঢিপ করছে। অথচ ইন্দু সম্পর্কে কোনও খবরও নিতে পারছে না। আগের মতো ইন্দু সম্পর্কে খোলামেলা ভাবনা ভাবতে পারছে না। সংকোচ হচ্ছে তার। কেন এত সংকোচ তাও সে বুঝে

উঠতে পারছে না। ইন্দু বড় হয়ে গেছে— ইন্দুকে কী অবস্থায় যে সে গিয়ে দেখবে!

পুরনো বাড়ির দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তায় ল্যান্ডোতে সে কতবার ইন্দুর সঙ্গে গেছে। কেমন সব ছাড়া বাড়ি, ভগ্ন প্রাসাদ, তারপর স্কুলবাড়ি, এবং আরও পরে বিশাল দিঘির পাড়ে সেই আশ্রম— যেখানে বাবা এবং সে গড় হয়েছিল। বেঁচে থাকার জন্য এসবের দরকার, বাবা বলেছিলেন। বাবুমশাইয়ের গুরুদেব সর্বজ্ঞ, সে কেন বাবুমশাইয়ের অহিত হয় এমন কাজ করবে! তবে কৃষ্ণপদদার জীবনরক্ষা, এবং আরও-সব দৈবঘটনা, তাকে কিছুটা বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে। সে দৌড়ে গিয়ে যে অন্দরে ঢুকে ডাকবে, ইন্দু, ইন্দু তুই কোথায়? সে সাহসও আর তার নেই। কারণ ইন্দুর মাঝে মাঝে স্মৃতিবিভ্রম হয়। সে যদি তাকে চিনতেই না পারে সে মুহূর্তে।

দাদারা ইন্দুকে নিয়ে ভাবছেই না। তাদের কাছে এ-দেশটা তার চেয়ে বেশি চেনা। বড়দা মেজদা আগে আগে চলে গেছে। সেজদাও। কেবল সে রামসুন্দরের সঙ্গে হাঁটছে। দৌড়ে আগে যেতে পারছে না।

রামসুন্দরকে একা পেয়ে কিছুটা যেন ভরসা পেল। কারণ সে দেখেছে, এই বুড়ো মানুষটা বাবুমশাইয়ের নিমকের দাম দেয়। জরাজীর্ণ শরীর। তবু তার ছুটি মেলেনি। নদীর পাড়ে কাছারিবাড়ি সংলগ্ন একটা তালপাতার ঘরে সে থাকে। ঘরটায় সে দুটো বল্লমও দেখেছে । এককালে সে নাকি বাবুমশাইয়ের দেহরক্ষী ছিল। বন্দুকের টিপ তার এত প্রবল যে, পাখি উড়ে গেলে নামিয়ে আনতে পারে। বুড়ো বয়সেও তার এই অব্যর্থ টিপ নিয়ে বাবা গল্প করতেন। কোনও কাজই নেই। ইন্দু বাইরে থাকলে, সেবারে সে দেখেছে, তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনও কাজই ছিল না। তখন চোখে বোধহয় এতটা কম দেখত না।

কাজেই রামসুন্দর ইন্দুরও বিশ্বাসী লোক। তাকে সে অনায়াসে ইন্দু সম্পর্কে দুটো-একটা প্রশ্ন করে খবর নিতে পারে। এবং এমন মনে হতেই সে বলল, 'রামুদা, ইন্দুর কী হয়েছে!'

রামুদা বড় একটা শ্বাস ফেলে শুধু বলল, 'যাচ্ছেন তো, দেখতে পাবেন।'

ইন্দু কি তবে মরে যাবে। ইন্দু যদি মরেই যায় কিংবা ইন্দুর যদি স্মৃতিবিভ্রমই ঘটে তবে তাকে চিঠি লেখে কী করে। সে বোকার মতো বলল, 'কী হয়েছে বলবে তো।'

রামসুন্দর হাতের লাঠি এবার বগলে নিয়ে বাচ্চুর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না, তবে কপালে কার কী লেখা থাকে কেউ বলতে পারে না।' তারপরই সে হাত জোড় করে প্রণাম করল, কাকে সে জানে না। কেমন বিহ্বল চোখে শুধু তাকিয়েই আছে। বলল, 'ইন্দুদি নাকি অপঘাতে মারা যাবে। তার চোদ্দো বছর বয়সটা খুব খারাপ বয়স।'

'কে বলেছে খারাপ বয়স!'

রামসুন্দর হাঁটছে। কথা বলছে না।

'রামুদা!'

'সত্যি কী হয়েছে আমরা কেউ জানি না। কেন অপঘাতে যাবে তাও জানি না। কিন্তু অবতার তিনি, তিনি তো সব জানেন। ইন্দুদি নাকি আত্মঘাতীও হতে পারে। আবার দেবতার পায়ে ইন্দুদিকে উচ্ছুগ্গু করতে পারেন হুজুর। কী হবে বলতে পারব না।'

পরি-রহস্য আর মাথায় থাকে। সে বলল, 'আমি বলছি, সর্বজ্ঞ কিছু জানে না।'

সহসা রামসুন্দর সাপ দেখার মতো আঁতকে উঠল। 'ও-কথা বাচ্চুবাবু বলতে নেই। সব তিনি টের পান। মাথায় হাত রাখলে যমে ডরায়।'

বাচ্চু কেন ছেড়ে কথা বলবে! সে বলল, 'কই, আমার অভিসন্ধির কথা তো তিনি টের পাননি!'

'পেয়েছেন কি পাননি জানলেন কী করে!'

এ-দিকটা অবশ্য ভেবে দেখেনি। তবে অভিসন্ধির কথা টের পেলে, তাকেও যে কোনও আতঙ্কে ফেলে দেবে না কে জানে। অন্তত সে বাবার কাছে না গেলে ঠিক টের পাবে না। হয়তো বাবাকে বলে দিয়েছে তোমার সন্তানটির মাথায় কু-মতলব আছে। ওকে সাবধানে থাকতে বোলো। সে ভেবেছেটা কী!

আর এ সময়ই দেখল, কাছারিবাড়ির লনের সামনে ভিড়। বাবা,

রক্ষিতমশাই এবং পাইক পেয়াদারা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ভিড় সামলাচ্ছে। কারণ সর্বজ্ঞ এখন মঠের ভিতর বসে, তাঁর গুরুগম্ভীর আওয়াজ— রামসুন্দর তাকে ভিড় ঠেলে, কাছারিবাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মাইক গমগম করে উঠল।

তিনি মঠের গোপন কুঠরি থেকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন— বলছেন, 'দেবী দুর্গার অপর এক নাম শাকম্ভরী। লক্ষ্মীতন্ত্রে তার উল্লেখ আছে।'

বাচ্চু দেখল, নদীর পাড়ে মানুষজন করজোড়ে দাঁড়িয়ে সেই অমোঘ বাক্যমাল্য সাগ্রহে শুনছে।

বাচ্চুর মধ্যে কেমন ত্রাস সঞ্চার হচ্ছে। সে বাবাকে দেখল, দূরে হ্যাজাকের পাশে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তারা যে এসেছে, সে ব্যাপারেও বাবা কেমন উদাসীন। বাবা সেখানটায় হাজির বলেই দীন-দরিদ্ররা কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। আসলে তারা সবাই অবতারস্বরূপ সর্বজ্ঞের সন্দর্শনে এসেছে। কিন্তু নিষেধ। তিনি যে-ক'দিন অবস্থান করবেন, কেউ তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে পারবে না। তিনি অদৃশ্য কুঠরি থেকে শুধু ঈশ্বরের লীলার কথা প্রচার করবেন। আজ বোধন, তাই শ্রীশ্রী দেবীমাহাত্ম্য প্রচার একটি উৎকৃষ্ট কর্ম ভেবেই অন্তরাল থেকে সব বলে যাচ্ছেন। সেই গোপন কুঠরির মধ্যে আর কারা আছে তাও বাচ্চু জানে না। এখন তার জামা-প্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেবার কথা। দাদারা সেসব কাজেই ব্যস্ত। কিন্তু সে যে বড় উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে।

১৪

আসার মুখে বাবা একটা কথা বললেন না। যেন বাবা তাকে চিনতেই পারেননি। কাছারিঘর ফাঁকা। রামসুন্দর তাদের ঘর দেখিয়ে চলে গেছে জামা-প্যান্ট ছেড়ে হাত-মুখ ধোওয়ার কথা তার আর মনে থাকল না। ই কোথায় কে জানে! একমাত্র ইন্দুই তাকে ত্রাস থেকে উদ্ধার করতে পারত। সে কাছারিবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, মঠের দিক থেকে গমগম করে মাই

বাজছে। তা হলে সেখানে সবাই থাকতে পারে। সে এক দৌড়ে বাবার কাছে চলে গেল। ঢিপ করে প্রণামও সেরে ফেলল। এখানে এলেই, বাবুমশাই, বাবার বউঠান এবং গুরুজনদের প্রথমে প্রণাম সেরে ফেলার কাজ থাকে। সে কাজটা আজ বাবাকে দিয়ে শুরু করেছে। কারণ বাবা যদি ইন্দু সম্পর্কে কোনও খবর দেন। ইন্দু সম্পর্কে বাবাই চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বাবার মেজাজ ভাল না। কেবল বললেন, 'রাস্তায় কোনও অসুবিধা হয়নি তো?'

সে মাথা নাড়ল।

'যাও, হাত-পা ধুয়ে মঠের চাতালে গিয়ে বোসো।'

এমন তো হয় না। এলেই বাবা তাদের আগে ভিতর-মহলে পাঠিয়ে দেন। আজ সেসব কিছুই বললেন না। ভিতর-মহলে বাবা না-বললে যেতেও পারে না। কিন্তু সে যে ইন্দুকে দেখার জন্য এতটা অস্থির হয়ে পড়বে বুঝতে পারেনি। আগের মতো সে কেন অকপট হতে পারছে না। তবু সে না পেরে বলল, 'বাবা, আমি ভিতরে যাচ্ছি।'

'কেন?'

এ বাবা কি তার বাবা! না অন্য কোনও মানুষ? 'কেন' বলছেন! সেবারে তো আসার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, 'যাও, ভিতরে যাও। এই সুকুমার, ওদের বউঠানের কাছে নিয়ে যা।' এবারে বাবা বলছেন, 'কেন!'

কত লোক নদীর পাড়ে, চরে গিজগিজ করছে। পাঁচিল টপকে কেউ ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে মাথায় লাঠি পড়ছে। আর সেই অমোঘ উচ্চারণ ভেসে আসছে— এই রূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবী দুর্গম নামে এক মহাসুরকে বধ করবেন বলে শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে। তাই দেবীর অপর নাম দুর্গা। সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শরৎ ঋতুকে দেবার্চনার প্রশস্ত সময় বলা হয়েছে। সেই হেতু শরৎ ঋতুর প্রশস্ত সময় এই মহালয়া থেকেই দেবীপক্ষের সূচনা এবং জগন্মাতা দেবী দুর্গার আবাহন ও পূজার পক্ষেও যথোপযুক্ত কাল।

বাচ্চু কিছুই শুনছিল না। দাদারা মঠের দিকে চলে যাচ্ছে। সে গেল না। সদর দেউড়ি পার হয়ে ঠাকুরদালানে যেতেই তার বুক আবার কেঁপে উঠল। শুধু প্রতিমা। সামনে একটা গ্যাসবাতি জ্বলছে। ঢাক বাজছে না। ধূপ পুড়ছে না, দীপ জ্বলছে না। কেউ নেই, সব খাঁ খাঁ করছে। সব খালি। এবারে কি তবে

পুজা দায়সারাভাবে হবে। তবে আসা কেন! ইন্দুর ঘোর বিপদ বলে কি দেবী দুর্গাও এত একা।

সে পারছিল না! কেবল দেখল, শৈলমাসি দোতলায় ওঠার মুখের সিঁড়িতে বসে ঝিমোচ্ছে। সে জানে, এই সিঁড়ি ধরে গেলে ইন্দুর ঘর পাওয়া যাবে। অন্দরমহলের এদিকটায় ওপাশ থেকে একটা লোহার সিঁড়ি ধরেও ওঠা যায়। ভিতরে ঢুকেই মনে হল কোনও নিষিদ্ধ জায়গায় সে ঢুকে গেছে— কেউ তাকে তেড়েও আসতে পারে। বড় বড় খিড়কির জানালা, ঝাড়লণ্ঠন পার হয়ে যাচ্ছে। কেমন এক পরিত্যক্ত আবাস— সে ভয়ে কোনওরকমে ইন্দুর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, কেউ নেই। দরজা-জানালা হাট করে খোলা। এমনকী টেবিলে ইন্দু যেন এইমাত্র পড়াশোনা করছিল, পড়তে পড়তে কোথাও গেছে। তার বই খোলা। আর তারপরই মনে হল তার— আসলে কি সে কোনও ভুতুড়ে বাড়িতে ঢুকে গেছে! কেবল গো-শালার দিকে নেমে গেলে সেখানে ভজনকে দেখতে পেল। ভজনদা গোরুগুলিকে জাবনা দিচ্ছে। রাতের বেলা, ঘরে ঘরে আলোও জ্বলছে না— কেবল সিঁড়ির মুখে মুখে হারিকেন জ্বালা— বারমহলে হ্যাজাক বাতি জ্বালানো, যত ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল তত অন্ধকার— সে ইন্দুকে খুঁজছে।

সে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। বাড়ি খালি করে সবাই কি তবে মঠের চাতালে গিয়ে বসেছে। অবতার সর্বজ্ঞ দেবীর স্বরূপ বর্ণনা করছেন— দৈত্যরাজ মহিষাসুরের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের একশো বছর যুদ্ধ হয়। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক সন্ত্রস্ত। দেবলোক ছেড়ে তারা মর্তলোকে পলাতক। তাই অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করে দেবলোক ফিরে পাওয়ার জন্যই দেবতাদের তেজোরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে মহিষাসুরমর্দিনী মহামায়া দুর্গার সৃষ্টি। প্রাসাদের ভিতর থেকেও বাচ্চু সর্বজ্ঞের দেবী-বর্ণনা শুনতে পাচ্ছে।

তেজোরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে— মহলের পর মহলে প্রতিধ্বনি উঠছে। বাচ্চু ওই প্রায়-অন্ধকার প্রাসাদে একসময় পথ হারিয়ে ফেলল, সে জানেই না, শৈলমাসির সিঁড়িটা কোন দিকে। কারণ সে বুঝেছে, ইন্দুকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে বোকার মতো কাজটা করে ফেলেছে, এটা যে কোন মহল সে বুঝতেই পারছে না। দোতলার ওদিকটা চিক-ফেলা, সে ঘুরেফিরে

একই মহলে চলে আসছে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। যেন এইমাত্র কেউ কোনও জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে যাবে। এমনকী ছাদে ওঠার সিঁড়িটাও খুঁজে পাচ্ছে না। পেলে ছাদে উঠে চিৎকার করতে পারত, কোনও এক অদৃশ্য শক্তি মন্ত্রবলে তার বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সে হাঁপাচ্ছিল— সেই লোহার সিঁড়িটাও নেই, ভোজবাজির মতো সব উধাও। সে বোধহয় সংজ্ঞা হারাত— এমন এক নিয়তি তার জন্য অপেক্ষা করবে সে জানত না। আর তখনই মনে হল পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে। বলছে, 'কী রে, বাচ্চু, তুই।'

'কে?'

সে পেছনে দেখল কেউ না।

ঠিক ইন্দুর গলা।

সে ডাকল, 'ইন্দু।'

কোনও সাড়া নেই।

সে জোরে চিৎকার করে উঠল, 'ইন্দু, আমি পথ পাচ্ছি না বের হওয়ার।'

কোনও সাড়া নেই।

সে আর পারল না। বুঝল, আসলে সত্যি এই প্রাসাদে আর মানুষ বসবাস করে না। তেনারা তাকে ষড়যন্ত্র করে এখানটায় নিয়ে এসেছেন। দাদারাও কেউ যে মানুষ মনে হল না। ভূতের ছলনা। এমনকী বাবার চিঠি, বড়পিসি, অলিমদ্দি, কলিমদ্দি সব। যে নৌকায় এসেছে তাও ভুতুড়ে নাও। যে বাবা বসে ছিলেন তিনিও ভূতের কোনও দোসর। তারপরই মনে হল, তা হবে কেন! তিনি তো মঠের চাতালে যেতে বলেছিলেন। সেই তো ইন্দুকে সদর দেউড়ি পার হয়ে খুঁজতে এসেছে ভিতরে। একবারও ভাবতে পারেনি অসুস্থ ইন্দু চাতালে গিয়ে বসে থাকতে পারে।

আর তখনই সুদূরে জ্যাঠামশাইয়ের অবজ্ঞার হাসি শুনতে পেল, 'তোরা কী রে! এত ভয়, বাঁশবাগান পার হওয়ার সময় ছুটছিলি। খেজুরতলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। দ্যাখ বাচ্চু, সব ঘোর থেকে হয়। ঘোরে পড়ে হয়। ঘোরে পড়ে দেবী-দর্শন, ভয় থেকেও ঘোর উপস্থিত হতে পারে। তোকে কেউ ডাকেনি। সেয়ানা লোকেরা মানুষকে ঘোরে ফেলে মজা পায়। কত রকমের

ঘোর আছে বড় হলে বুঝবি।' যেমন তার জ্যাঠামশাই তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'তোর ভিতরেও ঘোর উপস্থিত। সারাটা দিন ইন্দুর কথা ভেবেছিস। ইন্দু তোকে ডাকতেই পারে। ঘোরে পড়ে গেলে বুদ্ধিনাশ হয়। মাথা ঠান্ডা করে সোজা চলে যা। ভয় পেলেই সব গেল।'

বাচ্চু কেমন জোর পেয়ে গেল। ডান দিকের বারান্দায় না-ঢুকে এবারে পার হয়ে গেল। মহলগুলি চারপাশেই করিডর দিয়ে ঘেরা। আসলে নাটমন্দিরের দিকটাতে সিঁড়ি। সে তা ভুলেই গিয়েছিল। এবার শৈলমাসিকে দেখতে পেল। মশায় কামড়াচ্ছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে বোধহয়। সে পা টিপে টিপে এক দৌড়ে নেমে গেল। এবং সোজা সদর দেউড়ি পার হয়ে চাতালে উঠে যেতেই দেখল, সবাই আছে। বাবুমশাই, বাবার বউঠান মানে তার জেঠিমা, বড়দা-মেজদারা, অন্য জমিদার গিন্নিরাও, এমনকী মাতঙ্গীর মা, সেও। কেবল ইন্দু নেই। ইন্দু নেই, মানে ফ্রকপরা কোনও মেয়ে বসে নেই। সে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। টের পেয়ে কে যেন ইশারায় তাকে বসতে বলল। অবতার সর্বজ্ঞ পদ্মাসনে বসে আছেন। গলায় পদ্মফুলের মালা। ধূপ-দীপের ঘ্রাণ, আতরের গন্ধ। গোপন কুঠরিতে মাত্র একটা প্রদীপ জ্বলছে। এক রহস্যময় পৃথিবী। সর্বজ্ঞর মাথা ন্যাড়া, গলায় পাথরের মালা, দামি হিরে-জহরত দিয়ে হয়তো তৈরি, কারণ স্তিমিত আলোতেও পাথরের ছটা বের হচ্ছিল। সবাই চোখ বুজে আছে। প্রার্থনা করছে।

সর্বজ্ঞ গরদের আলখাল্লা পরেছেন।

সর্বজ্ঞের চোখে জল।

কেন এই অশ্রুপাত সে বুঝতে পারছে না। সর্বজ্ঞ, মানে বাবুমশাইয়ের বাবাঠাকুর কি ঈশ্বরলাভের জন্য অশ্রুপাত করছেন। এসব ভাববার সময় অবশ্য বাচ্চুর নেই। সে পিছনে বসেছে ঠিক, তবে হাঁটুর উপর ভর করে মাঝে মাঝেই খুঁজছে কাউকে। চাতাল-ভরতি মানুষের ভিতর ইন্দু থাকবে না, হয় না।

মঠের দেওয়ালে আর কোনও উপনিষদের বাণী লেখা নেই। আগে সে এই মঠের দেওয়ালে গুরুগম্ভীর মন্ত্রগুলি পড়ার চেষ্টা করত। বাবা বলেছিলেন, সব উপনিষদ থেকে নেওয়া। সে বানান করে পড়ত। এখন এখানে-সেখানে

পাথরে খোদাই করা বাণী, 'গুরু ভজ গুরু কহ, লহ গুরুর নাম রে।'

বাচ্চু তখনই দেখতে পেল একেবারে সামনের দিকে গোপন কুঠরির দরজায় কেউ বসে আছে। ধূপের ধোঁয়া কমে যেতেই বুঝল, আরে ওই তো ইন্দু। ইস, ইন্দু আর সেই ইন্দু নেই। লালপেড়ে গরদ, লাল শাটিনের ব্লাউজ গায়ে। মাথায় বড় চুলে খোঁপা। ইন্দু তো! না অন্য কেউ! ইন্দুকে যেন মাথায় বোঝা চাপিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সোজা— মেরুদণ্ড সোজা। ঘাড় সোজা। তবু ইন্দু যেন কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠছে। বোধহয় এভাবে বসে থাকতে তার কষ্ট। কেন যে সে চোখ ফেরাল, আর বাচ্চু মুখ তুলে দিল— তার কোনও হেতু জানা নেই। বাচ্চু এসে গেছে! ইন্দু বোধহয় ছুটেই আসত।

আর তখনই সর্বজ্ঞ 'মা মা' বলে হাঁক পাড়লেন। 'মা, মাগো কৈবল্যদায়িনী।' তারপর দীক্ষায় লগ্ন ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন।

তাঁর আর অশ্রুপাত নেই।

কেউ টুঁ-শব্দটি করছে না। কে জানে তিনি কার বাসনা জেনে কী বলবেন! সবাই বেশ উচাটনে আছে। সে বাবুমশাইকেও দেখতে পেল। তিনি কেমন অস্থিচর্মসার হয়ে গেছেন। তাঁর প্রিয় কন্যার বিপদে মাথা ঠিক না থাকতেও পারে। সব তিনি গুরুর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করে কন্যার জীবন ভিক্ষা করতে পারেন।

সে বুঝল না, সর্বজ্ঞ এত তটস্থ করে রেখেছেন কী করে সবাইকে। তার ভয়ও আছে, কিন্তু সর্বজ্ঞ যে দৈব নন, সেটা সে টের পেয়েছে। সুযোগ পেলে বাবাকে বলত। বাবা তাকে বলতেন, 'বাবাঠাকুরের কোপে পড়িস না বাচ্চু। বাবাঠাকুরকে নিয়ে তামাশা করিস না। তাঁর অভিসন্ধির কথা কেউ জানে না।' ইন্দুকে এই খবরটা দিলে নিশ্চয়ই সাহস পাবে। বাবাঠাকুর বলেছেন বলেই ক'বছর পর অপঘাতে যাবে, না হয় আত্মঘাতী হবে, ঠিক না। জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে জেনেছে, মানুষের নিয়তি মানুষ কখনও বলতে পারে না। যদি বলে, ধরে নিতে হবে মিছে কথা বলছে। আন্দাজে ঢিল ছুড়ছে।

সর্বজ্ঞ তখনও বলে যাচ্ছেন, 'তান্ত্রিক কুমারী-পূজায় বংশ রক্ষা হয়। কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুলদেবী। মহাশক্তিরূপা কুমারীর পূজা করলে, সমস্ত জগৎ, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতারা পরিতুষ্ট হন। এবং যজমান ইহলোকে সর্ব সম্পত্তি লাভ করে অন্তে পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

'শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেরই যোগিনীরূপা কুমারীর পূজা করা কর্তব্য। এবার করালবদনা মহাকালীর পূজায় আমার সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। ইন্দুমতী এখন ভৈরবী। কুমারী-পূজার প্রশস্ত সময়। দ্বাদশ বর্ষে কুমারী ভৈরবী রূপে খ্যাত। দ্বাদশবর্ষা ভৈরবীকে আমার প্রণাম।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভে গেল। এবং সব অন্ধকার। কোথা দিয়ে যে সর্বজ্ঞ অন্তর্ধান করলেন, বাচ্চু বুঝতে পারল না। ইন্দু তো চতুর্দশবর্ষীয়া, সে কী করে দ্বাদশবর্ষীয়া হয় বাচ্চু তাও বুঝতে পারল না।

কেবল আলো জ্বলে উঠলে দেখা গেল, বাবুমশাইকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাচ্চুর এত কষ্ট হচ্ছিল দেখে যে চোখে জল এসে গেল। সারা প্রাসাদে ভয়ংকর কালো ছায়া নেমে এসেছে টের পেল। ইন্দু পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় বলল, 'বাচ্চু, সকালে কাছারিবাড়ির বারান্দায় বসে থাকবি। মনে রাখবি, সকালে। খুব সকালে।'

আর কিছু বলতে পারল না। সর্বজ্ঞর চেলারা তাকে ঘিরে নিয়ে যাচ্ছে। গোপনে সে আর কোনও কথা বলার অবকাশ পেল না।

ইন্দু মাথা নিচু করে করে চলে যাচ্ছে।

ইন্দু সামান্য ক্ষীণকায় হয়ে গেছে। ইন্দুর চোখে জ্বালা সে টের পেয়েছে। তার চোখে আগুন ঝরছে। ইন্দুর সেই চঞ্চল স্বভাবও আর নেই। ইন্দু আগে ছিল পরি, এখন হয়ে গেল দেবী।

কুমারী পূজা দেবী পূজা!

ইন্দুকে কি লোকটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিতে চায়! সেই ঘোর, যা মানুষকে জীবন থেকে সরিয়ে নেয়। কিংবা বাবুমশাই কি, ইন্দুর যাই হোক, জীবনে বেঁচে থাকাটাই বেশি শ্রেয় মনে করেছেন। ইন্দুর উপর নজরদারি চলছে তাও সে টের পেল। কারণ ইন্দু তাকে সঙ্গে যেতে বলেনি। তার তো কত কথা ছিল! কেন চিঠি? নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে কেন? ওর উপর কি দেবীর নামে নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে? যেভাবে সব মানুষজনকে সর্বজ্ঞ আবিষ্ট করে রেখেছেন, তাঁর হাত থেকে ইন্দুর নিষ্কৃতি কীভাবে মিলবে তাও সে বুঝতে পারছে না।

১৫

বাচ্চু রাতে সেদিন ভাল ঘুমোতে পারল না। পেট ভরে খেতেও পারল না। ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেলে যা হয়। এত বড় প্রাসাদ। কাছারিবাড়ি, নদীর পাড়, হলুদের জমি, কিছুই তার মাথায় নেই। এমনকী এ-বাড়ির প্রিয় হাতি লক্ষ্মীর কথাও সে যেন ভুলে গেছে। কারণ প্রাসাদ জুড়ে এত হইচই, দাদারা কী পরিপাটি করে পোলাও, ছানার পায়েস, ছানার ডালনা আরও কত কী সব সুস্বাদু খাবার খেয়েছে। অথচ সে প্রায় হাত তুলেই বসে ছিল। ঠাকুর-দালানের উঠোনে সারি সারি পাত পড়েছিল— সারি সারি মানুষজন খাচ্ছে, ভোগের অন্নপ্রসাদ, সে খেতে পারেনি।

বাবা বলেছিলেন, 'তোমার শরীর খারাপ বাচ্চু। মুখে কিছু দিচ্ছ না। মুখ শুকনো! খাওয়ায় রুচি নেই! নাকি বাড়ির জন্য মন খারাপ।' বলে বাবা কপালে হাত দিয়ে তাপ দেখেছিলেন।

সে কেবল বলেছিল, 'আমার খেতে ভাল লাগছে না।'

'ছানার পায়েস নে। খেয়ে দেখ না!'

বাচ্চু জিভে সামান্য ঠেকিয়ে ঠেলে দিয়েছে পায়েস।

হলুদ-জমি কাছারিবাড়ির পেছনের দিকে। কাছারিবাড়ির শেষ ঘরটা তাদের। পেছনের দিকে বের হয়ে যাবার দরজা আছে ঘরটায়। বাচ্চু ঠিক বুঝতে পারে না, এই যে ঘরটায় তারা থাকে, এটা ইন্দুর কোনও অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাদের থাকার জন্য ঠিক হয়েছে কি না, না হলে পেছনে দরজা থাকবে কেন, দরজা খুলে ফেললেই হলুদের পাঁচ-সাত বিঘে জমি, জমিতে বড় আমগাছ, লিচুগাছ। দিনের বেলাতেও হলুদের জমিতে একা দাঁড়িয়ে থাকলে গা ছমছম করত সেবারে। ঘরে ঢালাও বিছানা— কুলুঙ্গিতে হারিকেন জ্বালা।

সে এমনিতেই একপাশে শোয়। তার শোওয়া ভাল না। ঘুমের মধ্যে সে লাথি ফাতিও মারে। তার পাশে কেউ শুতে চায় না। বড়দার বালিশ কিছুটা দূরে। সাদা ফরাশ পাতা। বালিশের সাদা ওয়াড় পাটভাঙা। মোটা গদি, শুলেই ঘুম চলে আসার কথা। কিন্তু বাচ্চুর ঘুম আসছে না। জানালা দিয়ে কিছুটা জ্যোৎস্নাও ঘরে ঢুকেছে। তার দিকটায় হারিকেনের আলো পৌঁছোয়

না। অন্ধকার মতো হয়ে থাকায় তার মাথার কাছে জ্যোৎস্না। তার যে ভয় আছে সে টের পেল জ্যোৎস্না দেখে। সে বড়দার দিকে একটু সরে যেতেই, মুখখিচুনি, 'এই সরে শো। ইস, কী যে করছিস না। কেবল আমার বালিশের কাছে চলে আসছিস। তোর হয়েছে কী।'

'কিছু তো হয়নি।'

'ঘুমোচ্ছিস না কেন। কেবল ছটফট করছিস। বাড়ির জন্য মন খারাপ?'

'হ্যাঁ, খারাপ, যাও।'

'বাচ্চু তোকে বলে দিচ্ছি,' মেজদা তেরিয়া হয়ে উঠল, 'এবারে ভ্যাক করে কেঁদে দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। কেমন যেন হয়ে গেছিস, বাড়ি থেকে বের হলেই মুখ গোমড়া। কত প্যাখনা দেখাবি বাচ্চু।'

'মেজদা, ভাল হবে না,' বলে সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হাতাহাতি শুরু করে দিল। কারণ তাকে বকাঝকা করায় সে চটে গেছে, তবে ইন্দুর কথা ভাবলেই সব রাগ জল হয়ে যায়। দাদারা তার পেছনে যতই লাগুক, সে মাথা ঠান্ডা রাখবে। কাছারিবাড়ির বারান্দায় তাকে ইন্দু বসে থাকতে বলেছে সকালে, মাথা গরম করে ফেললে সে কী বলতে কী ফাঁস করে দেবে, ভেবেই সতর্ক। দাদাদের দু'-একটি প্রশ্ন করতে পারত, আচ্ছা, ইন্দু কি আর কোনওদিন প্রাসাদের বাইরে বের হয়ে নদীর চরে দাঁড়াতে পারবে না, ইন্দু কি তার সঙ্গে আর কোনওদিন ল্যান্ডোতে বাড়ি বাড়ি পুজো দেখতে যেতে পারবে না। কিংবা হলুদের জমিতে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ইন্দু কি কোনওদিন তার হাত ধরে দূরে গিয়ে কু... উ করতে পারবে না।

তারপরই বাচ্চু ভাবে, সে কী পারবে। সেও তো বড় হয়ে গেছে। এমন সব কত ধন্দ যে মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। এত ধন্দ থাকলে মাথায় ঘুম আসে। দাদারা পারত। ঘুমোতে পারত। তার মাথায় কত বড় বোঝা, কারণ ইন্দুর কী বিপদ সে স্পষ্ট কিছু জানে না।

আসলে ইন্দুর চিঠি পেয়েই সে এসেছে। তাও আবার মা কালীর দিব্যি দিয়ে চিঠি। যেন চিঠি না লিখলে সে এবারেও মাঝি-বাড়ি গিয়ে পালিয়ে বসে থাকত। খোঁজো, কত খুঁজতে পারো। চিঠিটা যে খুব গোপন খবর ইন্দুর, এটাও তার মনে হয়েছে। কখন মুখ ফসকে বলে ফেলবে, জানিস দাদা, ইন্দু

না আমাকে মা কালীর দিব্যি দিয়ে চিঠি লিখেছে। আমাকে যেতে বলেছে। তোদের কেউ যেতে বলে। আমাকে বলেছে। চিঠি দিয়েছে বলে এসেছি, না দিলে আসতে বয়েই যেত। তোদের চেয়ে বাবুমশাইয়ের বাড়িতে আমার ইজ্জত কত বেশি এবারে বোঝ।

না, সে একদম কিছু বলেনি।

মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। মারামারি করতে গেলে মাথা গরম হতেই পারে। সে তার ইজ্জতের কথাও বলতে পারে। 'তোদের মতো আমি হাভাতে নই। পূজার নাও দেখলেই লাফিয়ে উঠে পড়ি না। এই দ্যাখ, কে আমাকে যেতে লিখেছে। ইন্দু নিজে লিখেছে। শুধু বাবুমশাইয়ের ইচ্ছেতে আসিনি। বাবার চিঠি পেয়েও নয়। আমাকে ইন্দু আসতে বলেছে বলে এসেছি। ইন্দুর কত বড় বিপদ জানিস!'

সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। একটা কথাও বলল না। কাল কোনও খবর পাবে ঠিক। ইন্দুর যথার্থ কী বিপদ সে জানতে পারবে। তারপরই মনে হল, কী দরকার ছিল সর্বজ্ঞের কাছে উচ্ছন্ন করে দেবার। উচ্ছন্ন করে দিলে কী হয় তাও সে জানে না। রামসুন্দরও সবকিছু খুলে বলেনি, কেমন এক অজানা আতঙ্ক ক্রমে তাকে গ্রাস করছে। ইন্দুর উপর সর্বজ্ঞ কী নির্যাতন চালাচ্ছে! ইন্দু এই নির্যাতনে পড়ে সত্যি শেষ না হয়ে যায়! ইন্দুর দেবী-মুখ তাকে এখন কাতর করছে। অসহ্য আগুনের জ্বালা যেন দেবীর চোখে।

সে সবার ছোট ঠিক, তবু ইন্দু সম্পর্কে বেশি খোঁজখবর নিতেও কেমন সংকোচ বোধ করছে। যেন তাকে আর এসব মানায় না— রক্ষিতজ্যাঠার কাছেও খবর নিতে পারত, ইন্দুকে কি গণ্ডি এঁকে দেওয়া হয়েছে! তার বাইরে গেলেই কি ইন্দুর মরণ লেখা আছে! ইন্দুকে একা না-পেলে সে কিছু জানতেও পারছে না। মঠের ভেতর থেকে ইন্দুকে যেন কড়া পাহারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নিমেষে তার পাশে এসে না দাঁড়ালে বুঝতেও পারত না, কাল কোথায় কখন ইন্দুর খবর পাবে।

ইন্দু মাথার মধ্যে দাপিয়ে বেড়ালে ঘুম আসে কী করে! দাদারা তার কষ্ট কিছুই বুঝছে না। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সবাই। কেবল তার চোখে ঘুম নেই।

ঘুমের মধ্যেও সে ইন্দুকে স্বপ্ন দেখল। ফ্রক-পরা ইন্দু ছুটছে নদীর চর ধরে।

কোঁচড়ে বিন্নির খই, লাল বাতাসা। স্টিমারের আলো নদীর চড়ায় পড়তেই কাশের জঙ্গলে হাত টেনে বসিয়ে দিল তাকে। জঙ্গলের ফাঁকে দেখল, স্টিমারটা চলে যাচ্ছে। আলো, ঢেউ, নদীর জল, এবং কে যেন কিছুক্ষণ পাখা মেলে উড়ে বেড়াল— আরে ওই তো ইন্দু, পরি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। সে ডাকছে, 'ইন্দু!' ইন্দু বলছে, 'আমি তোর পাশে বসে আছি। ষাঁড়ের মতো চিল্লাচ্ছিস কেন? নে খা।' বলে বিন্নির খই দিল খেতে। লাল বাতাসা দিল। নদীর চড়ায় বিন্নির খই খেতে খেতে দেখল, ইন্দু কখন হাতির পিঠে উঠে গেছে। হাতির পিঠে সে সাদা ফ্রক গায়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে লাট্টুর মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। ফ্রক তার শ্বেত জবার মতো ফুটে আছে কোমরের কাছটায়। তারপরই উড়ে এল, ভেসে গেল বাতাসে। নীচে নেমে বলল, 'ভয় পাস না, বাচ্চু। আমি এই। পাহাড়, নদ-নদী, উপত্যকা আমার বড় প্রিয়। তুই এসে গেছিস, আমার আর ভয় নেই। পাখা কেটে দিলেও আমি ভয় পাই না।'

সে দেখল, ইন্দুর চোখ আশ্চর্য প্রসন্ন।

তারপরই কী দেখছে!

বুক কাঁপছিল।

গলা শুকিয়ে উঠছে তার।

দেবী-প্রতিমা বিসর্জনের মতো ইন্দু পড়ে আছে নদীর চড়ায়। জল সরে গেছে। জলে-কাদায় পড়ে আছে দেবী। ঢাক বাজছে। ঢোল বাজছে। উলু দিচ্ছে। নদীর কুলুকুলু শব্দের মতো সেই আওয়াজ তাকে কেমন পাগল করে দিচ্ছে— সে চিৎকার করছে, ইন্দু, ওঠ। ইন্দু, তুই জলে-কাদায় পড়ে আছিস কেন? সে ছুটে গেল ইন্দুকে টেনে তোলার জন্য— এক বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। সব ঝাপসা। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইন্দু জলে ভেসে চলে যাচ্ছে। সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই দেখল ইন্দু হা-হা করে হাসছে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে। বলছে, 'তুই কী বোকা রে! আমি না, ওসব খড়কুটো। তুই তার পেছনে ছুটছিস! উঠে আয়।'

উঠে এল ঠিক, কিন্তু কোথাও আর সে ইন্দুকে দেখতে পেল না। ইন্দু নদীর চরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! যদি কোথাও থেকে 'কু-উ' শব্দ ভেসে

আসে। না, কোথাও কোনও শব্দ উঠছে না। নদী বয়ে যাচ্ছে, পাতা, খড়কুটো ভেসে চলে যাচ্ছে। বেগে নেমে যাচ্ছে নদী।

কিছু নেই। সব ফাঁকা।

চারপাশ অন্ধকার। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দূরে কোলাহল শুনতে পাচ্ছে, 'ডুবে গেল। ডুবে গেল।'

কে ডুবে গেল!

অন্ধকারে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে পড়ে গেল। আর ঘুমও ভেঙে গেল তার।

১৬

তার ঘুম ভেঙে গেলে সে কেমন নিরাশ হয়ে গেল। বুক বেয়ে তার কান্না উঠে আসছে। সে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। কাক ডাকছে। গাছপালা, পাখি, নদীর জল, ঘর-বাড়ি, সবই ঠিক আছে। দাদারাও ঘুমোচ্ছে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়!

যদি ইন্দুর কিছু হয়ে থাকে!

তার আর শুতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ বাবার ঘর পার হয়ে দরজা ঠেলে কাছারিবাড়ির বারান্দায় বের হয়ে এল। দরজার পাশেই লোহার বেঞ্চি পাতা।

বেঞ্চিতে সে চুপচাপ বসে পড়ল।

কিছু হলে অন্দরমহলে হইচই পড়ত। লোকজনের ছোটাছুটি থাকত। এখনও কেউ জেগে যায়নি। কেবল, সুকুমার হাতে ঘটি নিয়ে নদীর চড়ায় নেমে যাচ্ছে। এমনকী, রাস্তায়ও লোকজন চলাচল শুরু হয়নি।

নদী থেকে জেলেরা মাছ ধরে ফিরছে।

নাও নিয়ে তারা পাড়ের দিকে আসার জন্য বইঠা মারছে।

বাচ্চু বড় নিঃসঙ্গ।

সে বসেই থাকল। নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না। সামনের লন পার

হয়ে মঠের দিকটায় ঘুরে বেড়ালে হত। কিংবা পিলখানার মাঠে। তার যে কী মনে হল, যেন গেলেই সে দেখতে পাবে ইন্দু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গেলেই কোথাও থেকে সেই কু-উ শব্দ শুনতে পাবে।

একমাত্র ইন্দুই তাকে কু-উ শব্দ করে বলে দিতে পারে সে কোথায় আছে। সে উঠতে যাচ্ছিল, আবার মনে হল, ইন্দু তো তাকে কোথাও যেতে বলেনি সকালে। বারান্দায় বসে থাকতে বলেছে।

সেই সকাল কখন, কতক্ষণ।

এটাই তো সবচেয়ে সুন্দর সকাল— কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি, পুব আকাশ ফরসা হচ্ছে, এসময় যদি ইন্দু পালিয়ে চলে আসে। ইন্দু পারে না এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা যেন থাকতে পারে না।

সেদিন সকালে উঠে সবাই দেখল, বাচ্চু বারান্দায় বসে আছে। বাবা বের হয়েই তাকে দেখে বললেন, 'এত সকালে উঠে বসে আছিস!'

সে কিছু বলল না।

আসলে এরা তো কেউ জানে না, ইন্দু তাকে সকালবেলায় বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলেছে। ইন্দু যদি আসে— কিংবা ইন্দু কোনও খবর পাঠাতেই পারে। ইন্দু মঠের চাতালে তাকে দেখে এতটুকু অবাক হয়নি। যত বাধা-বিপত্তি থাক, তার চিঠি পেলে বাচ্চু না এসে থাকতে পারবে না, আগেই যেন সে জানত।

কিন্তু অবাক, কেউ আসছে না। সদর-দেউড়ি দিয়ে অন্দরমহল থেকে কত লোকজন এল গেল, কেউ তার দিকে তাকিয়েও গেল না। সবাই ব্যস্ত— বাবাঠাকুরের চেলা-চামুণ্ডাদের সেবাযত্নে কোনও ত্রুটি না হয়। কেউ নেংটি পরা, কেউ জটাজূটধারী, কেউ হাফহাতা ফতুয়া গায়। ধুতি পরনে। লম্বা টিকি মাথায়। কারও হাতে ত্রিশূল চকচক করছে। নদীর পাড়ে তাঁবু পড়েছে। মেলার মতো জমজমাট। বাবাঠাকুর কোথায় আছেন কেউ বোধহয় জানে না। একদল লোক খোল-করতাল নিয়ে মঠের চাতালে বাবাঠাকুরের নামগান গাইছে। এতসব সমারোহ দেখে বাচ্চু কেমন সত্যি তলিয়ে যাচ্ছে।

আর এ-সময় সে দেখল, বাতাসে ভেসে আসছে কাগজের একটা উড়োজাহাজ। হাওয়া ছিল। সে অবাক হয়ে গেল, আরে, এ তো ইন্দুর

সেই সংকেত। পুরনো বাড়িতে ইন্দু তাকে এভাবেই একবার সংকেত পাঠিয়েছিল।

সে কী করবে ঠিক করতে পারছে না। সে ছুটে গেলে ধরা পড়ে যাবে। ছুটে যাওয়া ঠিক হবে না। উড়োজাহাজটা ছাদের উপর দিয়ে ভেসে এসে ধুতুরা ফুলের ঝোপে পড়ে গেল। বাচ্চু যেন এবার রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। কারণ সবাই তাকে ফেলে চলে গেছে সকালের খাবার খেতে। তাকে নড়ানো যায়নি। সে হাত-মুখই ধোয়নি। যায় কী করে! আর ইন্দুর কোনও গুপ্তচর এসে যদি ফিরে যায়, কারণ একটা কাগজের উড়োজাহাজ গুপ্তচরের কাজ করবে সে কল্পনাই করতে পারেনি।

সে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকাল। না, কেউ লক্ষই করেনি। কত পাখপাখালি উড়ে যায়, কত পাতা হাওয়ায় ঝরে পড়ে, আর একটা সাদা কাগজ উড়োজাহাজ হয়ে ভেসে আসছে কে খেয়াল করে! বাচ্চু টান টান হয়ে দাঁড়াল। সে হাফপ্যান্ট উপরে টেনে, পকেটে হাত রেখে বড়ই অন্যমনস্কভাবে ওদিকটায় হেঁটে গেল। তারপর কাগজের আস্ত উড়োজাহাজটা পকেটে লুকিয়ে কাছারিবাড়িতে ফিরে এল এবং হলুদ জমিতে নেমে সে হাঁটতে থাকল।

প্রায় কোমরসমান হলুদের গাছ— লম্বা লম্বা পাতা কুয়াশায় ভেজা— তার ভিতর দিয়ে বাচ্চু হাঁটছে। আর চারপাশে লক্ষ রাখছে— সতর্ক নজর— একটা এরোপ্লেনে কী খবর আসতে পারে! সে আড়াল খুঁজছে। কিন্তু আড়াল নেই। নদীর পাড় থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে, কাছারিবাড়ির জানালা থেকেও— এমনকী সাত আনা জমিদারবাবুর সুপারির বাগানেও যে বাবাঠাকুরের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে না কে বলবে! এতসব চিন্তা মাথায় থাকলে যা হয়— সে ঠিকমতো ভাবতেই পারছে না কী করা উচিত। পকেটে এরোপ্লেন, বুক ধুকপুক করছে— অধীর আগ্রহ চিঠি পড়ার। এটা যে ইন্দুর চিঠি। ইন্দু এজন্যই তাকে কাছারিবাড়ির বারান্দায় সকালে বসে থাকতে বলেছে, কী যে এখন করে!

অগত্যা সে ঝুপ করে বসে পড়ল। হলুদ গাছের পাতা মাথার উপর হাওয়ায় দুলছে। কে বলবে জমির মধ্যে বাচ্চু নামে ছেলেটা এইমাত্র লুকিয়ে পড়ল। তারপর কাগজের উড়োজাহাজের ভাঁজ খুলে ফেলতেই অবাক।

চিঠিতে অদ্ভুত সব সংকেত। সংকেত কীসের তার কিছুই মাথায় আসছে না।

সুন্দর হস্তাক্ষরেও লেখা না। কেমন হিজিবিজি— স্পষ্ট নয় খুব। সে নুয়ে পড়ল আরও, যদি লেখা উদ্ধার করতে পারে। উপরে কী লিখেছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। তারপর পাতা ফাঁক করে কিছুটা নাক জাগিয়ে গাছের উপর টের পেল, ইন্দু তাকে সম্বোধন করেছে— 'লাল বাতাসা'। সে লাল বাতাসা হতে যাবে কেন। গোয়েন্দা কাহিনিতে এমন নাকি সাংকেতিক নাম থাকে। সে তবে লাল বাতাসা। নামটার মধ্যে সে কিছুটা মজাও পেল। তা হলে ইন্দুর কাছে সে এখন আর বাচ্চু নয়। লাল বাতাসা।

পরের শব্দটাও সে উদ্ধার করতে পেরেছে, 'নিষেধ'।

নিষেধ কেন? অ, ইন্দুর বাইরে বের হওয়া নিষেধ। তার সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। হুকুম। আচ্ছা! বাচ্চু নিজের গুরুত্ব কতখানি টের পেয়ে ভাবল, তবে চিঠি কেন! বাচ্চু যেন আসে— লেখা কেন!

আরে এটা আবার কী? 'জ্যোৎস্না', জ্যোৎস্না কেন! জ্যোৎস্নায় তারা কী করবে! ঘুরে বেড়াবে! ইন্দু বের হবে কী করে! না, মাথামুন্ডু চিঠির উদ্ধার করাই কঠিন।

ইন্দুর হস্তাক্ষর তো বেশ সুন্দর। অথচ ঠিকমতো কিছুই গুছিয়ে লিখতে পারেনি। স্মৃতিভ্রম তবে। মনে হয়, ভুলে যায়, আবার মনে পড়ে, মনে পড়লেই টুক করে লিখে ফেলা, লিখতে গিয়ে কেন লিখছে ভুলে যাওয়া, কিছু একটা ইন্দুর হয়েছে।

পরে লিখেছে, 'হলুদের জমি পার হয়ে পাঁচিল'। 'সুপারির বন'। 'দড়ি'। 'রাত দশটা'। বড়দার গোয়েন্দাকাহিনির মতো একেবারে। বড়দা শহরে থাকে— গোয়েন্দাকাহিনির পোকা। বড়দার মুখে অনেক সাংকেতিক নাম কিংবা চিঠির কথা শুনেছে। সেখানে কোথাও একটা 'এস' অক্ষর দিয়ে একজন গোয়েন্দা এমন মোক্ষম খবর পাঠিয়েছিলেন যে সবাই ধরা পড়ে গিয়েছিল। শেষে কোটি টাকার চোরাই সোনা উদ্ধার।

বাচ্চু বেশ রোমাঞ্চ বোধ করছে। ইন্দু তাকে আর বোকা ভাবে না। তবে ইন্দুর একটা সরল চিঠি উড়োজাহাজটায় পাবে আশা করেছিল— তা না পেয়ে কিছুটা সে হতাশও হয়েছে।

তারপরই আবার কেন যে মনে হয়, ইন্দু কি পুরো বাক্য গঠন করতে পারে না! স্মৃতিবিভ্রমই হবে। না, তার কিছু ভাল লাগছে না!

অকারণ সব। কোনও অর্থই হয় না। সকাল থেকে বসে থাকাই ভুল হয়েছে! এমন সব সংকেত জেনে তার কষ্ট হবে। সে কিছুটা ইন্দুর উপর খেপেও গেল। চিঠিটা সে ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল।

তখনই কেন যে পোকায় কামড়াল বাচ্চুকে— মগজে পোকার কামড়। কুমারীপূজা! ইন্দু কুমারী। তাকে পূজা করা হবে? কে করবে? কেন করবে? ইন্দু কি দেবী? দেবী না হলে তার পূজা হবে কেন! সর্বজ্ঞ কি টের পেয়েছে, ইন্দুর মধ্যে অলৌকিক সব ক্ষমতা আছে? দেবীর লক্ষণ আছে— ইন্দুকে পূজা দিয়ে সর্বজ্ঞ কী লাভ করতে চায়! তাকে এতসব চিন্তাভাবনা ঘোরে ফেলে দিচ্ছে।

ভৈরবী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী হবে কেন ইন্দু। ইন্দু যে ঠিক আরও দশটা মেয়ের মতো। সে মরতে কেন ভৈরবী হতে যাবে! বাবুমশাই তবে সত্যি কোনও দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়ে গেছেন!

বাচ্চু চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েই দেখল, একেবারে নীচে— অস্পষ্ট হস্তাক্ষর। লেখার সময় হাতে যেন একেবারেই জোর পায়নি ইন্দু।

হলুদ পাতার জঙ্গল থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। আবছা অন্ধকার নেই। আলোতে সব স্পষ্ট।

ইন্দু লিখেছে পেনসিলে।

'তুই আসবি কিন্তু। রাত দশটা।'

তারপর লিখেছে, 'হলুদ-জমি বরাবর পাঁচিল, পাশে জামগাছ। জামগাছের নীচে অপেক্ষা করছি। আসবি। মা কালীর দিব্যি।'

আবার দিব্যি দিয়েছে।

তুই কী রে! নিজে মরছিস শতেক জ্বালায়, অথচ কালীর দিব্যি দিচ্ছিস!

আরও নীচে দেখল, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখেছে, 'ইতি বিন্নির খই।'

বাঃ, ভারী মজা তো! সে লাল বাতাসা, আর ইন্দু বিন্নির খই। মাথায় তো ইন্দুরও কম দুষ্টু বুদ্ধি নেই। সে আগের মতোই আছে। তার কিচ্ছু হয়নি। নয়তো মাথা খাটিয়ে এমন সাংকেতিক নাম বের করা কি সহজ!

যদি চিঠিটা বাবাঠাকুরের কোনও চরের হাতে পড়ত টেরই পেত না কে লাল বাতাসা, আর কে বিন্নির খই।

এবারে বাচ্চু অনেক সহজ হয়ে গেল। তবে ইন্দুর মাথায় যে খাঁড়া ঝুলছে, এটি টের পেতে কষ্ট হল না। খাঁড়া হাতে কে দাঁড়িয়ে আছে। কে সে।

কিংবা কে সে— ইন্দুকে পিছমোড়া হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বলির হাড়কাঠে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

ইন্দুর স্মৃতিভ্রম হয়নি।

ইন্দু ইচ্ছে করেই সংকেতগুলি সাজিয়ে চিঠিটাকে অর্থহীন করে তোলার চেষ্টা করছে।

তার কষ্ট হচ্ছিল। দস্যি মেয়ে ইন্দুর শেষে এই হাল হল! বাবাঠাকুরের কোপে পড়ে গেল।

সে আর দেরি করল না। তার এমন গুপ্ত খবর পৌঁছে যাওয়ায় সে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেও পড়ে গেছে। কী যে করে! দাদারা তার পাশে শোয়। পেছনের দরজা খুলে বের হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এত রাতে বাচ্চু একা কোথায় যাচ্ছে কিংবা রাতে বাচ্চু ঘরে নেই টের পেলে শোরগোল পড়ে যেতে কতক্ষণ! সে চিঠিটা পকেটে লুকিয়ে ফেলল। দৌড়ে হলুদ-জমি পার হবার সময় কেন যে মনে হল, না চিঠিটাও পকেটে রাখা ঠিক হবে না। হোক না সে লাল বাতাসা, ইন্দু বিন্নির খই— চিঠিটা পকেটে রেখে দিলে কারও হাতে পড়তে পারে। পড়লে ইন্দুর ক্ষতি হতে পারে। চিঠিটা সে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। আর আশ্চর্য, সে দেখল, কাগজের অজস্র টুকরো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে এবং সারা হলুদ-জমিতে ছড়িয়ে পড়ছে প্রজাপতির পাখনার মতো।

সে চান করতে যাবার সময় বাবাকে বলল, 'আচ্ছা, ইন্দু কি বাবা দেবী হয়ে গেছে?'

বাবা অবাক চোখে তাকালেন।

কারণ বাবা হয়তো মনে করেছেন, এমন উদ্ভট প্রশ্ন কেন! আর তার বলার ইচ্ছে ছিল, ইন্দুর সঙ্গে দেখাই হল না। একবারও ইন্দুর মহলে যেতে পারল না! এমনকী এখানে আসার পর অন্তত বাবার বউঠান এবং গুরুজনদের

প্রণাম করার জন্যও তারা একবার অন্দরমহলে যায়। এবারে বাবা তাও নিয়ে গেলেন না।

তা ছাড়া চিঠিতে লেখাই বা কেন, বাচ্চু যেন আসে। এই নদীর পাড়ে, সুপারির বাগানে অথবা স্টিমার ঘাটে তার আসার অর্থ কী। সে তো এসেছিল, ইন্দুর ঘরে গিয়ে বসতে পারবে, ইন্দুর সঙ্গে ছাদে উঠে যেতে পারবে, কিংবা অসুস্থ ইন্দুর শিয়রে বসে থাকলে ইন্দু হয়তো শান্তি পাবে। কেমন একটা অদৃশ্য গণ্ডি টেনে দেওয়া হয়েছে। এমন জানলে সে হয়তো আসতই না।

আগে ইন্দু সম্পর্কে কত নালিশ। এতে তার কোনও সংকোচ হত না। এবারে ইন্দু সম্পর্কে কোনও কৌতূহলই যেন তাকে মানায় না। ইন্দুকে দেখার পরই আর এক সংকোচে পড়ে গেছে। সে বড় হয়ে গেছে। ইন্দু বড় হয়ে গেছে।

ইন্দু শাড়ি পরলে কেমন মা-মাসিদের মতো লাগে।

সে নদীতে চান করতে যাচ্ছে, আর বারবার পেছনে তাকাচ্ছে। ছাদে যদি ইন্দু এসে দাঁড়ায়, অন্তত ছাদে এসে দাঁড়ালে, সে হাত তুলে ইঙ্গিতে বলতে পারত, চিঠি পেয়েছি বিন্নির খই। কিছু বুঝতে পারছি না। দড়ি, হলুদের জমি, পাঁচিল, কী যে ছাইপাঁশ লিখেছিস তুই। কিন্তু ছাদে সেই পরিরা শুধু উড়ছে। ঠিক উড়ছে না, উড়ে যাবার ভঙ্গিতে শ্বেতপাথরের পদ্মে দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে ভর করে। ইন্দু নেই। ইন্দু ছাদে এসে দাঁড়ায়নি।

বাচ্চু নদীর জলে স্নান সেরে উঠে এল। পাড়ে জামা-প্যান্ট। সে বারবারই ছাদের দিকে তাকাচ্ছে। কারণ নদীর জল থেকেও প্রাসাদের ছাদ দেখা যায়। ঘুরেফিরে বারবার ছাদের দিকেই তার চোখ। কখনও সারি সারি জানালায়।

মনে হয় কোনও দৈববলে সারা প্রাসাদ ঝিমিয়ে পড়েছে। মানুষজন সব।

বাবা আগে আগে যাচ্ছেন।

একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা কিছু বলেছেন?'

মা কী বলবে বুঝতে পারছে না বাচ্চু। তাকে দিয়ে মা, বাবার কাছে কী খবর পাঠাতে পারে। বাবা গত ছ'মাসে বাড়িমুখো হননি। মাঝে মাঝে মাকে জেদি এবং অপ্রসন্ন হতে দেখেছে। আসলে মা'র মেজাজমর্জি কীরকম, বাবা কি তাই জানতে চান।

বাবা ভিজে ধুতি দু'-পাট্টা করে পরেছেন। স্নানের সময় বাবা সূর্যপ্রণাম করেন। হাতে পইতে নিয়ে জলে অঞ্জলি দেন। কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা বলেন। নদীর কাছে এই আত্মসমর্পণ মাঝে মাঝে বাবাকে কেমন অন্য জগতের মানুষ করে দেয়। বাবা তার সুপুরুষ। মজবুত চেহারা। বিশাল গোঁফ। সেরেস্তায় পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বসলেও বাবার কাছে যেতে ভয় করত। এবারে সে কিছুটা আলগা স্বভাবের হয়ে গেছে। আগে এ-বাড়িতে দাদারা এবং বাবাই ছিল নিজের জন। দু'দণ্ড কাউকে দেখতে না পেলে সে মহা ফাঁপরে পড়ে যেত। এবারে দাদারা কিংবা বাবাকে কেন জানি সারাদিন দেখতে না পেলেও তার ফাঁপরে পড়ার কারণ থাকছে না। তার ভেতরে আলাদা একটা যে জগৎ তৈরি হয়ে গেছে এবং সেখানে ইন্দুই তার কেমন সর্বস্ব মনে হয়। সে মা কিংবা বাবার জন্য আদৌ বিচলিত হচ্ছে না। বরং ইন্দুর কথা ভেবে সে অস্থির হয়ে পড়ছে। বিন্নির খই কেন যে এত রাতে জামগাছের নীচে যেতে বলল!

সে ডাকল, 'বাবা!'

তিনি পেছন ফিরে বাচ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো।'

'বাবা, ইন্দু নাকি আত্মঘাতী হবে?'

'কে বলল!'

'রামুদা।'

'ঠিক জানি না। এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ইন্দু নাকি অপঘাতেও মারা যেতে পারে?'

'যেতেই পারে। কার কী নিয়তি কে জানে! এ নিয়ে ভাববে না। ইন্দুকে পারো তো সময় দিয়ো। সে তোমার দিদির মতো।'

'ইন্দুর কি সত্যি ঘোর বিপদ?'

বাবা চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে কী দেখলেন! তারপর কাছে এসে বললেন, 'সর্বজ্ঞ ওর মধ্যে দুষ্ট আত্মার সন্ধান পেয়েছেন। সর্বজ্ঞ পারেন না হেন কাজ নেই। তুমি কোনও কারণে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে না। জীবন বিপন্ন হতে পারে।'

বাচ্চু কেমন এক ষড়যন্ত্রের আভাস পেতেই বলল, 'দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী কী বাবা?'

'আমাদের শাস্ত্রে তান্ত্রিক কুমারীপূজা প্রচলিত আছে। বড় হলে জানতে পারবে। সর্বজ্ঞ একজন সিদ্ধাই। মানুষ যোগবলে দৈব শক্তি সঞ্চয় করতেই পারে। ভাল কাজে লাগালে ভাল, মন্দ কাজে লাগালে মন্দ। সর্বজ্ঞর কী ইচ্ছে কেউ জানে না।'

বাচ্চু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তার বাবাও বুঝতে পেরেছেন, চার বছর আগে যে বাচ্চু এসেছিল, সে আর নেই— তার তর্ক করার স্বভাব গড়ে উঠেছে। এই বয়সটাই খারাপ।

কারণ, না হলে বাচ্চু বলতেই পারে না, 'লোকটা ভাল না বাবা।'

'লোকটা বলছ কেন?'

'কী বলব?'

'তিনি সিদ্ধাই। চোখের সামনে আমি তাঁর বিভূতি দেখেছি।'

'চোখের সামনে!'

'হ্যাঁ, চোখের সামনে। তিনি দীক্ষা দেবার পর হাওয়া থেকে কী ধরে আনেন। হাতে দিলে দেখা যায় ওটা একটা চাঁপাফুল। সর্ব পাপ-বিঘ্ন-নাশকারী এই ফুলটি যে পেয়েছে, তার বড় সৌভাগ্য। ধনে-জনে শ্রীবৃদ্ধি। তিনি তো তোমাকেও সেবারে আশীর্বাদী ফুল দিয়েছিলেন।'

বাচ্চুর সেসব এখন মনে নেই। সে উত্তেজিত। মাথা গরম। সে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'আপনি নিজে দেখেছেন?'

কী সাহস! বোধহয় বাবার বাচ্চুর ওই ঔদ্ধত্য পছন্দ হচ্ছিল না। বললেন, 'শোনো, তোমার আত্মরক্ষার জন্য বলছি, এসব বিস্ময়ে কোনও সংশয় রাখবে না। নিশিকান্ত সংশয় প্রকাশ করতে গিয়ে মারা পড়ল। ইন্দুরও হয়েছে তাই। এখন তাকে রক্ষা করার জন্য বিধিমতো পূজাআর্চা, যাগযজ্ঞ চলবে। তারই প্রস্তুতি চলছে। আগামীকাল তিনি তাঁর আশ্রমে ফিরবেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে তাঁর আবার আবির্ভাব ঘটবে। ইন্দুর উপর থেকে দুষ্ট আত্মা তাড়াবার আপাতত কিছু ব্যবস্থা করে গেছেন। দূর্বাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত, মহাষ্টমী ব্রত শেষে, আরোগ্য সপ্তমী ব্রত চলবে। রোজ সকালে এবং সন্ধ্যায় তাকে দুর্গাকবচ পাঠ করতে হবে।'

বাবা থেমে বললেন, 'এমনিতেই ইন্দুর স্বভাব বারমুখী। তাকে ঘরমুখী

করতে হলেও এসবের দরকার আছে। এই বয়েসটা বড়ই খারাপ।'

কিন্তু বাচ্চু বাবার এসব কথায় আশ্বস্ত হতে পারছে না। সে জানতে চায় তান্ত্রিক কুমারী পূজা কেন? দ্বাদশবর্ষা ভৈরবীই বা কী? পরির মতো সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে শেষে ভৈরবী হতে হবে।

সে ফের বলল, 'দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী কী? দ্বাদশবর্ষা না হয়ে ত্রয়োদশবর্ষা হল না কেন?'

'শোনো বাচ্চু, আমাদের শাস্ত্রবিধি অনুসারে কুমারী পূজার ব্যবস্থা আছে। বিশ্বজননীকে তার ভিতর আমরা দেখতে পাই। তুমি বড় হয়েছ। তোমার জানা উচিত ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত মেয়েরা কুমারী থাকে। থাকবার নিয়ম। এক বর্ষীয়া কন্যার নাম— সন্ধ্যা। দ্বিবর্ষীয়া সরস্বতী, এভাবে ষড়বর্ষা উমা, সপ্তবর্ষা মালিনী, দশমে অপরাজিতা, দ্বাদশে ভৈরবী।'

'চোদ্দো বছর হলে কন্যাকে কী বলা হয় বাবা?'

'পীঠ নায়িকা।'

বাচ্চু সহসা কেমন খেপে গিয়ে বলল, 'লোকটা নিজের সুবিধেমতো ওকে দ্বাদশবর্ষা করে নিয়েছে। ইন্দুকে ভৈরবী বানাতে চায়। ইন্দুর তো চোদ্দো বছর।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'কেন, সেবারে আপনি বললেন না, ইন্দু তোমার চেয়ে মাস দুয়েকের বড়।'

'শোনো বাচ্চু।' তারপর ফের তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে চরের উপর মানুষজনের চলাফেরা লক্ষ করতে থাকলেন। 'বাবুমশাই সর্বজ্ঞর বিধানমতো চলেন। তিনি দীক্ষা নিয়েছেন। আমি তাঁর সামান্য আমলা— তুমি তাঁর পুত্র। ইন্দুর বয়স চোদ্দো কি বারো, জেনে আমাদের লাভ নেই। তোমাকে দেখছি আসতে লেখাটাই ঠিক হয়নি। মাথায় দেখছি তোমার পোকা ঢুকে গেছে। বাবুমশাই ইন্দুকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। বাবুমশাই ইন্দুর ভাল চান। তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সর্বজ্ঞের আসার কথা ছিল না। আসলে এটাও হতে পারে সর্বজ্ঞ টের পেয়ে গেছেন তুমি আসছ। তুমি ইন্দু মিলে সর্বজ্ঞের ক্ষতি করতে পারো।'

'যে অবতার, যে সিদ্ধাই, তার আমরা কী ক্ষতি করতে পারি বাবা!'

সর্বজ্ঞ কি তার অভিসন্ধির কথা টের পেয়ে গেছেন? পিসিকে বানিয়ে একটা স্বপ্নের কথা বলবে ভেবেছিল। পিসি যদি বাগড়া দেন, তিথি-নক্ষত্রে মিলছে না, পুজার নাও যাবে না— এমনকী শেষে পূজার নাও যদি ফিরিয়ে দেন, এই শঙ্কায় সে ভেবেছিল, পিসিকে বলবে, সর্বজ্ঞের ইচ্ছে আমরা যাই। স্বপ্নে সর্বজ্ঞ তাকে কত কথাই তো বলতে পারেন। বাধা উপস্থিত হলে শুধু বানিয়ে বলে ফেলা। সঙ্গে সঙ্গে পিসির কপালে দু'হাত উঠে আসবে সে জানত। পরে অবশ্য আর দরকার হয়নি।

সে এখানে এলে সর্বজ্ঞের ক্ষতি হতে পারে এটা যদি টের পায়, তবে তার অভিসন্ধির কথা টের পায়নি কেন। যে দৈবকে বশ করেছে, সে তো সবজান্তা। বাবাকে বলতে পারত, বাচ্চুকে সতর্ক করে দিস, আমাকে নিয়ে যেন ঠাট্টা-তামাশা না করে! ওর মাথায় দুর্বুদ্ধির পাহাড়। কই, বাবা তো বলেননি, বাবাঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা কোরো না।

সে তো এখানে এসে খবর পেয়েছে, সর্বজ্ঞের আশ্রমে ইন্দু গেছে। কীভাবে গেছে জানে না। কোথায় আশ্রম সে তাও জানে না। তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসেন কালেভদ্রে। পাহাড় বলতে সে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নাম শুনেছে। বড় তীর্থক্ষেত্র। চাটগাঁ মেলে উঠে যেতে হয়। বেতের লাঠি বাবা একবার তীর্থদর্শন করতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

নাকি সর্বজ্ঞ মানুষ দেখে তার মনের কথা জেনে ফেলতে পারে। যদি তাই হয়, তবে তো ইন্দুর নিষ্কৃতি নেই। যতই সাংকেতিক ভাষায় উড়োচিঠি পাঠাক, ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ইন্দুকে দেখলেই টের পাবে সে চিঠি পাঠিয়েছে। সে চরের উপর দিয়ে বাবার পেছনে হাঁটছে। বাবাকে বলাও যাবে না, ইন্দু তাকে রাতে পাঁচিলের পাশে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছে। কিংবা যদি এতক্ষণে জানাজানি হয়ে যায়, সর্বজ্ঞ বাবুমশাইকে ডেকে তড়পাচ্ছে, 'ভেবেছটা কী, তোমার আমলার পুত্রটির এত সাহস! ইন্দুর এত সাহস! রাতে পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়াতে লেখে! ভেবেছ কী!'

তবে তো সমূহ সর্বনাশ! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ছেলেখেলা কে সহ্য করে! তার কী করা উচিত এ-মুহূর্তে স্থির করতে পারছে না। এত দ্বন্দ্ব উদয়

হলে সে করেটা কী! চিঠির সংকেত অনুযায়ী পাঁচিলের পাশে গিয়ে অপেক্ষা করবে, না, দাদাদের সঙ্গে সাত আনা জমিদারবাড়িতে নরনারায়ণ যাত্রা দেখতে চলে যাবে! সে কিছুই ঠিক করতে পারছে না।

তারপরই বাচ্চুর মনে হল, স্বার্থপরের মতো সে শুধু নিজের কথাই ভাবছে। ইন্দুর বিপদের কথা ভাবছে না। বিপদটা যে কী স্পষ্ট করে তাও জানে না। ভৈরবীকে কী করতে হয় তাও সে জানে না। এত কৌতূহলই তার মরণ।

আর বারবার সেই দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠছে। দশমীর বাজনা বাজছে। হাউই উড়ছে, বাজি পুড়ছে, দূরে স্টিমারের আলো— নদীর জলে সারি সারি প্রতিমা বিসর্জন— সে আর ইন্দু নদীর ঘাটলায় বসে বিন্নির খই লাল বাতাসা খাচ্ছে।

সে যে কী মজা, যে খায় সে বোঝে।

এই বিন্নির খই লাল বাতাসা দিয়েই বোধহয় জীবন শুরু হয়, না হলে বাচ্চু ভাবে কী করে ইন্দু নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াতে চায়। সে নদীর পাড়ে কিংবা কাশবনের গভীরে দৌড়ে বেড়ালেই আরোগ্য লাভ করবে।

তার মাথা ঠিক থাকে না।

যা হয় হবে।

দেখাই যাক না ইন্দুর সাংকেতিক কথাবার্তা কেউ ধরে ফেলতে পারে কি না!

যদি পারে তবে কী হবে!

তবে ইন্দু সত্যি নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবে। বাচ্চু কোনওদিনই আর তাকে খুঁজে পাবে না।

সে না পেরে বলল, 'আচ্ছা, বাবা, সর্বজ্ঞ কি ইন্দুর দুষ্ট আত্মা দমনে যজ্ঞ করবেন!'

'তা জানি না।'

বাচ্চু বেপরোয়া, 'আমি জানি। সর্বজ্ঞ ইন্দুকে নির্যাতনে ফেলে দেবে। পোড়া মুন্ডুর মগজ খেতে দেবে। বেত কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলবে। খেতে দেবে না, ঘুমোতে দেবে না। করে দেখুক— আমি লোকটাকে খুন করব।'

'বাচ্চু... উ।' বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখ চেপে বললেন, 'বাবা মাথা খারাপ করিস না। ওর কোপে পড়ে গেলে নিস্তার নেই।'

বাচ্চু তার বাবার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলতে পারল না। বাচ্চু মাথা নিচু করে হেঁটে যেতে থাকল।

কাছারিবাড়ি ঢুকে আয়নায় মাথা আঁচড়াল। মুখ দেখল— শরীর দেখল। এবং রাতের জন্য অপেক্ষা ছাড়া জীবনে তার আর কিছু করার আছে এ-মুহূর্তে মনে করতে পারল না।

বাবা পেছনের বারান্দার তারে কাপড় মেলছেন। দাদারা কাছারিবাড়ির দক্ষিণের ঘরে ক্যারম খেলছে। বাবা ঢুকে বললেন, 'ওদের চান করে নিতে বলো। আমি সকলকে নিয়ে ওঁর কাছে যাব।'

বাচ্চু দেখল, বাবা খুবই গম্ভীর। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে বাবা কম কথা বলেন। যেন বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ে গেছেন। তার কথায় বাবা দুর্ভাবনায় পড়ে যেতেই পারেন। তার নিজেরও মনে হয় সে ঠিক কাজ করেনি। বাবার হয়তো মনে হতে পারে, তুমি বাচ্চু, ছেলেমানুষ, আমি তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি। সর্বজ্ঞ সম্পর্কে তুমি অবোধের মতো উক্তি করেছ।

অথবা ভাবতে পারেন, বয়সের দোষ। দাদাদের বিরুদ্ধে, তার বিরুদ্ধে বাড়িতে এই অভিযোগও আজকাল ওঠে। এখন বোধহয় বাবা তার দোষ খণ্ডনের জন্য ওঁর কাছে তাকে নিয়ে যাবেন। পিসিরও অভিযোগ, পাখা গজিয়ে গেছে, এখন পিসিকে দরকার পড়বে কেন!

পূজা এবার নম নম করে সারা হচ্ছে। সেবারে বাবাকে দেখেছে, পূজা সামলাতেই প্রাণান্ত। এবারে বাবাও রক্ষিতজ্যাঠার উপর ভার দিয়ে খালাস। বাবাঠাকুর, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ যতক্ষণ অধিষ্ঠান থাকবেন, ততক্ষণ তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের হম্বিতম্বি বাবাকে সহ্য করতে হচ্ছে। আসলে ভূতের উপদ্রব বোধহয় একেই বলে।

বাবা অন্দরমহলে খবর পাঠিয়েছেন। সেখানে অনুমতি মিললেই বাবা তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। বাবাঠাকুরের আশীর্বাদ হয়তো এ-যাত্রায় বাচ্চুকে রক্ষা করতে পারে। সমূহ বিপদ থেকে এ ছাড়া যেন পরিত্রাণের আর কোনও পথ খোলা নেই।

বাচ্চু নিজেও ভাবছে, সর্বজ্ঞের ভিতর কী এক আরশি আছে! সে যে যাবে, তার মনে তো নানা কু-কথা। সে আবার ধরা পড়ে যাবে না তো! লোকটা অতি বাজে, খারাপ এবং কাপালিক যদি হয় তবে তো তার একজন কপালকুণ্ডলা দরকার হতেই পারে। ইন্দুর এই পরিণতির কথা ভাবলেই সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। আবার সাহসও নেই বলে, না যাব না। যা হয় হবে! কারণ সে জানে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। তার কু-চিন্তা সর্বজ্ঞের আরশিতে ভেসে উঠবে। এবং সে যে লাল বাতাসা, ইন্দু বিন্নির খই, তাও টের পেয়ে যেতে পারে। এমনিতেই সর্বজ্ঞের দর্শন পাবার জন্য নদীর পাড়ে সকাল থেকে ভিড়। বাঁশের খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে, পাঁচিলের পাশে কোনও ফাঁকা জায়গা রাখা হয়নি। বৈঠকখানার পাশে উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। সর্বজ্ঞ সাঁঝবেলায় দর্শন দিয়েই এবারের মতো অন্তর্ধান করবেন।

বাবা ফরাশে বসেই ডাকলেন, 'পঞ্চানন!'

পঞ্চানন বাবার খাস বেয়ারা। ফরাশে বসলেই সে তকমা এঁটে বাইরের ঘরে একটা টুলে বসে থাকে। রোগা, পান খায়, দাঁত কালো এবং পকেটে নস্যির কৌটো। বাবা ডাকতেই সে নস্যি নাকে গুঁজে হাত ঝেড়ে রুমালে নাক মুছে হাজির।

'দ্যাখ তো, বাবুদের ক্যারম খেলা শেষ হল কি না!'

পঞ্চানন এসে খবর দিল, 'বাবুরা সব দল বেঁধে স্টিমারঘাটে গেছে।'

ওখানে পান বিড়ি সিগারেটের দোকান আছে। বড়দা লুকিয়ে সিগারেট খায় সে দেখেছে। বাবা এতে আরও ক্ষুব্ধ হলেন। তবে বাচ্চু বুঝতে পারে দাদাদের নিয়ে বাবার কোনও ধন্দ নেই। যত ধন্দ তাকে নিয়ে।

কেন যে সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি! বাবাকে তবে এতটা জলে পড়ে যেতে হত না।

পঞ্চাননই এসে খবর দিল, 'হুজুরের হুকুম হয়েছে।' হুজুর মানে বাবুমশাই।

১৭

সর্বজ্ঞের সামনে বাবার ডাক পড়তেই বাচ্চুর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকল। বাবা বলেছেন, যোগবলে দৈব লাভ হয়। ভাল কাজে লাগালে ভাল, মন্দ কাজে লাগালে মন্দ। সর্বজ্ঞের এই আচরণ কোন কাজে লাগছে। আর তখনই ইন্দুর সরল সুন্দর মুখ সহসা নদীর ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেসে গেল। যদি সে সেখানে ইন্দুকে দেখতে পায় সাহস পাবে। ইন্দু নিজেও তো কম যায় না। অন্তত একসময় ইন্দুর মধ্যেও দৈবশক্তি কাজ করত। সুপারির বাগানে সেই যে পরি দেখাতে নিয়ে গেল, তারপর নিমেষে হাওয়া। সে ডাকছে, ইন্দু, ইন্দু। যতদূর চোখ যায় শুধু সুপারির বন এবং ইন্দু পরি হয়ে আকাশে ভেসে গেল। সাদা মেঘের টুকরো যেন। দু'পাখা মেলে আকাশের ও-প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যেতেই সে ভয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। সেই ইন্দুই কেন তবে এত কাতর হবে। যার এত ক্ষমতা, সে কেন লিখবে মা কালীর দিব্যি, তুই আসিস। না এলে নদীর পাড়ে হারিয়ে যাব।

সে ভিতু বালকের মতো বাবাকে অনুসরণ করছে।

সে ডাকল, 'বাবা!'

বাবা দাঁড়ালেন।

'আমি যাব না বাবা। ভয় করছে।'

বাবা বললেন, 'ভয়ের কী আছে! এসো।'

বাচ্চু কী যে করে! তার শরীর কেমন অস্থির অস্থির লাগছে। শরীর গোলাচ্ছে। কে জানে যদি বলে দেয় বাবাকে, তোমার পুত্রটির উপরও দুষ্ট আত্মা ভর করেছে। ইন্দু সর্বজ্ঞকে হয়তো আমলই দেয়নি, ঠিক কী কারণে ইন্দুকে দুষ্ট আত্মার কবলে ফেলে দিল সে তো এখনও জানে না।

সে বলল, 'বাবা, সর্বজ্ঞ টের পেল কী করে, ওর উপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে, আত্মঘাতী হবে, নয় অপঘাতে মারা যাবে, জানল কী করে!'

'শোনো বাচ্চু, আমরা নিজের চোখে দেখেছি!'

'কী দেখেছেন বাবা?'

'মঠের চাতালে সর্বজ্ঞ বসে আছেন। আমরা বসে আছি। জ্যোৎস্নায় চরাচর

ভেসে যাচ্ছে। সর্বজ্ঞই দেখালেন, ওই দেখা যায়।'

'কী দেখলেন বাবা?'

'দেখলাম দোতলার কার্নিশ বেয়ে এক নারী হাঁটতে হাঁটতে জামগাছটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সর্বজ্ঞ বললেন, 'ওই যে দেখছ যায়— ওই বিদেহী আত্মা ফুলমণির। মনোহর দাসের মেয়ে। আত্মঘাতী হয়েছিল। এখন সে তোমার বাড়িতে ঢুকে গেছে। ইন্দুমতীর উপর এই নারীই ভর করেছে।'

দিনদুপুরে বাচ্চুর শরীর শিরশির করে উঠল।

বাচ্চুর গলা বুজে আসছে। সে কোনওরকমে বলল, 'আপনি সত্যি দেখেছেন বাবা?'

'আমি শুধু দেখব কেন, সবাই দেখেছে।'

বাবা ফের ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলছি!'

কে সে নারী, যে দোতালার অত উঁচুতে কার্নিশ বেয়ে রাত গভীরে হেঁটে যায়। সেই বিদেহী আত্মা আর জায়গা পেল না! ইন্দুর মতো সোজা সরল মেয়েটার উপর এসে অধিষ্ঠান হল!

ইন্দু সোজা সরল না হলে তার সঙ্গে মিশতই না। সে তো তার বাবার আমলার ছেলে। সে তো ইন্দুর সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পেত না। ইন্দু আশকারা না দিলে ওকে বোধহয় মঠের সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিতেও সাহস পেত না। কিংবা বিন্নির খই লাল বাতাসা খেতে খেতে বলত না, 'খেতে কী মজা না রে?'

বাচ্চুকে যেন প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাচ্চু বুঝতে পারছে, সে পালাতে পারে ভেবে, বাবা তার হাত ধরে রেখেছেন। বাবার অসহায় মুখ দেখলেও কষ্ট হয়। সর্বজ্ঞের কোপে পড়ে গেলে কেউ নিস্তার পায় না। তিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ জানেন। তিনি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে জয় করতে পারেন। তাঁর সব অলৌকিক ক্ষমতারও কাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে— কোথায় হিমালয়ে উত্তরকাশী বলে একটা জায়গা আছে, তিনি তাঁর দুই প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বের হয়েছেন। সহসা তুষার ঝড়ে পড়ে যেতেই মন্ত্রপূত চাঁপা ফুল উড়িয়ে দিলেন। ঝড় থেমে গেল। সামনে মন্দির। নির্জন সেই বরফের উপত্যকায় মন্দিরটি রাতের আশ্রয়ের জন্য কেউ যেন

তৈরি করে দিয়ে গেছে। ভিতরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রী। উষ্ণ প্রস্রবণের জল নেমে আসছে মন্দিরগাত্র থেকে। তারপর রাত্রিবাস। ঘুম থেকে উঠে শিষ্যরা দেখলেন, তিনি একা পাহাড়শীর্ষে উঠে উর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দিরও নেই, প্রস্রবণের উষ্ণ জলধারাও নেই— গভীর বনজঙ্গল সৃষ্টি করে গেছে কেউ। কোথাও আপেলগাছে সুমিষ্ট আপেলও ফলে আছে। বাচ্চু সব শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিল।

সে জানে না, কিচ্ছু বুঝতে পারছে না— তা ছাড়া ছোট বয়েস থেকেই তারা ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরঘরে প্রণাম না-সেরে জলগ্রহণ করে না। বাড়িতেও বড়পিসি সাধুসঙ্গ পেলে তাঁর সেবা ছাড়া কিছু বোঝেন না। বাড়ি থেকে বেশি দূরও না, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। মামার বাড়ির পথে বারদীর এই আশ্রমে বড়পিসি তাদের কতবার নিয়ে গেছে, কতদিন তারা বাল্যভোগ খেয়েছে। বড় সুস্বাদু খেতে। আশ্রমের ভিতর ঢুকে গেলেই কেমন যেন অন্য জীবন— সর্বজ্ঞ যদি সত্যিই সেই ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন!

'আয় আয়! তোর পুত্রটি যেন বড় হয়ে গেছে দেখছি।' বাচ্চু দেখল কখন যে তারা সর্বজ্ঞের সামনে হাজির সে টেরই পায়নি।

বাবা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন পদপ্রান্তে। বাচ্চু দাঁড়িয়েই আছে। রক্তাম্বর পরনে। খাটের চাদরও লাল রঙের। মস্ত তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন সর্বজ্ঞ। বাচ্চু দেখল, সর্বজ্ঞ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। অজগর সাপের মতো চোখ। সে কিছুতেই পলক ফেলতে পারছে না। তখনই কোনও এক অদৃশ্যলোক থেকে কে যেন ফিসফিস করে বলছে, পালা, পালা বাচ্চু। কুহকে পড়ে যাস না।

বাবা উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার হাত ধরে বলছেন, 'প্রণাম করো।'

বাচ্চুর মধ্যে কেমন কাঁপুনি ধরে গেছে। গোলাপ জলের গন্ধ, আতরের গন্ধ। সারা খাটে চাঁপাফুল ছড়ানো। বাবুমশাই ঘরের এক কোণে হরিণের চামড়ার উপর বসে আছেন। হাতে জপের মালা। চোখ বুজে মালা জপ করছেন।

বাচ্চু মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তেই সর্বজ্ঞ হাত তুলে বললেন, 'আয়ুষ্মান ভব।'

তখনও দেওয়ালের কোথা থেকে অদৃশ্য সেই ফিসফিস কথা কানে শোনা যাচ্ছে— বাচ্চু, আর দাঁড়াস না। কুহকে পড়ে যাস না। পালা, শিগগির পালা। অজগরের কুহকে পড়ে যাস না। তুইও মরবি তবে। সে কী যে করে! সহসা শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে নিজের মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টা করল। তারপর ছুটতে থাকল। সে শুনতে পাচ্ছে তিনি হা হা করে হাসছেন। বলছেন, 'ছেলেমানুষ। বড়ই ছেলেমানুষ।'

তারপর ঠাকুরদালান পার হয়ে আসতেই সে দেখল কোথাও কোনও বিপজ্জনক কিছু নেই। সব আগের মতো। তার এতক্ষণ মনে হয়েছিল, কোনও অন্ধকার গুহার মধ্যে বাবা তাকে ঢুকতে বলছেন। সেই অন্ধকার গুহা পার হয়ে আবার সে গাছপালা মাঠ শস্যক্ষেত্র যেন দেখতে পাচ্ছে। তার ভিতর এক জয়লাভের কৃতিত্ব সহসা জেগে উঠতেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'হুররে। জানে না। কিচ্ছু জানে না।' সে ছুটছে। সদর দেউড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে বলছে, 'কিচ্ছু টের পায়নি।'

আর তখনই মনে হল, কেউ ডাকছে, 'এই লাল বাতাসা! এত জোরে ছুটছিস কেন?'

সে দেখল সিঁড়ির মুখে একটা খড়খড়ির জানালা। দুটো চোখ দেখা গেল। আর কিচ্ছু না। তারপর চোখদুটি অদৃশ্য হবার মুখে বলল, 'আসবি কিন্তু। আমি ঠিক নেমে যাব। ভয় পাস না।'

বাচ্চুর সব আতঙ্ক উবে গেছে। সে যে লোকটাকে খুন করবে বলে চিৎকার করে উঠেছিল, তা বিন্দুমাত্র টের পায়নি। তাকে দেখেও না। পেলে দু'হাত তুলে এভাবে কেউ আশীর্বাদ করতে পারে না। 'আয়ুষ্মান ভব' বলতে পারে না। সদরমহলে ইন্দুও তবে তাকে এতক্ষণ কোনও অদৃশ্যলোক থেকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। না হলে ঠিক দেউড়ির মুখে, সিঁড়ির পাশে খড়খড়ির জানালা উঠে যেত না। ইন্দুর দু'চোখ ভেসে উঠত না। তার কোনও ক্ষতি না হয় ইন্দু সেজন্য জীবন বিপন্ন করেও সদরমহলের বিশাল অলিন্দে ছায়ার মতো সতর্ক পাহারায় থেকেছে।

জীবনে বাচ্চুর এই জয়লাভ যে কত আনন্দের সে কাউকে বোঝাতে পারবে না। তার কোনও অভিসন্ধিই টের পায়নি। তাকে দেখে কী মধুর হাসি! যেন

সে খুবই প্রিয়জন। বিগলিত ভাব। অথচ চোখে সেই অজগরের দৃষ্টি। অবতার হলে, সিদ্ধাই হলে তার কু-মতলবের কথা সর্বজ্ঞ টের পেত। লোকটা তার বাবা, কাকা কিংবা বাবুমশাইয়ের চেয়ে কোনও কারণেই বড় মাপের মানুষ না। ধূর্ত, কুট, অথচ উন্মাদ। ঈশ্বরের নামে এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে। এই খেলা থেকে তাকে নিরস্ত করতে না পারলে, আর-একটা পীঠস্থান তৈরি হবে। মানুষজন পাগলের মতো সর্বস্ব দিয়ে রোগ-ভোগে, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুতে তার শরণ নেবে। পরির মতো দেখতে সুন্দর মেয়েটাকে সহজেই জঙ্গলে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কপালকুণ্ডলা বানিয়ে দিতে পারে। দেবী বানিয়ে দিতে পারে। এমনকী ভৈরবীও। দুষ্ট আত্মা দিয়ে শুরু, ভৈরবী দিয়ে শেষ। আর এ-কারণেই ইন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। তার ফিটের ব্যামো। হাতেপায়ে খিচুনি। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে দাপায়। স্মৃতিভ্রম অসম্ভব নয়।

রক্ষিতজ্যাঠা বলল, 'আরে, পাগলের মতো ছুটছিস কেন বাচ্চু! কে কিছু জানে না!'

বাচ্চু সাবধান হয়ে গেল। সে বলল, 'জ্যাঠা, তুমি যাত্রা দেখতে যাবে না?'

'যাব। কেন?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'যাবি। বলার কী আছে।'

আসলে বাচ্চু জ্যাঠাকে এই বলে অন্যমনস্ক করে দিল। না হলে বলতে পারে, কে কিচ্ছু জানে না! কে কিচ্ছু টের পায়নি। বানিয়ে মিছে কথা বলার এখনও তার ঠিক সেভাবে অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। সে যদি জেরার মুখে পড়ে সত্যি কথা বলে দেয় তবে আর-এক দুর্ভোগ।

বিশাল কাছারিবাড়ি নিঝুম। খোপখোপ ঘরে তালা দেওয়া। কেবল তাদের থাকার ঘরটা খোলা। দাদারা নদীর ঘাটে স্নান করতে গেছে। নিজের এই আবিষ্কারে বাচ্চু কী করবে স্থির করতে পারছে না।

ইন্দুকে বন্দিনী রাজকন্যা মনে হচ্ছে। প্রাসাদের বাইরে ইন্দু বের হতে পারে না। ইন্দু আসবে। ইন্দু ঠিক আসবে। রাতে ইন্দুর সঙ্গে দেখা হবে। কোনও কারণেই যেন ভয় না পায়— তাও ইন্দু বলে দিয়েছে। ভয় একটাই, সেই

দুষ্ট আত্মা যদি রাতে তার দরজায় এসে দাঁড়ায়। সত্যি যদি ফুলমণি কার্নিশের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, জামগাছে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিকালবেলাতেই মঞ্চ তৈরি শেষ। সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, সর্বজ্ঞ উঠে গেলে মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়! কিন্তু পারবে না। তার যতই ক্ষোভ থাকুক, এসব অর্থহীন ভাবনা। লোকজন গিজগিজ করছে নদীর পাড়ে। বাবা সদরমহলে। রক্ষিতজ্যাঠা, রাধিকাকাকু দুপুর থেকেই মঞ্চ তৈরির তদারকিতে ব্যস্ত। বড় বড় শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। এবং বিকাল থেকেই লোকজনের ভিড়। দর্শনার্থীরা আসছে।

বাচ্চু থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে লক্ষ করছে প্রাসাদের জানালার কোণে খড়খড়ি উঠে যদি যায়। না, কেউ আর বিশাল জানালার খড়খড়ি তুলে কিছু দেখেনি। ধীরে ধীরে মনে হল, জমিদারবাড়ি থেকেই সব মানুষজন চলে আসছে। কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে বাবুমশাই ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছেন, দীন-দরিদ্রের ঠাকুর মঞ্চে দর্শন দেবেন।

ঠিক পাঁচটায় দেখল বাচ্চু, তিনি আসছেন। সে তার ইতিহাস বইয়ে বাদশা বাবরের ছবি দেখেছে। প্রায় বাদশাহের মতো পোশাক। চোখ বিস্ফারিত। মাথায় লাল রঙের পাগড়ি। পায়ে নাগরাই জুতো। বুকে দুই হাত জড়ো করা। অথবা যিশুর মতো চোখে যেন তাঁর অপার করুণা।

হঠাৎ বাচ্চু চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, নাটক। নাটক। যাত্রা হচ্ছে।

আর তখনই বাবুমশাই সবার সামনে সর্বজ্ঞের পা গোলাপজলে ধুয়ে দিচ্ছেন।

১৮

এ-হেন আচরণে বাচ্চুর মাথাটা আরও বিগড়ে গেল। সে ধুতুরা ঝোপের নীচে বসে একটা ছোট্ট ঢিল কুড়িয়ে নিল। তারপর মানুষজন যখন উন্মাদের মতো ঈশ্বরদর্শনে হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে, ঝোপের অন্তরাল থেকে সে সেটা লোকটার নাক বরাবর ছুড়ে মারল। ঢিলটা লাগল ঠিক, তবে নাকে নয়—

ভুঁড়িতে। অতদুর থেকে ঢিলের জোর ছিল না। লোকটা টেরই পায়নি। চর্বিতে এত পেট মোটা, না পাবারই কথা।

বাচ্চু ভেবেছিল, ঢিল মেরেই ধুতুরা ঝোপ থেকে সরে যাবে।

আশ্চর্য! ভ্রূক্ষেপ নেই। দৃষ্টি যেন তাঁর এ-পৃথিবীর বাইরে। তিনি মঞ্চে উঠে আসনে বসলেন। দু'হাত উপরে তুলে দিতেই জনতা শান্ত।

মাইকে সংগীতের মতো উচ্চারিত হচ্ছে— ওম অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্— বাচ্চু দেখল এই মন্ত্রধ্বনি ক্রমে নদী এবং আকাশগাত্রে গ্রথিত হচ্ছে— এমন সুন্দর মন্ত্রধ্বনি, সে জীবনেও শোনেনি। সে এই মন্ত্রধ্বনির কাছে নিজেই যেন বলিপ্রদত্ত। এমন কেন হয়— শাস্ত্রে এমন সুন্দর সব ধ্বনি এবং আশ্চর্য কবিতার মতো সুমধুর বাণী লিখিত আছে! সর্বজ্ঞ এর প্রভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে। কুহকে ফেলে দিচ্ছে।

বাচ্চু শুনল, সংগীতের সেই রোল গিয়ে থেমেছে— তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ উচ্চারণের মধ্যে। বাচ্চু ঝোপের মধ্যেই বসে আছে। জনকল্লোল নেই। শান্ত। বাণী প্রচার করছেন— যেন এই বাণীর স্রষ্টা সর্বজ্ঞ নিজে। সঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলছেন। একের-পর-এক শ্লোক উচ্চারণ করছেন। সেই ধ্বনি জনতার মধ্যে কুহক সৃষ্টি করছে। সে নিজেও কুহকে পড়ে যাচ্ছে। এমন সব শাস্ত্রীয় শ্লোক সর্বজ্ঞ একের-পর-এক অনায়াসে বলে যাচ্ছেন। তাঁর উচ্চারণে এবং শব্দ প্রয়োগে মানুষের মধ্যে মোহ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ সব নাটক— সব যাত্রা। নিশিকান্তকে লোকটা খুন করেছে। কে বলবে লোকটা খুনি। এবং একটা না, আরও এমন অজস্র, কে জানে! পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়া বিধেয়। ইন্দু আর-এক কাঁটা হতে পারে। ইন্দুকে কি শেষ পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা বানিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেবে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বলবে!

বাচ্চু সহসা ঝোপ থেকে দৌড়ে কাছারিবাড়ির বারান্দায় উঠে গেল। বারান্দা ভরতি লোকজন। সে লোহার বেঞ্চিতে একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসে পড়ল। হাঁটুর উপর দু'হাত ভর করে হাঁপাচ্ছে। কপালকুণ্ডলা বইয়ের সেই দৃশ্যটি দেখতে পায়। কপালকুণ্ডলার জন্য তার টান ধরে গিয়েছিল। বারবার বইটা সে পড়েছে। কী সুন্দর সব ঝোপ-জঙ্গলের বর্ণনা— কিংবা নবকুমারের কাপালিকদর্শন অংশটি তাকে কেন যে এমন তাড়া করছে। বইটা পড়ে পড়ে

আশ মেটে না। অংশবিশেষ তার মুখস্থ। 'শিখরাসীন' শব্দটি কপালকুণ্ডলা বই পড়ার আগে জানত না। তার উপর 'শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—।' ভাবা যায়!

ভাবলে তার গা এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তারপর কী! দারুণ, দারুণ!

'নবকুমারকে প্রথম দেখিতে পাইল না।'

সে কেন যে এ-মুহূর্তে নিজেকে নবকুমার ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছে না। নিজেকে নবকুমার ভাবতে আজকাল তার ভাল লাগে।

'নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে।'

আরে, দু'জনই যে একই বয়সের! সর্বজ্ঞ তবে সত্যি আর-এক কাপালিক।

'পরিধানে কোনও কার্পাসবস্ত্র আছে কি না তাহা লক্ষ হইল না।' সর্বজ্ঞর পরিধানে অবশ্য একাধিক কার্পাসবস্ত্র। এখানটায় মিল নেই।

'কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দুলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা। আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত।'

লোকটার সঙ্গে কাপালিকের যথেষ্ট মিল আছে— তবে সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলছিল না, সম্মুখে মাইক স্থাপন করা হয়েছে। 'সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন।'

সে অবশ্য এসেছে ইন্দুর চিঠি পেয়ে।

'নবকুমার একটা বিরাট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন, ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন।'

এ-জায়গাটায় অবশ্য বাঙ্কুর সঙ্গে নবকুমারের খুবই ফারাক। কোনও দুর্গন্ধ নেই— শুধু সুঘ্রাণ, আশ্চর্য চাঁপাফুলের গন্ধ।

'জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। ...চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে— এমনকী যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না।'

কী করে বুঝবে! ইন্দুর মতো যদি কপালকুণ্ডলা তখন পাশে থাকত, তবে

ঠিক সতর্ক করে দিত। পালাও পালাও, এ-ব্যক্তি কাপালিক।

আসলে বাচ্চু কপালকুণ্ডলা পড়ার পর থেকেই সাধু-সন্ত দেখলে এমন ভেবে থাকে।

এরা কোনও টিলায় থাকে।

গভীর বনজঙ্গলে পাতার কুটিরে রাত্রিবাস করে।

জনহীন অরণ্য ছাড়া এদের বিচরণের কোনও ক্ষেত্র নেই।

লোকটারও আশ্রম কোনও জনহীন প্রান্তরে কিংবা দুর্গম পাহাড়শ্রেণির উপত্যকায়। সেখানে ইন্দু থাকবে কী করে! কষ্ট হবে না। বাবুমশাই কী যে ঘোরে পড়ে গেলেন!

কে যেন বলেছিল, পিসি, না রামসুন্দর— কে যে বলেছে সে জানে না। ইন্দুও হতে পারে। এখন তার নিজের মাথারই ঠিক নেই। লোকটার নাকি পাহাড়শীর্ষে মহামায়ার মন্দির আছে।

তার মাথা ইন্দুর অদৃষ্টের কথা ভেবে কেমন ঝিমঝিম করছিল।

সে আর বসে থাকতেও পারছে না। কাল থেকেই যে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে মাথার আর দোষ কী! রাতে সে ভাল ঘুমায়ওনি।

সে ঘরে ঢুকে গেল। বালিশ টেনে ফরাশে শুয়ে পড়ল।

দু'দিন ধরে মাথার মধ্যে চিন্তার ক্লেশ তাকে কত অবসন্ন করে ফেলেছে, দাদারা ঘরে ঢুকে টের পেল। মশায় কামড়াচ্ছে— হুঁশ নেই। ঘরে কেউ শেজবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। বড়দা বলল, 'কী রে, যাবি না, ওঠ! যাত্রা দেখতে যাবি না!' চোখ কচলে সে ভাল করে তাকাল— সত্যি বড়দা। বড়দাই ডাকছে। সে এতক্ষণ স্বপ্নে ইন্দুকে কোনও এক গভীর অরণ্যে খুঁজে বেড়িয়েছে। সে তক্তাপোশ থেকে নামার সময় বলল, 'রক্ষিতজ্যাঠার সঙ্গে যাব। তোরা যা।' আর রক্ষিতজ্যাঠা এসে তাড়া দিলে বলল, 'বাবার সঙ্গে যাব।' বাবা এসে তাড়া দিলে বলল, 'দাদাদের সঙ্গে যাব।'

কাছারিবাড়ি খালি করে সবাই চলে গেছে যাত্রা দেখতে। বাচ্চু ঘরে বসে আছে একা। কেমন গভীর নিশুতি রাত মনে হচ্ছে। জ্যোৎস্নায় গাছের পাতা নড়লেও ভয় লাগে। সে একা এভাবে কখনও এমন একটা বিশাল আটচালা ঘরে চুপচাপ বসে থাকেনি। সকলের চোখে ধোঁকা দিয়ে থেকে গেছে। বাবা

জানেন, বাচ্চু রক্ষিতজ্যাঠার সঙ্গে যাবে। রক্ষিতজ্যাঠা জানেন, দাদাদের সঙ্গে যাবে। অথচ সে এতক্ষণ মঠের পেছনটায় লুকিয়ে ছিল।

সবাই চলে গেলে পা টিপে টিপে সে উঠে এসেছে। লম্বা বারান্দা ধরে যাবার সময় দেখেছে, যে-যার ঘরের দরজা বন্ধ করে গেছে। সুকুমারদা সদর দেউড়ি পাহারা দিচ্ছে। কাঁধে বন্দুক। তাকে লক্ষ করেনি। শুধু শেষপ্রান্তে বুড়ো রামসুন্দর দোতারা বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে। বুড়ো মানুষটা থাকায় সে নিজেকে আর একা মনে করছে না। তবু অন্ধকার ঘরে একা ঢুকতে তার ভয়। বাবার ঘরে কোনও আলো জ্বালা নেই। ভিতরের দিকে তাকিয়ে বুঝল ঘরটায় শুধু সামান্য আলো আছে।

নদীর পাড়ে, রাস্তায় লোকজনের চলাচল আছে। তবে কম। যাত্রা দেখার জন্য যে-যার মতো কাজ তুলে চলে গেছে।

সর্বজ্ঞ চলে গেছে এও টের পেল বাচ্চু।

কারণ আবার ঢাকের বাজনা বাজছে। ভিতর-বাড়িতে আরতি হচ্ছে। আগে একভাবে জেগেছিল বাড়িটা, এখন অন্যভাবে। পুজো পুজো মনে হচ্ছে ফের।

শেষপ্রান্তের ঘরটায় বুড়ো মানুষটা পাহারায় না-থাকলে, সে একা থাকতেও পারত না। গোটা কাছারিবাড়িটা যেন তাকে গিলে খেত। নিঝুম এবং টিকটিকির কটকট শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছে। সে খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে গেল— জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, রামসুন্দর না অন্য কেউ। কেমন সব অশরীরী তাকে যেন ঘরে ঢুকতেই তাড়া করছে। ভয় পেলেই বারান্দায় বের হয়ে আসছে। না, তক্তাপোশে রামসুন্দরই। গায়ে ফতুয়া। গলায় কণ্ঠি— গাইছে— 'অ অচিন পাখি রে, কোন গাছে তুই বানাইলি ঘর।'

সে ঘরে ঢুকে এবারে শেজবাতিটা উসকে দিল। জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে হলুদ গাছের জমি। দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল।

আর এক ঘণ্টা। তারপরই ইন্দু পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়াবে। যত সময় এগিয়ে আসছে তত বাড়ছে উত্তেজনা। অস্বস্তি বোধ করছে। সে বসে থাকতে পারছে না। ভিতরে ছটফট করছে।

ঠিক দশটা বাজলে, শেজবাতিটা দরজার সামনে রেখে হলুদের জমিতে

নেমে গেল। সারা প্রাসাদ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন এই হলুদের জমি— পেছনের দরজা দিয়ে সে বের হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে হলুদের সবুজ পাতা।

সে দু'হাতে গাছের পাতা সরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। সামান্য হেঁটে গেলে পাঁচিল, জামগাছ পাঁচিলের ওপাশে। আর কেন যে মনে হচ্ছিল, হলুদ জমিতে নেমে গেলেই ঝোপের ভেতর থেকে ইন্দু উঠে দাঁড়াবে। যেন ইন্দু অনেক আগেই জমিতে ঢুকে চুপচাপ তার বের হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকবে।

কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াল না।

তার চোখ বারবার ছাদের কার্নিশে চলে যাচ্ছে। একা থাকলে রাতে এত ভূতের ভয় সে আগে টের পায়নি কখনও। ফুলমণি কার্নিশ ধরে জামগাছটায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবা নিজের চোখে দেখেছেন— ভাবতেই তার সারা গায়ে ঝড় বয়ে গেল। আর-কিছুটা গেলেই জামগাছ— না সে আর হাঁটতে পারছে না। আতঙ্কে তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে।

বারবারই তার চোখ কার্নিশে চলে যাচ্ছে।

এই বুঝি নেমে এল ফুলমণি, ছাদের কার্নিশ বেয়ে।

চারপাশ এত নির্জন যে, সে কীটপতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত পাচ্ছে। আসলে ফুলমণি, না ইন্দু, কে বেশি সত্য এমন সব দ্বিধাদ্বন্দ্বে তার এখন মরণ। ভয়ে সে অসংখ্য ঝিঁঝি পোকারও ডাক শুনতে পাচ্ছিল।

এমনকী, সে হেঁটে গেলে পাতার খসখস শব্দ পর্যন্ত টের পাচ্ছে। শুকনো পাতা, ডাল, কাকপক্ষীর পালক মাড়িয়ে সে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইন্দু কোথায়! দশটা বেজে গেছে— ইন্দু নেই কেন! তার বুক তোলপাড় করছে। আসলে ফুলমণি কুহকে ফেলে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না তো!

তখনই তিনি আবির্ভূতা হলেন।

বাচ্চু দেখল একটা ছায়া হলুদের জমিতে ভেসে যাচ্ছে। ঠিক কোনও অশরীরী অবয়বে সেই ছায়া ক্রমে ভেসে যেতেই সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। চোখ গেল কার্নিশে। ওই তো, ওই তো— বাবা ঠিকই দেখেছেন— সেও দেখল, কার্নিশের উপর দিয়ে অবলীলায় ফুলমণির প্রেতাত্মা নারীর বেশে জামগাছটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

বাচ্চু অপলক তাকিয়ে আছে। ইন্দুর উপর দুষ্ট আত্মা তবে সত্যি ভর করেছে। দুষ্ট আত্মার প্রভাবে পড়েই ইন্দু তাকে এত রাতে এখানে হাজির থাকতে বলেছে। ফুলমণির হাত থেকে ইন্দুকে রক্ষা করার কোনও উপায় তার জানা নেই।

বাজ-পড়া মানুষের মতো বাচ্চু দাঁড়িয়ে আছে।

তার বোধবুদ্ধি লোপ। একটা গাছ যেন সে। সে যে দৌড়ে পালাবে সে-ক্ষমতাও তার নেই। সে দু' হাত উপরে তুলে কী বলতে চাইছে— আসলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মানুষ যা করে থাকে— শেষচেষ্টা— সে গাছ হয়ে নেই, তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়নি— সে বাচ্চু। যতই যে কুহকে ফেলে দেবার চেষ্টা করুক, সে বাচ্চু। এই বোধই তাকে ক্রমে পাগল করে দিচ্ছে। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে।

দু' হাত তুলে বলতে চেয়েছিল, 'না, না, ইন্দু তুই আসিস না। তুই আর ইন্দু নেই। ফুলমণি হয়ে গেছিস! কেন যে মরতে এলাম। তুই কেন এভাবে কুহকে ফেলে দিলি। আমার মা-বাবা, দাদারা দেখবে হলুদ জমিতে আমি মরে পড়ে আছি। আমার কী হবে।

প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে সে চেয়েছিল মাথার উপর দু' হাত তুলে দিতে, পারেনি।

তবু বোধহয় মানুষের বেঁচে থাকার অনন্ত ইচ্ছে, কারণ মানুষ তো কিছুতেই মরে যেতে চায় না। সে লড়ে, শেষ ক্ষমতাটুকু সে ব্যবহার করে বেঁচে থাকার জন্য।

এই শেষ লড়াই বোধহয় বাচ্চুর মধ্যে ফের প্রাণ সঞ্চার করছিল, সে গাছ

হয়ে থাকল না। বাজ-পড়া মানুষও না।

সে মনে করতে পারল, পিসির সেই ধন্বন্তরি টোটকা।

তার পা যে গেঁথে গেছে, সে যে গাছ হয়ে আছে দুষ্ট আত্মার প্রভাবে, পিসির ধন্বন্তরি টোটকাই এ-মুহূর্তে তার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় হতে পারে।

সে বুকে থুথু ছিটিয়ে দিল।

সে রামনাম জপ করল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে তার বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে পায়ে শক্তি পাচ্ছে। শক্ত হয়ে নেই।

সে ছুটতে থাকল।

হলুদের জমি পার হয়ে এক লাফে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর শেজবাতিটা উসকে দিল। হাত থরথর করে কাঁপছে। আগুন ছুঁয়ে থাকলেও প্রেতাত্মা কাছে আসতে পারে না— সে আগুন ছুঁয়ে বসে থাকল। চোখ সাদা হয়ে গেছে তার। এ কী দেখল! চোখের সামনে এমন বীভৎস দৃশ্য সে দেখবে জানলে— কে যায় মরতে। বাবা তবে মিছে কথা বলেননি। সর্বজ্ঞও না।

আচমকা দরজায় এসে কেউ যেন হামলে পড়ল। দরজাটা ভেঙে ফেলবে। সে চিৎকার করে উঠল, 'কে! কে!'

বাচ্চু আগুন ছুঁয়ে আছে। ইচ্ছে করলে ছুটে পালাতে পারে। এক লাফে বাবার ঘর পার হয়ে বারান্দায়, তারপর বারান্দা পার হয়ে শেষপ্রান্তে নদীর ধারে রামসুন্দরের কুটিরে, সেখানে সে ছুটে চলে যেতে পারে— কিন্তু সব এত রহস্যময় যে, নিজের উপর কেন— প্রকৃতির এই কূট খেলার উপরও তার আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কারণ সে গিয়ে দেখতেই পারে রামুদা গান গাইছে, রামুদা না অন্য কোনও প্রেতাত্মার ছলনা এটা, কে জানে— যেন সব প্রেতাত্মারা আজ তাকে মোক্ষম শিক্ষা দেবে বলে ঠিক করেছে। সে আগুন ছুঁয়ে আছে। তাই কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। আগুন ফেলে সে কোথাও যদি যায় তবে তাকে ছেঁকে তুলে নিয়ে যাবে— ভূত-প্রেতের এত দাপট কেন এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে।

ইন্দুর গলা!

ইন্দুর গলাই তো।

'বাচ্চু, দরজা খোল। ছুটে পালালি কেন! বাচ্চু! বাচ্চু।'

ইন্দু দরজায় মাথা কুটছে।

'বাচ্চু, দরজা খোল ভাই। আমি বিন্নির খই, দরজা খোল।'

বাচ্চু আগুন ছুঁয়ে বসে আছে। নড়ছে না। তার মুখ ফের ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জিভে জল নেই। গলা শুকনো। সে জবাবও দিতে পারছে না।

ইন্দু খুব সতর্ক গলায় বলছে, 'বাচ্চু, মা কালীর দিব্যি দরজা খোল। তোর কী হয়েছে! পালালি কেন! বাচ্চু, বিশ্বাস কর, আমি ইন্দু। কোনও দুষ্ট আত্মার কব্‌লে আমি পড়ে যাইনি। যা ছিলাম, তাই আছি। আমাকে কি তোরা সবাই মিলে শেষে মেরে ফেলবি!'

বাচ্চু তোতলাতে থাকল। বলতে পারছে না। দাঁত ঠকঠক করছে। তবুও কোনওরকমে বলল, 'রা...রা...ম রা...রা...ম বল।'

'রাম রাম। বিশ্বাস হচ্ছে? এবারে দরজা খোল!'

বাচ্চু কেমন সাহস পেয়ে গেল। ভূতেরা রামনাম বলতে পারে না।

কিন্তু কার্নিশের উপর দিয়ে তবে হেঁটে এল কে? সে তো দেখেছে, স্পষ্ট দেখেছে, কার্নিশ ধরে ফুলমণি অবলীলায় গাছটায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যাবার মুখে ডালপালা ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেছে।

বাচ্চু আগুন ছেড়ে উঠছে না। কী যে করবে ভেবেও পাচ্ছে না। আসলে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকলে যা হয়। ইন্দুর কাকুতি-মিনতিও তাকে অস্থির করে তুলছে। ইন্দু ছাড়া আর কেউ না— দরজা খুলে দেখা দরকার, সে ভাবল আলোটা হাতে নিয়েই দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে।

'শিগগির খোল। খোল বলছি।' মনে হল ইন্দু এবার সত্যি কেঁদে ফেলবে।

ফুলমণি, জামগাছ, হলুদ জমিতে জ্যোৎস্না— কোথাও ভুতুম ডাকছে, এতসব আতঙ্কের মধ্যে সে দরজা খুলে দিতেই ইন্দু ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। শাড়ি গাছকোমর করে বাঁধা। বাচ্চুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুমদুম করে কিল বসিয়ে দিল পিঠে। 'তোরা আমাকে কী ভেবেছিস বল!'

বাচ্চু নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে দাঁড়াল। ইন্দুর এমন রুদ্রমূর্তি সে কখনও দেখেনি।

কিন্তু তার মনে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। ইন্দুর মধ্যে যদি ফুলমণি সত্যি ভর করে থাকে!

সে বলল, 'আমাকে মারলি কেন বল তো! আমার কী দোষ। কার্নিশে যে দেখলাম...'

'কী দেখলি!'

'জানিস, হলুদ জমিতে ভূতের ছায়া ভেসে যায়।'

'আর কী যায়?'

'কার্নিশে কে হেঁটে যায়। তুই সত্যি ইন্দু না ফুলমণি? আগুন ছুঁয়ে বল।'

ইন্দু বলল, 'এই দেখ,' বলেই বাঁ হাতে বাতির চিমনি চেপে ধরল।

বাচ্চু আর পারল না। চিমনি থেকে হাত সরিয়ে আনল ইন্দুর। বড় ফোসকা, জ্বালা-যন্ত্রণা যেন কিছু নেই। হাত মেলে দেখাল ইন্দু।

'বিশ্বাস হচ্ছে, আমি ইন্দু? তোরা সবাই মিলে কী আরম্ভ করলি বল তো।'

'তোর নাকি মাথায় ভূত চেপেছে?'

'আমার না তোদের? কার বল!'

'তুই চিমনিটা ঠেসে ধরলি! জ্বালা করছে না?'

'না।'

'সত্যি বলছিস জ্বালা করছে না?'

'জ্বালা না করলে ফোসকা পড়ে!' ইন্দু হাতে ফুঁ দিচ্ছে।

বাচ্চু তক্তাপোশে বসে পড়ল। বলল, 'দেখি হাতটা।'

'এই ওঠ, বসে পড়লি কেন? হাত দেখতে হবে না।'

'জানিস, তোদের কার্নিশে ফুলমণি হেঁটে যায়। মনোহর দাসের মেয়ে। আত্মঘাতী হয়েছিল।'

'কচু হয়েছিল।' বলেই ইন্দু ওর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে সে হাত ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোকে দেখে আমার ভাল লাগছে না। আমার ভয় করছে।'

'বাচ্চু—উ...উ!'

কোনও এক অত্যধিক নির্যাতন থেকে এমন আর্তকান্না ভেসে আসতে

পারে— বাচ্চু দেখছে ইন্দু ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুখ ঢেকে দু' হাতের অঞ্জলিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর বলছে, 'সবাই আমাকে ভয় করে। কেউ আমাকে আর ভালবাসে না। আমি আর মানুষ নই। তুইও আমাকে ভয় পাস!'

বাচ্চু এবার উঠে দাঁড়াল। ওদিকের দরজা খোলা। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, 'তোর গা ছুঁয়ে বলছি ইন্দু, কার্নিশের উপর দিয়ে ফুলমণি হেঁটে গেল। সত্যি বলছি, জ্যোৎস্নায় হলুদের জঙ্গলে একটা ছায়াও ভেসে গেল। আমার ভয় করবে না! তোকে ভয় পাব কেন!'

ইন্দু আঁচল খুলে চোখ মুছল।

'বেশ, আয় আমার সঙ্গে।'

বাচ্চু ইন্দুর গা ঘেঁষে হলুদ জমিতে নেমে গেল।

'ছায়া কোনখানে ভেসে যেতে দেখলি!'

আঙুল তুলেই বাচ্চু দেখাল।

'কার্নিশে কোনদিকে ফুলমণি হেঁটে গেছে?'

'জামগাছটার দিকে।'

ইন্দু তাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে পাঁচিলের কাছে। কিছুটা এগিয়ে বলল, 'দাঁড়া, আমি আসছি।' ইন্দু এক লাফে দড়ি বেয়ে পাঁচিলের উপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বাচ্চু জানে, ইন্দু এটা পারে।

জামগাছের ছায়ায় শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল। অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। ডালপাতার ফাঁকে বোঝা যাচ্ছে ইন্দু মগডালে উঠে যাচ্ছে। তারপর লাফিয়ে কার্নিশে নেমে গেল। ওকে হাত তুলে ইঙ্গিতে জানাল— হেঁটে যাচ্ছে। সামনের দিকে অবলীলায় হেঁটে গেল। আবার ঘুরে গিয়ে জামগাছের অন্ধকারে অদৃশ্য হবার আগে— কু-উ করে ডাকল। বাচ্চুর এবারে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। ইস, ইন্দু শেষে সত্যি ভূত হয়ে গেল। এত রাতে, এত উপরে কার্নিশ ধরে মানুষ হেঁটে যেতে পারে সে বিশ্বাস করতে পারল না। অথচ সে ছুটে পালাতেও পারছে না। ইন্দুর জন্য তার যে বড় টান ধরে গেছে।

ইন্দু নীচে নেমে এসে ভেবেছিল, বাচ্চুকে স্বাভাবিক দেখবে। বুঝতে পারবে, ফুলমণি না, ইন্দু নিজেই এসব পারে। বাচ্চু কথা বলছে না। পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে।

ইন্দু আর পারল না।

বাচ্চুকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে ইন্দু বলল, 'তুই বড় হয়েছিস। বুদ্ধি তোর ঘোড়ার ডিম।'

কিন্তু বাচ্চু গোল গোল চোখে তাকে দেখছে।

'বাচ্চু, তোকে নিয়ে পারা যাবে না। বয়স বেড়েছে, বুদ্ধি এককোঁটা বাড়েনি।'

বাচ্চু তেমনিই অস্বাভাবিক— ওর মধ্যে প্রাণের সাড়া যেন নেই।

'মারব এক থাপ্পড়। ভিতু কোথাকার। তোর মনে নেই ছাদে তোকে পরি দেখিয়েছিলাম। কী রে, মনে পড়ছে! আমি হেঁটে গেছি। আমার ছায়া হলুদের জমিতে ভেসে গেছে। ভূত-পেতনির কোনও ছায়া থাকে না জানিস!'

ভূত-পেতনির ছায়া থাকে না, তার পিসিও বলেছে। দাদারাও বলেছে। ধীরে ধীরে বাচ্চু টের পেল, ইন্দু সব পারে। ইন্দুর মধ্যে কোনও ঘোর উপস্থিত হলে সে পারে না হেন কাজ নেই। তাকে এই ঘোর থেকেই অথবা বলা যায়, তাকে অবাক করে দেওয়ার জন্য প্রাণসংশয় করেও সেবারে ছাদের কার্নিশে পরি হয়ে এক পায়ের উপর বোধহয় দাঁড়িয়ে ছিল। ইন্দু তাকে অবাক করে দেবার জন্য এত কিছু পারে, আর ইন্দুকে সামান্য বিশ্বাস করে সঙ্গে যেতে পারবে না, হয় না! তার চোখে কেন জানি জল এসে গেল।

২০

সহসা বাচ্চুর মধ্যে আনন্দের বানও ডেকে গেল। সে ইন্দুকে জড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুই ইন্দু, সত্যি ইন্দু। আমি আর তোকে ভয় পাব না।'

ইন্দু বুঝতে পারে, সে বাচ্চুর মধ্যে তার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এই জয়লাভ কিছুটা তাকে বিমূঢ় করে দিলেও, সে সব ব্যাপারেই একটু বেশি সজাগ। বাচ্চুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'চু-উ-প। শুনতে পাবে। তুই এলি শেষে! আমি যে কত কিছু ভাবছি জানিস।'

'কী ভাবছিস?'

'সে আমিও ঠিক জানি না। কীভাবে কী হবে জানি না। যা দেখালি! ভাবলাম, যাও একজন ছিল, সেও বুঝি গেল!'

বাচ্চুর আর ভয়-ডর নেই।

ভয়-ডর না থাকলে যা হয়, সে ভাল করে জ্যোৎস্নায় ইন্দুকে দেখল।

ইন্দুও তাকে দেখছে।

বাচ্চু বলল, 'ইন্দু, তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!'

ইন্দু বলল, 'তুইও আর ছোটটি নেই।'

'ধ্যাত। তুই ইন্দু, চিঠি না দিলে, আমি হয়তো আসতামই না।'

'তা আসবি কেন! আমি তোর যদি ক্ষতি করি!'

'তুই আমার ক্ষতি করবি, তা হলেই হয়েছে।'

ওরা দু'জনই পাঁচিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

ইন্দুর শরীরে সেই সুঘ্রাণ। চুল খোঁপা করে বাঁধা। চুল পাঁচিল থেকে নামার সময় খুলে গিয়েছিল। দু' হাত পিছনে নিয়ে কী সুন্দর করে খোঁপা বাঁধল ইন্দু।

সে ভেবে পেল না, ইন্দুর শরীরের এই সুঘ্রাণ সে এতক্ষণ পায়নি কেন! তবে কি তার মাথাতেই ভূত চেপেছিল। এই ভূতই কি সব মানুষকে নাচিয়ে বেড়ায়। কে জানে! সে এখন আর কোনও কিছুই তোয়াক্কা করছে না। ইন্দুকে আবিষ্কার করতে না পারলে সেও এক প্রেতাত্মা হয়ে বেঁচে থাকত। বাচ্চু বলল, 'তোর কী সাংঘাতিক বুদ্ধি। ভাবলাম, কাউকে পাঠিয়ে খবর দিবি। কেউ এল না। এল একটা এরোপ্লেন। পাঁচিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছিলি কেন?'

ইন্দু বলল, 'পাঁচিলের পাশে আর গেলি কোথায়? তার আগেই হাওয়া। আমি তো পাঁচিল থেকে নেমে দেখছি ঘরের দিকে ছুটছিস। যাত্রা দেখতে যদি চলে যাস! ভাবলাম, থাকবে কি থাকবে না!'

'খুব মজা হয়েছে জানিস! বাবা ভেবেছে, রক্ষিতজ্যাঠার সঙ্গে গেছি। দাদারা ভেবেছে বাবার সঙ্গে। আসলে আমি যাইনি। সারাদিন কী করে যেতে না হয় ভেবে ভেবে মাথা খারাপ।'

'যাক, তবে তোর ঘটে কিছু বুদ্ধি রয়েছে। রক্ষা। তোকে নিয়ে না আবার

বিপদে পড়তে হয়। তোর ঘরে চল। কথা আছে।'

বাচ্চুর মনে হল ইন্দুকে অবিশ্বাস করে সে খুবই অন্যায় করেছে। একেবারে আগের মতো ইন্দু। ইন্দু আত্মঘাতী হবে, দুষ্ট আত্মা ভর করেছে ইন্দুকে, অপঘাতেও মারা যেতে পারে— এসব কথা একদম আর তার মাথায় নেই।

ঘরের দিকে যাওয়ার সময় বাচ্চু বলল, 'এত উঁচু দিয়ে হেঁটে আসতে পারলি! পা ফসকালে কী হত বল তো। তোর কিন্তু এত সাহস ভাল না। জানিস, ভাবলেই আমার গা গোলাতে থাকে।'

ইন্দু কেমন অন্যমনস্ক।

ইন্দু অন্য-কিছু ভাবছে।

তারা ঘরে ঢুকে বসে পড়ল। ইন্দু বলল, 'শেজবাতিটা সরিয়ে রাখ। চোখে লাগছে।'

বাচ্চু উঠে গিয়ে শেজবাতিটা তক্তাপোশের একপাশে রেখে দিল।

বাচ্চু দেখল, ইন্দুর মুখ কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেবারেও দেখেছে, মাথায় কোনও দুষ্টবুদ্ধি উদয় হলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকত ইন্দু।

'এই ইন্দু, চুপ করে আছিস কেন!'

ইন্দু কী ভেবে এবার গা ঢেকে বসল। বলল, 'জানিস, সর্বজ্ঞ আমাকে খাঁচায় পাখি বানিয়ে রাখতে চায়। তার কী মতলব আমি জানি না। আচ্ছা তুই বল, লক্ষ্মী একটা অবলা জীব— তার কী দোষ? তুই আমাকে, লক্ষ্মীকে বাঁচা। তুই খুড়োমশাইকে বলে থেকে যা। কী, কী, থাকবি তো! কী রে, চুপ করে আছিস কেন! তুই থাকলে সাহস পাব।'

ইন্দু এবার উঠে দাঁড়াল। পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। ইন্দু কি চলে যাচ্ছে! বাচ্চু তাড়াতাড়ি অনুসরণ করতে গিয়ে বুঝল, ইন্দু আসলে দেখছে কাছারিবাড়িতে অন্য কেউ আছে কি না।

বাচ্চু বলল, 'কেউ নেই। সবাই যাত্রা দেখতে চলে গেছে। শুনছিস না কনসার্ট বাজছে। জেঠিমা যাননি?'

'না।'

'দাদারা তোর?'

‘ওঁরা গেছেন।’

ইন্দু খুবই কম কথা বলছে। যতটুকু না-বললে নয়, ঠিক ততটুকু। ইন্দুর সেই চপলতাও নেই। কেমন গম্ভীর।

ইন্দু বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। সামনের একটা দলিল-দস্তাবেজের র‍্যাকে ধাক্কা খেতেই বলল, ‘এগুলো কে রেখেছে এখানে?’

আসলে ইন্দু অনেকদিন কাছারিবাড়িতে ঢোকেনি। তার আগের চেনা কাছারিবাড়ি নেই। সব কিছুর জায়গা বদল হয়েছে। বারান্দায় আসার সময় তার বলতে গেলে হুঁশ ছিল না। তবু সে অন্ধকার ঘর পার হয়ে ঠিকঠাক পৌঁছে গিয়েছিল। বাচ্চুর ঘরে ফেরার সময় সতর্ক হতে গিয়েই অন্ধকারে র‍্যাকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

‘কী রে, লাগল?’

‘না। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হাত ধর।’

ইন্দুকে বাচ্চু কোনও অন্ধ বালিকার মতো হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দুটো ঘর পার হয়ে তার ঘর। দরজার আলো দেখে সে ফিরে গেলে দেখল, ইন্দু অনেকটা নিশ্চিন্ত। সারারাত ধরে যাত্রা। ধরা পড়ার ভয় নেই। ইন্দু স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘জল খাওয়াতে পারিস? ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।’

মাটির জার থেকে বাচ্চু ইন্দুকে জল গড়িয়ে দিল।

বাচ্চুর মাথার মধ্যে পোকা আছে। অকারণ সংশয়ে সে ইন্দুকে এখনও যেন আবার ঠিকঠাক বিশ্বাস করতে পারে না। সেবারে ইন্দুর সেইসব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এখনও মাথা থেকে নামেনি।

ইন্দু জলের গ্লাসটা হাতে দিয়ে বলল, ‘আমি পরি না। আমার উপর কোনও দুষ্ট আত্মাও ভর করেনি। অন্দরমহল ছাড়া কোথাও যাবার সব রাস্তায় কাঁটা।’

বাচ্চুকে আবার সেই সেবারের ভূত তাড়া করছে।

‘তুই পরি না হলে সেবারে পদ্মফুলে কোনও পরি দাঁড়িয়েছিল। জীবন হাতে নিয়ে কেউ এত বড় মজা করতে পারে?’

‘পারে। তুই বিশ্বাস কর, আমি পারি। আমি সত্যি দাঁড়িয়েছিলাম। তোর সঙ্গে মিছে কথা বলে আমার কী লাভ বল!’

তবু সেই ভূত আবার বাচ্চুর মাথায়— ওর বড় বড় চোখ দেখলেই বোঝা যায়, ভূতের কবলে পড়ে গেছে। ইন্দু এটা টের পায় বলেই, বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। মানুষ তো এরকমেরই। কখনও বিশ্বাস হারায়, আবার কখন যে বিশ্বাস ফিরে পায়!

সে বলল, 'সত্যি বলছি আমি। তোকে ছুঁয়ে বলছি। আমি পারি। আমাদের লাবণ্যকে তুই জানিস না। ও আমাদের অন্নদাদিদির মেয়ে। কমলা সার্কাসে খেলা দেখায়। তারের খেলা, জিমনাস্টিকের খেলা। বর্ষাকালে আমাদের বাড়ি এসে থাকে। ওই আমাকে শিখিয়েছে। সার্কাস দেখিসনি! কত উঁচু তারে হেঁটে যায়। সাইকেল চালিয়ে যায়। অভ্যাস করলে সব হয়। কার্নিশ কেন, একটা লম্বা তার বাঁধা থাকলেও আমি নেমে আসতে পারব। একবর্ণ মিছে কথা বলছি না।'

বলতে বলতে ইন্দুর মুখ দুশ্চিন্তায় কেন যে কালো হয়ে গেল! বলল, 'সর্বজ্ঞ বাবাকে কুহকে ফেলে দিয়েছে। বাবার জমিদারি গ্রাস করার তালে আছে৷ সর্বজ্ঞ ছাড়া বাবা কিছু বোঝেন না। সরকার নাকি দেশ স্বাধীন হলে জমিদারি নিয়ে নেবে। সর্বজ্ঞ বাবাকে বলেছে, তাঁর নাকি বিষয়-সম্পত্তি একফোঁটা নাশ হবে না। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। বাবাকে গুজবে কান দিতে বারণ করেছেন। বাবার জমিদারিতে সর্বজ্ঞ এখন সব। তুই বিশ্বাস কর বাচ্চু, আমি মিছে কথা বলছি না। আমি একটাও মিছে কথা বলছি না। লক্ষ্মী নাকি পাগলা হাতি। লক্ষ্মীকে...' ইন্দু আর নিজের আবেগ সামলাতে পারল না। 'লক্ষ্মীকে মেরে ফেলা হবে!' বলে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকল ইন্দু।

বাচ্চু কী বলে সান্ত্বনা দেবে ঠিক বুঝতে পারছে না। জটিল পরিস্থিতি। এমন সুন্দর সরল মেয়েটাকে কষ্ট দিতে মায়া হয় না! সে বলল, 'তুই কাঁদিস না ইন্দু। কান্নাকাটি একদম ভাল লাগে না।'

চোখ মুছতে মুছতে ইন্দু বলল, 'সর্বজ্ঞর চাঁপাফুলের ভেলকি ধরে ফেলতেই কোপে পড়ে গেলাম। জানিস, লক্ষ্মী ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

ইস, ভাবতে পারছে না বাচ্চু। অবলা জীবটাকে মেরে ফেলা হবে কেন! লক্ষ্মী উন্মাদ হয়ে গেছে কি হয়নি সে ঠিক জানেও না। কাল সকালে একবার পিলখানায় যেতে হবে। লক্ষ্মীকে দেখে আসতে হবে। পাগলা হাতির সামনে

কেউ যেতে পারে না সে জানে। দূর থেকে বোঝার চেষ্টা করবে ভাবল।

ইন্দু আবার কাঁদতে শুরু করেছে।

'জানিস বাচ্চু, আমাকে কেউ ভালবাসে না। বাবা না, মা না। লক্ষ্মী ছাড়া আমাকে কেউ ভালবাসে না।'

বাচ্চু এবার কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ইন্দু কী বলছে সে যেন ঠিক বুঝতেও পারছে না। কথায় কথায় কান্নাকাটি করলে কাঁহাতক ভাল লাগে। সে বলল, 'দেখ ইন্দু, তোকে আমি বারবার বলছি, কান্নাকাটি একদম আমার পছন্দ না।' আসলে বাচ্চুর ভিতর ইন্দুর এই অসহায় অবস্থা খুবই পীড়ন সৃষ্টি করছে। পীড়ন থেকেই তার ক্ষোভ। সে যে আগের ইন্দু, দেখতে চায়।

'ঠিক আছে, আর কান্নাকাটি করব না। আমি কি ইচ্ছে করে কাঁদি। কান্না উঠে এলে কী করব!'

বাচ্চু বেশ ভারিক্কি চালে বলল, 'এখন কি কান্নার সময়! তুই বল। লক্ষ্মীর বিপদে, তোর বিপদে আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে! বল তুই, চলবে!'

এতে যেন এক অসীম সাহসিকতার খবর পেয়ে যায় ইন্দু। ইন্দু যেন বাচ্চুর কাছ থেকে এমনই কোনও আস্থা অর্জন করতে চেয়েছে। যেন সে নির্ভর করতে পারে বাচ্চুর উপর। এই ভরসাটুকুই তার যে কত বড় সম্বল, ইন্দুর মুখ না-দেখলে বোঝা যেত না।

'জানিস বাচ্চু, আমি নাকি বাবার গুরুদেবকে অপমান করেছি। বাবার মান-সম্মান বুঝিনি। গুরুদেবকে ছোট করলে বাবাও নাকি সবার কাছে ছোট হয়ে যান। লোকটা ভেলকি দেখিয়ে বাড়ির সবাইকে কী বশ করে ফেলেছে চোখের উপর তো দেখলি। নিশিকাকাই বলেছেন, অলৌকিক বলে কিছু থাকতে পারে না। কার্য-কারণ ছাড়া কিছু হয় না। মানুষ অবতার হতে পারে না। এরা ধর্মের নামে এক প্রকারের উন্মাদ। বাবা একজন উন্মাদের পাল্লায় পড়ে গেছেন। জমিদারি ছারেখারে দিচ্ছেন। বল সহ্য হয়?'

'নিশিকাকা মানে, নিশিকান্ত।'

'হ্যাঁ। ছোট তরফের জমিদার মণিমোহনবাবুর বড় ছেলে।'

২১

বালিকা ইন্দুর চোখে এখন আগুন জ্বলছে।

কোনও কথা বলতে পারছে না বাচ্চু। নিশিকাকা খুন হয়েছেন, সে জানে।

বাচ্চুর যে কী হয়, এই ধন্দ, এই কুয়াশা, আবার মেঘ কেটে যায়—আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু কোথা থেকে ফের মেঘেরা ধেয়ে আসে, পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়। সে এখানে আসার আগে কত কিছু ভেবে রেখেছিল! ইন্দু তাকে জ্যান্ত পরি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সুপারিবাগানে। এই রহস্যময়তা তাকে এখনও ইন্দু সম্পর্কে সংশয়ে ফেলে রেখেছে। তার আকাশ ফের মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ইন্দু তখনই বলল, 'আমি কী করব বল?'

বাচ্চু কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে ইন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে। ইন্দু সম্পর্কে তার ভীতি যেমন ছিল, আবার টানও জন্মে গিয়েছিল। ইন্দুকে না দেখলেও তার ভাল লাগত না। নদীর জল, কাশবন, ঝাউগাছের ছায়া কিংবা পুরনো বাড়ি যাওয়ার পথটা অর্থহীন মনে হত। সেই ইন্দু বলছে, 'আমি কী করব!'

বাচ্চু বলল, 'তুই তো পরি হয়ে উড়ে যেতে পারিস কোথাও। তোকে তা হলে অবতার আর নাগাল পাবে না।'

ইন্দু পড়েছে মহা মুশকিলে। বাচ্চুর মাথা থেকে পরির ভূত নামাতে না-পারলে তাকে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। সে যা ভেবে রেখেছে, বাচ্চুর মাথায় পরির ভূত ঢুকে থাকলে কাজ হাসিল করতে পারবে না।

'শোন বাচ্চু।' বলে কানে ফিসফিস করে কী বলে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল পাঁচিলের পাশে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে এল ইন্দু। রাগে গরগর করছে ইন্দু। বাচ্চু রাজি না। বাচ্চু তার সঙ্গে যেতে রাজি না। এত রাতে সুপারির বাগানে তাকে নিয়ে যেতে চাইছে কেন, বাচ্চু বুঝতে পারছে না। মেয়েটার কি ভয়-ডর কিচ্ছু নেই। রাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুপারির বাগানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। ঘাসের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে।

এত আরাম ছেড়ে যদি কেউ এভাবে রাতে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, তবে তাকে কে বিশ্বাস করে। তা ছাড়া পোকামাকড়ের ভয় তো আছেই।

ইন্দু বলল, 'তা হলে যাবি না!'

'না। কেউ দেখতে পেলে?'

'কে দেখবে? সবাই জানে ইন্দু দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। ঘর অন্ধকার। লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারি কেউ বিশ্বাস করবে না। বাড়িটায় শকুনের নজর লেগেছে— কেউ বেশি রাতে একা বেরও হয় না।'

বাচ্চু বলল, 'সকালে ঘুরব তোকে নিয়ে।'

'আমাকে পাবিই না। কে তোকে অন্দরে ঢুকতে দেবে?'

সহসা উন্মাদের মতো বাচ্চুকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই একটা গাধা।' তারপর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিল। বলল, 'শোন বাচ্চু, তোকে আমি পরি দেখিয়েছি, সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাব। মনে রাখিস, আমি ইন্দু। ভেবেছিলাম, তুই এলে দু'জনে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। আমার তো আর কেউ নেই। কাউকে বলতেও পারি না। তুই চাস আমি মরে যাই। সবাই চায়। আমার মাথার ঠিক নেই। আমার স্মৃতিভ্রম হয়। হ্যাঁ, আমি জানি কেন অবতারকে তুষ্ট করা হচ্ছে।'

বাচ্চু কেমন বিচলিত বোধ করল। ইন্দু যদি কিছু করে বসে। সত্যি সে একা। তাকে তার ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না। সে কেন এভাবেই খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকবে। তারপর একদিন ইন্দুকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সর্বজ্ঞের সেই দুর্গম বনজঙ্গলে। ইন্দু কপালকুণ্ডলা হয়ে যাবে। আসলে বাচ্চুর মনে হল, দুষ্ট আত্মা ভর করেছে সর্বজ্ঞের উপর। বাবুমশাইয়ের মাথায়। ইন্দু ইচ্ছে করলে সে সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাতে পারে, বাচ্চু অবিশ্বাস করে না।

'দেবীদর্শন করিয়ে কী হবে ইন্দু?'

'কী হয় দ্যাখ না। তোকে জ্যান্ত পরি দেখিয়ে কী করেছিলাম। তখন পালাচ্ছিলি কেন। নদীর চরে একা দেখলে ভয় পেতিস কেন? জানিস সবাই নদীর চরে দাঁড়িয়ে থাকে। পরি না হয় ভূত, নয় দেবতা দেখতে পায়। দেবদেবীরা তো পৃথিবীতে এভাবেই এসেছেন। মানুষ ঠেকে শিখেছে। সে যাবেটা কোথায় বল। ইস, নিশিকাকা থাকলে তোর সব ভয় কেটে যেত।

কুসংস্কার কেটে যেত। নিশিকাকা স্বদেশি করতেন জানিস। বাবাকে তড়পে গিয়েছিলেন— এসব কী হচ্ছে বাড়িতে, সারা বাড়িটা অবতারের আতঙ্কে ডুবে আছে। আপনি ভেবেছেন কী! মানুষ কখনও অবতার হয়! ঠাকুরদেবতা হয়! সে কখনও মানুষের নিয়তি কী বলতে পারে! বলুন! লোকটা ঠকবাজ। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের নামে মানুষকে আতঙ্কে ফেলে দিচ্ছে।'

বাচ্চু ক্রমে অভিভূত হয়ে পড়ছিল। এ-ইন্দুকে সে চেনে না। ইন্দু তাকে জীবনের আর-এক সৌন্দর্যের খবর দিচ্ছে— যা সে কিছুটা জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছে। সে এবারে কী ভেবে বলল, 'চল। কিন্তু যাবি কী করে?'

'তুই যাবি?'

'যাব।'

ইন্দু বলল, 'আমাকে অনুসরণ কর।'

ইন্দু যেন আবার সেই সরল বালিকা। সে ইন্দুর পেছনে হেঁটে যাচ্ছে। পাঁচিলের কাছে গিয়েই ইন্দু কী ভাবল কে জানে। বাচ্চুর পায়ের দিকে তাকাল।

'জুতো পরে এলি না?'

বাচ্চু দেখল ইন্দুর পায়ে কালো রঙের জুতো। সাদা মোজা। এটা সে আগে লক্ষই করেনি। ইন্দু শাড়ি সামান্য তুলে দড়ি ধরতে গেলেই সে ইন্দুর পায়ে মোজা পরা আছে বুঝতে পারল।

'দাঁড়া।'

ইন্দু কেন জুতো-মোজা পরে আসতে বলেছে সে বোঝে। রাতে পোকামাকড়ের আতঙ্কও কম না। ইন্দুর এত সতর্ক নজর— আর কিনা সেই ইন্দুকে বলছে, দুষ্ট আত্মা ভর করেছে তার উপর। ইন্দুর কিচ্ছু হয়নি।

বাচ্চু জুতো-মোজা পরে আসতেই ইন্দু বলল, 'আমি উঠছি। দেখ, পাঁচিল বেয়ে কীভাবে উঠতে হয়। দড়িটা শক্ত করে ধরিস, ইটের ভাঁজে ভাঁজে পা রাখ। ওঠ। উঠে আয়। এ কী রে, পড়ে যাচ্ছিস কেন? ওঠ।' বলে ইন্দু পাঁচিলের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বাচ্চুকে। পাঁচিলের উপর দিয়ে ইন্দু অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছে। সে পারছে না। গাছের ডাল ধরে কিংবা কোনও

অবলম্বন না-থাকলে মনে হল সে পড়ে যাবে। জ্যোৎস্না রাতে এ এক আশ্চর্য যাত্রা। কিংবা বাচ্চুর কাছে কোনও বড় দুঃসাহসিক অভিযানের মতো। দেড়-দু' মানুষ উঁচু পাঁচিলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া কত সহজ সে কিছুটা গিয়েই তা টের পেল।

ইন্দু কেবল বলছে, 'নীচের দিকে তাকাবি না। সামনে তাকা। মনেই হবে না, পাঁচিলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস।'

ওরা রান্নাবাড়ি, গোলাঘর, গোশালা পার হয়ে সুপারির বাগানে আসতেই ইন্দু লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু বাচ্চু অত উঁচু থেকে লাভ দিতে ইতস্তত করছে। বাচ্চুটার অভ্যাস নেই। পড়ে পা না আবার ভাঙে!

ইন্দু নীচে দাঁড়িয়ে বলল, 'পারবি না। পাঁচিলের উপর দিয়ে আয়। হেঁটে আয়।'

ইন্দু সুপারি বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটছে। সে পাঁচিলের উপর দিয়ে হাঁটছে। ইন্দু কিছুটা গিয়ে বলল, 'এবারে নাম। সুপারি গাছ বেয়ে নেমে আয়। একটা সুপারি গাছ ঠিক পাঁচিলের পাশে উঠে গেছে। ইন্দুর এত বুদ্ধি। যদি সে লাফিয়ে নামতে গিয়ে হাত-পা ভাঙে তবে আর-এক বিপদ। ইন্দু কোনও ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে চাইছে না। মেয়েটার এত টান তার জন্য, ভাবতেই বাচ্চুর আর ইন্দু সম্পর্কে কোনও সংশয়ই রইল না। এতটুকু বাচ্চুর ক্ষতি হয়, ইন্দু সত্যি চায় না।

এই এক জগৎ— মানুষের এই বয়সে কোথায় যেন এক গভীর অনুভূতির জগৎ তৈরি হয়ে যায়। কারণ এই সুপারির বাগানে দুই বালক-বালিকা নেমে এসেছে, কেউ দেখলে ভয় পেতেই পারে। অস্পষ্ট ছায়া তাদের— আর সুপারির বাগানে সব গাছগুলি যেন ইন্দুর পাহারাদার। মাথা উঁচু করে দিয়েছে। হাওয়ায় দুলছে। কোথাও পাকা সুপারি টপাটপ ঝরছে। কোনও গাছ থেকে বাদুড় উড়ে গেল। কোনও গাছের ছায়া লম্বা হয়ে গিয়ে দিঘির জলে পড়েছে। ঝিঝি পোকা ডাকছে।

ইন্দু একটা জায়গায় এসে থামল। বলল, 'তোকে আমি এখানে জ্যান্ত পরি দেখিয়েছিলাম, মনে আছে?'

বাচ্চু বলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে। তুই বললি, চোখ বোজ। বললি, এক-দুই-তিন। তারপরই চোখ খুলে দেখি কাছে কোথাও তুই নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছিস।'

ইন্দু বলল, 'আবার চোখ বোজ।'

বাচ্চু চোখ বুজল।

'এক-দুই-তিন। চোখ খোল।'

বাচ্চু চোখ খুলে দেখল ইন্দু নেই। আরে আবার সেই পরি। তবে আগের মতো এতটুকু বিচলিত হল না। কারণ ইন্দুর এই লুকোচুরি খেলা তার কাছে খুব প্রিয়ই মনে হল। সে ডাকল, 'এই বিন্নির খই, বিন্নির খই, তুই কোথায়?' ফিসফিস গলায় ডাকছে। জোরেও না। কারণ এত রাতে ইন্দুর সঙ্গে সে সুপারির বাগানে নেমে এসেছে। ধরা পড়লে কেলেঙ্কারি।

ইন্দু ঠিক তিন-চার পা সামনের একটা ঝোপ থেকে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াল ঠিক, তবে ইন্দুর সবটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু মুখ দেখা যাচ্ছে। তারপর ইন্দু দৌড়ে উঠে গেল। এসে বলল, 'বুঝলি কিছু?'

'না, মানে!'

'পাশে একটা নালা আছে। দু'পাশ থেকে বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে নালাটা ঢাকা থাকে। টুপ করে লাফিয়ে পড়লেই অদৃশ্য।' বলে সে আবার চোখের সামনেই পলকে লাফ দিয়ে নালায় ঘাস-জঙ্গলে ডুবে যেতেই বাচ্চু তার বোকামি টের পেয়ে গেল। বলল, 'ইন্দু, তোর এত বুদ্ধি!'

ইন্দু বলল, 'উঁহু, এখন আমি বিন্নির খই। তুই লাল বাতাসা। কে কোথা থেকে ইন্দু ডাকলে টের পাবে, বুঝিস না কেন!'

'কিন্তু...।' বলেই থেমে গেল বাচ্চু।

'কিন্তু কী আবার?'

'মাথার উপর যে দেখলাম একটা বাচ্চা পরি আকাশের নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।'

'তা তো দেখবিই। ভয়ে মরছিস। ভয় থেকেই তো ঘোরে পড়তে হয়। মেঘের ছেঁড়া টুকরো যদি সে-সময় আকাশের নীচে দিয়ে ভেসে যায়— পরি মনে হতেই পারে। সাদা মেঘের টুকরো হলে তো কথাই নেই।'

বাচ্চু আর কী বলবে ভেবে পেল না। তারপরই মনে হল, ছাদের সেই বাচ্চা পরিটা তবে কে?

'কী রে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?'

'না বুঝলি, ওই যে নবমী পূজার দিন, মনে আছে, তুই আমাকে বললি বাচ্চা পরিটা আজ আসবে। আসিস। তোকে বাচ্চা পরি দেখাব। মনে পড়ছে সাঁঝ লাগলে যেতে বলেছিলি। আমি তো গেলামও। তুই বলেছিলি না, ছাদে তুই থাকবি। ভয় পাস না।'

'ছাদে তো আমি ছিলাম।'

'মিছে কথা। ছিলি না। এত ডাকলাম সাড়া নেই। কেবল দেখি কার্নিশের মাথায় পদ্মফুলে বাচ্চা পরিটা এক পায়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি। সাদা শাটিনের ফ্রক গায়। জ্যোৎস্নায় শ্বেতপাথরের বাচ্চা পরিটা এক পায়ে অত উঁচু থেকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে উড়ে যাবে বলে। ভয়ে পালাতেই পেছন থেকে কে এসে জাপটে ধরল। বল, সাহস থাকে। পরিটার কাজ।'

'তোর মুন্ডু। এত করে বললাম, আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তুই পালাচ্ছিলি বলে ছুটে এসে জাপটে ধরেছিলাম। এক কথা বারবার।'

'চল।' বলে ইন্দু তাকে নিয়ে লাফিয়ে পাঁচিলের পাশে চলে এল। সুপারি গাছ বেয়ে পাঁচিল টপকে তাকে নিয়ে লোহার সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে গেল। বাড়িটার ঠাকুরদালান বাদে আর কোথাও কোনও আলো নেই। অন্ধকার বারান্দায় ঢুকে ইন্দু বলল, 'আমার হাত ধর। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়িস না।' ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ইন্দু তাকে সিঁড়ি ধরে ছাদে নিয়ে গেল। তারপর সেই শ্বেতপাথরের পদ্মে অবলীলায় দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিতেই বাচ্চু স্থির থাকতে পারল না। নীচে পড়ে গেলে ছাতু হয়ে যাবে ইন্দু। সে হাত বাড়িয়ে ইন্দুকে জড়িয়ে ধরল। 'তুই পড়ে যাবি— আর দরকার নেই। যথেষ্ট হয়েছে। আর তোকে বাহাদুরি দেখাতে হবে না। তুই সব পারিস, সব, সব। তুই লোকটাকে দেবীদর্শনও করাতে পারিস।'

'তা হলে বুঝতে পারছিস, আমি তোকে এক ঘোরে ফেলে দিয়েছিলাম, সর্বজ্ঞ বাবাকে আর এক ঘোরে। আয়।'

২২

দু'জনই পা টিপে টিপে অন্ধকার সিঁড়ি ধরে বারান্দায় নেমে গেল। তারপর লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিমেষে পাঁচিল টপকে পিলখানার দিকে ইন্দু দৌড়োতে থাকল। কেন পিলখানার দিকে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। দিঘির পাড় ধরে, তারপর আমবাগানে ঢুকে বলল, 'আয়।' হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে। নিশীথে এই ঘণ্টাধ্বনি যেন কোনও এক অলৌকিক পৃথিবীর খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। অথচ আশ্চর্য, এইমাত্র সে দেখল, অলৌকিক বলে কিছু নেই, পরি বলে কিছু নেই, ঈশ্বরের বিভূতি মানুষের মধ্যে ঘোর ছাড়া কিছু না। ইন্দুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরেই সে টের পেল, তার মধ্যেও কম বাহাদুরি নেই। কারণ সে ইন্দুর মতোই পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। এতটুকু লাগেনি।

ইন্দু গাছের ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে। আর দৌড়োচ্ছে না। হাতিটা জ্যোৎস্নায় একটা টিবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। যেন স্থির। এমনই মনে হচ্ছিল দূর থেকে। বিশাল আমবাগানের মাঝখানে ঘাসের জমি, সবুজ এবং তৃণাচ্ছাদিত। হিম পড়েছে। জুতোয় ঘাস-পাতা লেগে সেঁটে যাচ্ছে। ভারী মনে হচ্ছে পা। অবশ্য এখন ইন্দুর সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বাচ্চুকে ইন্দু আর কী দেখাতে চায় সে বুঝতে পারছে না। অকারণ ইন্দু কোথাও তাকে নিয়ে যাবার পাত্রী নয়— কোনও ঠিক উদ্দেশ্য আছে। তার এখন ইন্দুকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায়ও নেই।

ইন্দু কাছে যেতেই হাতিটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। শুঁড় তুলে যেন ইন্দুকে, তাকে সেলাম জানাচ্ছে। ইন্দু কাছে যেতেই শুঁড় নামিয়ে দিল। আর ইন্দু দৌড়ে সেই শুঁড় বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য, এবারে ইন্দু শুঁড়ের মাথায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী দেখলি?'

বোকার মতো বাচ্চু তাকিয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় ইন্দুর সাদা লালপেড়ে গরদ এবং দেবী প্রতিমার মতো মুখ, আর তার দু' বাহু তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি সহসা দেখলে, কিংবা গভীর রাতে, কিংবা কোনও জ্যোৎস্নায় অথবা নির্জন নদীর চড়ায়, সাধারণ মানুষ কোনও দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন ভাবতেই পারে। কিংবা দেবীদর্শন লাভ করেছেন এমন এক ঘোরেও পড়ে যেতে পারে,

কত উঁচুতে শুঁড়ের ডগায় এক পায়ে ইন্দু কত অবলীলায় দাঁড়িয়ে তাকে বলছে, 'কী বুঝছিস।'

বাচ্চু বলল, 'আমার আর কিছু বোঝার নেই। তুই নেমে আয়।'

আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দু নেমে এল।

কোনও সংকেত ঠিক আছে, যা তার প্রিয় অতিকায় জন্তুটি নিমেষে টের পায়। না হলে ইন্দু এত সহজে উঠেও যেতে পারত না, নেমেও আসতে পারত না। যেন দু'জনের মধ্যে এক অপার ভালবাসা এই সংকেতের মূলে।

ইন্দু নেমে এসেই হাতিটাকে আদর করল। গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিল। হাতিটা আগুপিছু করছে। একটা পা শেকলে বাঁধা বলে এগোতে পারছে না। একই জায়গায় সে এক পা সামনে যাচ্ছে, আবার পিছিয়ে আসছে। দাঁতদুটো এত সাদা যে, জ্যোৎস্নায় চকচক করছিল।

বাচ্চুকে এবারে ইন্দু হাতিটার কাছে নিয়ে গেল। বলল, 'আদর কর।'

'ভয় করে।'

'ভয় করে! বাঘ না ভালুক, ভয় করবে। আয় বলছি। সেবারেও তুই লক্ষ্মীকে আদর করলি না। পালালি।'

বাচ্চু যতই সাহসী হোক, কিংবা বাহাদুরি দেখাক— হাতিটার সামনে সে কেমন গুটিয়ে গেল। কী মতিগতি হবে— সে কিছুতেই যেতে রাজি না। ইন্দুও ছাড়বে না।

'আয়। আয় না। তোকে ভালবাসবে। লক্ষ্মী বুঝে ফেলেছে, তুই আমার খুব কাছের।' তবু যখন বাচ্চু যাচ্ছে না, ইন্দু রেগে গিয়ে বলল, 'দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।' আর বলতে-না-বলতেই হাতিটা শুঁড় দিয়ে বাচ্চুকে পেঁচিয়ে মাথার উপরে নিয়ে বসিয়ে দিল।

সে চিৎকারও করতে পারছে না। কে কোথায় টের পাবে। তারা ধরা পড়ে যাবে। কেবল মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হড়কে যাবে পিঠ থেকে। কিন্তু হাতিটার শুঁড় বেয়ে নিমেষে ইন্দুও উপরে উঠে এল। ওর হাত ধরে পাশে বসে বলল, 'কী, আর ভয় করছে?'

বাচ্চু বলল, 'করছে।'

ইন্দু রেগে গিয়ে বলল, 'মারব এক থাপ্পড়। ভয় করছে!' ইন্দু তারপর

হাতির পিঠে অবলীলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'বাচ্চু তুই আমার মাথার কাছে বসে থাক। আমি আকাশ দেখি। কত বড় এই আকাশ, কত নক্ষত্র, জানিস তো এর আদিও নেই, অন্তও নেই।'

'কে বলেছে?'

'নিশিকাকা। নিশিকাকাকে দেখলি না,' বলেই ইন্দু ধড়ফড় করে উঠে বসল। যেন নিশিকাকার কথা মনে হতেই তার ভিতরে ক্ষোভ-জ্বালা বেড়ে গেছে।

নিশিকাকা কত বড় মানুষ। কতবার স্বদেশির জন্য জেল খেটেছেন। তাঁকে মেরে ফেলল!

হাতির পিঠে বসে কথা বলতে বাচ্চুর অস্বস্তি হচ্ছিল। যেন সে কোনও সময়ে অসতর্ক হলে গড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ইন্দু আবার যে শুয়ে পড়েছে। উপুড় হয়ে দু'হাতে চিবুক রেখে বলছে, 'নিশিকাকা বলতেন, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এসব নিয়ে সৌরজগৎ। এমন নাকি কোটি কোটি সৌরলোক আছে। ভেবে দেখ, সেই অনন্ত যাত্রার কথা। বলতেন, কতশত আলোকবর্ষ পার হয়ে কৃত্তিকা, অশ্বিনী, রোহিণী নক্ষত্র আকাশে জ্বলজ্বল করছে। এমন কত হাজার কোটি নক্ষত্র আছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়নি, পৃথিবী থেকে হাজার লক্ষ গুণ বড় অসংখ্য এই নক্ষত্রমালার মধ্যে তুই আমি কতটুকুন, ভেবে দেখ। ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায় না! ছাদে উঠলেই তিনি আমাকে নক্ষত্র চেনাতেন। বলতেন, ঈশ্বরের অপার মহিমা যদি কোনওদিন নিজের মধ্যে অনুভব করিস, তবে সেই অনন্ত অসীমের কাছে মাথা নোয়াবি। অনন্ত জিজ্ঞাসার কাছে মাথা নোয়াবি। আর ঈশ্বর! তিনি সর্বত্র। গাছপালা, প্রাণীজগৎ, এমনকী যা-কিছু দেখিস, এই জ্যোৎস্না, রোদ্দুর, ফসলের জমি, বর্ষা, গ্রীষ্ম কিংবা আগুন সব তাতেই তিনি। মানুষ কখনও অবতার হতে পারে! সাধ্য কী সে বীজের জন্ম দেয়, নক্ষত্রের জন্ম দেয়!'

বাচ্চু শুনছে ঠিক, তবে হাতিটা কেবল দুলছে বলে পিঠ আঁকড়ে বসে আছে। যেন ঠিক মন দিয়ে শুনতে পারছে না। ইন্দু যেন সব টের পায়। সে বলল, 'ওঠ। নাম।'

'নামব কী করে!'

'এগিয়ে যা।'

অবাক। সে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্মী তার শুঁড় সোজা করে দিল। শুঁড়ের উপর হেঁটে যেতেই সে নীচের দিকে নেমে যেতে থাকল।

বারবারই মনে হয়, সত্যি সে এ-ইন্দুকে চেনে না। মুহূর্ত আগের ইন্দু মুহূর্ত পরের ইন্দুর মধ্যে এত ফারাক! এই বড় চেনা মনে হয়, আবার কেন অচেনা হয়ে যায়। অথবা মনে হয়, সুদূরের বর্ণমালা ইন্দুর মধ্যে নদীর জলের মতো খেলা করছে। মনের কোণে গভীর কোমল ইচ্ছেরা, না কে জানে, কোথায় থাকে, কীভাবে উঠে আসে, দু'জনে সংলগ্ন হয়ে বসে থাকলে টের পায়।

ইন্দুর কথাবার্তা শুনে সে দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গোঁজ করে রেখেছে। একটা কিছু করবে ইন্দু। সেটা কী, জানে না।

ইন্দু কোমর থেকে আঁচল খুলে শানের উপর বসে পড়ল। এখন এত স্বাভাবিক, মনেই হয় না, সামনে ইন্দুর ঘোরতর বিপদ। বিপদটা যে কী! বাচ্চু তাও সঠিক জানে না। ইন্দুকে অন্দর থেকে বের হতে দেয় না, কেউ ভালবাসে না তাকে। ঘোরতর বিপদ হবে কেন। লক্ষ্মীকে যদি মেরেই ফেলে— বাবুমশাইয়ের কি মাথা খারাপ, পাগলা হাতিকে মেরে ফেলা হয়, লক্ষ্মী স্বাভাবিক থাকলে মারবে কেন? লক্ষ্মীকে মেরে ফেলা হবে এটা সে বিশ্বাস করতে পারে না। ঘোর বিপদ সম্পর্কে বাচ্চু অবশ্য নিজের মতো ভেবে নিয়েছে। সর্বজ্ঞ যদি কাপালিক হয়, আর বাবুমশাই যদি তার ঘোরে পড়ে যান, ইন্দুকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করতেই পারেন। মানুষ তো তখন নিজের মধ্যে থাকে না! তার উপরও এক দুষ্ট আত্মার ভর হয়। কাপালিকের একজন কপালকুণ্ডলা না হলেও যে চলে না। কাপালিকও তো মানুষ— তারও অসুখ-বিসুখ থাকতে পারে, জ্বরজ্বালায় কে দেখে। ইন্দুকে নিয়ে যতই ভাবে, ততই বিপাকে পড়ে যায়। একবার মনে হয় ইন্দু ঠিক বলছে, আবার ধন্দ দেখা দিলে মনে হয় ইন্দু ঠিক বলছে না।

লক্ষ্মী ইন্দুকে কিছুতেই সুস্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। কখনও মাথার উপর শুঁড় দোলাচ্ছে, কখনও গা থেকে আঁচল ফেলে দিচ্ছে, খোঁপা খুলে দিচ্ছে।

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখছিস, কী করছে! কিছু বলি না বলে পেয়ে বসেছে!' কপট রাগ ইন্দুর কথায় ফুটে উঠেছে। 'মারব লক্ষ্মী, ভাল হচ্ছে না।

আবার! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।' বলেই একটা ছোট ডাল নিয়ে তেড়ে যেতেই লক্ষ্মী শুঁড় তুলে পিছিয়ে যাচ্ছে। ইন্দুকে যে ভয় পায়, শুঁড় উপরে তুলে জানিয়ে দিল। যেন হাতিটা বলছে ক্ষমা চাইছি, আর করব না।

ইন্দু আবার এসে বসল বাচ্চুর সামনে। বলল, 'লক্ষ্মীটা এত জ্বালায় কাছে এলে! ওর কী দোষ বল। জ্বালাবেই তো। লক্ষ্মী তো বোঝে, আমি ছাড়া তার কেউ নেই।'

বাচ্চু বলল, 'তোরও লক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ নেই।'

'কেন তুই! তুই তো আছিস। তুই কি ভয় পাস আমাকে, কী রে— তুই এ-কথা বললি কেন। তোকে তো বলে ভুল করেছি। কেউ জানে না, কেবল তোকেই বলেছি দেবীদর্শন করাব সর্বজ্ঞকে। তুই আবার কাউকে বলে দিবি না তো!'

'শোন ইন্দু, আমি উঠছি। তোর মাথায় সত্যি পোকা আছে। আমি তোকে ভয় পাই। আমি সবাইকে বলে বেড়াব ভাবলি কী করে!'

বাচ্চু সত্যি উঠে চলে যাচ্ছে।

ইন্দু বলল, 'যা, একা যাস কী করে দেখি! দিঘির পাড় ধরে চলে যা। আমি তো চাই, একা ফিরে যা তুই। আসলে তুই আগের মতোই ভিতু আছিস।'

'যেতে পারব না একা?'

'যা না। তোকে কে বারণ করেছে!'

বাচ্চু কিছুটা গিয়েই ফিরে এল। ভয়ে না টানে বোঝা গেল না। কাছে এসে বলল, 'চল তুই। আমার একা যেতে সত্যি ভয় লাগছে। অন্ধকারে রাস্তা চিনে যেতে পারব না।'

'খুব পারবি। আমি যাচ্ছি না। কত কাজ আমার। লক্ষ্মীকে পেট ভরে খেতে দেয় না পর্যন্ত।' বলে ইন্দু কিছু কলাগাছ টেনে এনে হাতিটার সামনে ফেলে দিল। 'পাপ হবে না, কাকে কী পাপে খায় কেউ জানে না। বেঁধে রেখে শুকিয়ে মারার মতলব। পবনদাটাও হয়েছে তেমনি। 'হ্যাঁ, হুজুর, কম খেতে দিচ্ছি। খাইয়ে আর কী হবে। চলে যাবে যখন, খাইয়ে অর্থ নষ্ট।''

বাচ্চু বলল, 'বসেই থাকবি?'

'আমি বসে আছি! ধর না। একা টানতে পারছি না।'

বাচ্চু আর কী করে! রাজ্যের ডালপালা জড়ো করে নিয়ে এল দু'জনে। কোথা থেকে ইন্দু একটা কাটারিও তুলে এনেছে। তা হলে ইন্দু রাতে গোপনে বের হয়ে যায় হাতিটাকে খেতে দিতে হবে বলে! কী দুঃসাহস। ইন্দুর দস্যিপানা তবে বিন্দুমাত্র কমেনি। আগে ছিল একরকম, এখন অন্যরকম।

২৩

বাচ্চু আর ইন্দু হাতিটার খাওয়া দেখছে। হাতিটার পেট ভরেছে এটা কীভাবে যে ইন্দু টের পায়— কিংবা সে হয়তো জানে হাতির খোরাক কত। আর হাতিটার জন্য তার একটা গোলা আছে জঙ্গলের মধ্যে। চাল ডাল নারকেল থাকে গোলাতে।

ইন্দু ঝুড়ি করে চাল ডাল নারকেল দিল শেষ পাতে খেতে।

ইন্দুর অন্যদিকে কোনও খেয়াল নেই। সঙ্গে বাচ্চু আছে, তাও ভুলে গেছে। শিশুর মতো বসে অন্ধকারে হাতিটার খাওয়া কী করে টের পায় ইন্দু তাও সে বুঝতে পারছে না। ইন্দুকে সে এবার না বলে পারল না, 'চল। শুনতে পাচ্ছিস কনসার্ট বাজছে।'

যাত্রার শেষ কনসার্ট শোনা যাচ্ছিল।

ইন্দু বলল, 'শেষ না। আরও একবার কনসার্ট বাজবে। সকাল হয়ে যাবে যাত্রা ভাঙতে।'

এবার ইন্দু কী বুঝল কে জানে। বলল, 'কাল আবার। কেমন!'

বাচ্চু আর ইন্দু হাঁটছে। একটা ছোট্ট টর্চবাতিও ইন্দু লুকিয়ে রাখে।

দিঘির পাড়ে আসতেই পাতাবাহারের গাছগুলোর ঝোপ থেকে সে টর্চটা তুলে নিল।

ইন্দুকে না জানলে সে এটাও কোনও ভৌতিক ঘটনা মনে করত। এবারে টর্চ জ্বালল, খুব সন্তর্পণে। বলল, 'আমার জন্য তোর এবারে আর যাত্রা দেখা হবে না। আমার খারাপ লাগছে।'

বাচ্চু কিছু বলল না। কাছারিবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ইন্দু পাঁচিল বেয়ে কার্নিশ

ধরে উঠে গেল ছাদে। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল।

পরদিন বাচ্চু আবার আগের মতোই পাঁচিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পেল ইন্দু নেমে আসছে। এখনও ইন্দু কেন যে সব খুলে বলছে না। ইন্দু তো জানে তার কী হবে। কিংবা কীভাবে দেবীদর্শন করাবে, কীভাবে হাতিটাকে রক্ষা করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। লক্ষ্মী ইন্দুকে পাগলের মতো ভালবাসে। স্বচক্ষে দেখেছে সে। তারা সোজা পিলখানায় চলে গেল। হাতিটার সামনে বসল। হাতিও আগের মতোই শুঁড় বাড়িয়ে দু'জনকেই পিঠে তুলে নিতে চাইছে।

'আয় সরে বসি। নাগালে থাকলেই বারবার ঝামেলা পাকাবে। এত দুরন্ত।'

ইন্দু এবার একটু সরে এসে ঘাসের উপর বসল। কোনও কথা বলল না। মাথা হাঁটুতে ঢেকে বসে আছে।

ইন্দু কি কাঁদছে!

বাচ্চু আর পারল না। তাকে জানতেই হবে সব।

'তোর কী হয়েছে বলবি তো?'

'কী হবে?'

'বা রে, লিখলি নদীর পাড়ে হারিয়ে যাবি। তোর উপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে। বাবা চিঠিতে লিখেছেন। আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমিও না, জানিস!'

'তার মানে?'

'মানে, কী হবে বাবা আর সর্বজ্ঞ জানেন। শুধু ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ। আমি বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি, এটা নাকি মেয়েদের পক্ষে অশুভ ব্যাপার।'

'বা রে, ঘরে বসে থাকতে সবসময় ভাল লাগে! রামুদা যে বলল, তোর কপালে নাকি আছে আত্মঘাতী হবি, না হয় অপঘাতে মারা যাবি। রামুদা বলল, বাবামশাই তোকে উচ্ছৃঙ্খল করে দিয়েছেন। চিঠিতেও লিখেছিলি।'

'চিঠিতে লিখতেই পারি। যা শুনেছি লিখেছি। আত্মঘাতী কেন হব! অপঘাতে কে কীভাবে মারা যায় আগে থেকে কেউ বলতে পারে? বল,

পারে?' শেষে কী ভেবে বলল, 'রামুদা হয়তো জানে। আমি কিচ্ছু জানি না। তবে বছর-দুই ধরে আমাকে বাড়ির কেউ বিশ্বাস করে না। ভয় পায়। যেন আমার সংস্পর্শে এলেই সবার জাত যাবে। আমি খুব একা হয়ে গেছি, বাচ্চু।'

'কে করাচ্ছে?'

'তাও বুঝছি না।'

'তুই কোনও উৎপাত করেছিলি?'

'করব না! সব মিছে ভড়ং, জানিস। চাঁপাফুল না ছাই। লাল আলখাল্লা পরে থাকেন। দুশমন, কাছে কেউ যেতে পারে না। পিঠে সুতোয় আঁটা চাঁপাফুল। গলার সামনে লাল সুতো— আর কিছু না। লাল সুতো থাকলে, লাল রঙের আলখাল্লা পরলে দূর থেকে টের পাওয়া যায়। অগোচরে পিঠে চাঁপাফুলের মালা রেখে দিয়েছে, কে টের পাবে বল। আমার যে কেন মরণ হল, জানি না, নিশিকাকাই পাঠালেন, খাটের নীচে লুকিয়ে থাকতে বললেন। দেখতে বললেন, আড়ালে। পেছনে কী আছে দেখবি।'

'তুই পারলি? তোর ভয় করল না!'

'সাপ না বাঘ, ভয় পাব!'

অবশ্য বাচ্চু জানে না, ইন্দু সাপ-বাঘকেও সত্যি ভয় পায় কি না।

ইন্দু বলেই যাচ্ছে, 'হঠাৎ উঠে দাঁড়ালাম পেছনে। বললাম, হাত ঘোরালেই নাড়ু। তারপর চাঁপাফুলের মালাটি নিয়ে দৌড়।'

'কোপে পড়ে গেলি তো!'

'হুংকার সর্বজ্ঞের— দুষ্ট আত্মা ঘরে ঢুকেছে। জপতপে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে!'

কে, কে! আমি আর থাকি! কাকা বসেছিলেন আমার ঘরে। হাতে এনে দিলাম। নিশিকাকা আমার সাহস দেখে কী খুশি। জানিস, দাদাদের নিশিকাকা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শেখাতেন। বললেন, 'তোরও হবে। কাল থেকে আমি তোকেও শেখাব।'

'নিশির পাল্লায় পড়ে আমি গোল্লায় যাচ্ছি— বাবা টের পেয়ে বললেন, 'নিশি, তুমি মালাটি ওর হাত দিয়ে পাঠিয়ে না দিলেই পারতে, গুরুদেবকে ছোট করে তোমার কী লাভ বুঝি না। তুমি বলছ, আমি আতঙ্কে পড়ে সর্বজ্ঞের

পায়ে শরণ নিচ্ছি। নিশি, তুমি জানো না, আনন্দ, কী আনন্দ। জীবনের এই আনন্দের স্বাদ পেলে না নিশি, স্বদেশি করে দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছ। ইংরেজ চলে গেলে দেশটা কে চালাবে। আইন থাকবে, শাসন থাকবে। মানুষ ভাত-কাপড় পাবে না। জোর-জুলুম অরাজকতায় দেশ ছারখার হয়ে যাবে না।'''

'নিশিকাকা তোকে দিয়ে মালা পাঠিয়েছিলেন।'

'ধুস, তোর মাথায় কিচ্ছু নেই রে। হাতেনাতে ধরা কে পড়তে চায় বল। গুরুদেব একেবারে গুম হয়ে বললেন, 'যোগ, যোগাসনের ব্যবস্থা করো মুরারিমোহন।' আর যোগাসনে বসলেন, বেলা যায়, বাপ-মা, বাড়ির সবার কী উৎকণ্ঠা। কখন চোখ খুলবেন প্রত্যাশায় বসে আছেন। আমি পেছনে। বাবা শাসন করতে গেলে কী বলেছিলেন জানিস, 'ছেলেমানুষ ইন্দু। তাকে তুমি কেন ধমকাচ্ছ। তার কী দোষ'!''

'তারপর?'

ইন্দু বলল, 'তারপর সহসা ভেউ ভেউ কান্না!'

'কার?'

'কার আবার! বুঝিস না কার! চোখ মেলে তাকালেন। আলখাল্লার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, 'এ কী দেখলাম মুরারি! নিশির যে আয়ু আর দেখতে পাচ্ছি না। শিব-চতুর্দশীর আগেই যে তার আয়ুরেখা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে'!''

'আয়ুরেখা ফাঁকা হয়ে গেল মানে!'

'তোর মুণ্ডু। তোকে আসতে লেখাটাই ভুল হয়ে গেছে। আয়ুরেখা ফাঁকা হয় কখন বুঝিস না?'

বাচ্চু যে না বুঝতে পারে তা নয়। তবে কেউ কি বলে দিতে পারে কার কখন মরণ। সে কি চোখে দেখা যায়! কত বড় মহাযোগী তবে সর্বজ্ঞ! তার দুরভিসন্ধি টের পাননি তো! আর আয়ুরেখা ফাঁকা হয়ে গেছে টের পেয়ে গেলেন! বাচ্চু কিছুটা হতাশ গলায় বলল, 'বাবা যে বললেন, নিশিকে খুন করেছে!'

'খুনই তো। নদীর চরে লাশ। পবনদা নদীতে সকালে মাছ ধরতে গিয়ে টের পেল। জলে-ডাঙায় পড়ে আছে। জলে চুবিয়ে মেরেছে।'

'পুলিশ দারোগা?'

'কী করবে? সব পোষা তাঁর। বাবার হা-হুতাশ, 'গেলি তো। বাবাঠাকুরের কোপে গেলি তো'!'

বাচ্চু দাঁত কিড়মিড় করছে, 'ইন্দু, মানুষ না— খুনি।'

'বাচ্চু-উ।' থেমে বলল, 'লাল বাতাসা!'

ইন্দু বাচ্চুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'কখনও বলবি না। তবে তুইও কোপে পড়ে যাবি। জানিস, এখন বুঝতে পারি বাতাসেরও কান থাকে।'

বাচ্চু সত্যি সন্ত্রাসে পড়ে গেছে, 'তোর কিছু হবে না তো!'

'কচু হবে।'

কত সহজে বলে দিল কচু হবে। তবে কি ইন্দু সর্বজ্ঞের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। তাকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না বলেই দুষ্ট আত্মার আমদানি।

'আচ্ছা, ইন্দু, তুই কম বোকা না! কার্নিশের ওপর দিয়ে একদিন হেঁটে গিয়ে সবাইকে দেখালেই পারতিস। দুষ্ট আত্মা না, তুই ইচ্ছে করলে পারিস।'

'পারিই তো। পারি বলেই বলিনি। বললে কী হত। যারা ঘোরে পড়ে যায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কমে যায়। জানিস! সর্বজ্ঞ বলতেন, দুষ্ট আত্মা ভর না করলে ইন্দু কখনও পারে! তুমি পারো! আর কেউ পারবে! বাইরে বের হবার রাস্তাটিও তখন বন্ধ হয়ে যাক। ঘিলুতে তোর কিছু নেই।'

বাচ্চু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে দেখছে সত্যি তার ঘিলু ঠিক আছে কি না। যা ব্যাপার-স্যাপার চলছে!

ইন্দুর হাই উঠছে।

ইন্দুর দেখাদেখি তারও হাই উঠছে।

ইন্দু বলল, 'ঘুম পাচ্ছে রে! তুই চলে যা।'

কী মেয়ে রে বাবা! বলছে কিনা ঘুম পাচ্ছে। চলে যেতে বলছে। বললেই যাই কী করে।

আম জাম নারকেল গাছের ভিতর পিলখানা। পিলখানায় হাতি। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে। এমনকী, সাত আনা জমিদারবাড়ির যাত্রার কনসার্টও কানে আসছে। নদীর জলে একটা লম্ফ ভেসে যাচ্ছে— খড়ের কিংবা পাতিলের নৌকা হবে হয়তো। নৌকার মাস্তুলে লম্ফটা জ্বালিয়ে রেখেছে

কেউ। অথবা গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকী জঙ্গল পার হয়ে বাজারের ভিতর দু'-তিনটি গ্যাসবাতিও জ্বলছে। তাই বলে এই গভীর রাতে ইন্দুর ভয়ডর থাকবে না। কোন সাহসে যে তাকে চলে যেতে বলে সে বুঝতে পারছে না। ইন্দু কি ঘরবাড়ির চেয়েও বনজঙ্গলে ঘাসের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে বেশি ভালবাসে!

ইন্দুর ভয়ডর নেই। দেবদেবীদের ভয়ডর থাকে না। তবে কি ইন্দু সত্যি দেবী। কোনও বনদেবী ইন্দুর বেশে পাঁচ আনা জমিদারবাড়িতে বাবুমশাইয়ের ঘরে কি তবে জন্মাল! দেবদেবীরা তো এভাবেই মানুষের ঘরে আসেন। যিশু এসেছিলেন, রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ এসেছিলেন, নিমাইসন্ন্যাস পালা সে দেখেছে, তাতেও একজন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষকে পাপতাপ থেকে উদ্ধার করতে। সে রামায়ণ-মহাভারত পড়েছে। মুনি-ঋষিদের অভিশাপে কেউ পাথর হয়ে গেছে, কেউ রাক্ষস হয়ে জন্মেছে, ইন্দু যে সেরকম কিছু না, কে জানে! সে না পেরে বলল, 'সর্বজ্ঞকে সত্যি তুই দেবীদর্শন করাতে পারবি!'

ইন্দু তেমনিই হাই তুলছে। যেন ঘুমে ঢুলে পড়বে। সে ঘাসের উপর শুয়ে বলল, 'নদী কোথায় যায় রে?'

বাচ্চু আর না পেরে বলল, 'নদী সাগরে যায়। চললাম। তুই মরবি বলে দিলাম।'

ইন্দু খপ করে হাত ধরে ফেলল, 'যাবি নদীর খোঁজে?' নদীর খোঁজে কোথায় কতদূর যাবে! সে চুপ করে তাকিয়ে শুধু ইন্দুকে দেখছিল।

ইন্দু উঠে বসল। 'সত্যি বলছিস সাগরে যায়?'

আর বাচ্চু এই গভীর রাতে পরম মমতায় লক্ষ করল ইন্দুর চোখ বড় হয়ে গেছে। এমনিতেই ইন্দু দেখতে পরির মতো। এখন দুগ্‌গা ঠাকুরের মতো দুই বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সাগর কথাটা যেন কত দূরের। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে ইন্দুরও তাই মনে হয় বুঝি। মানুষের এক অপরূপ সুষমা টের পায় নদী কোথায় যায় এমন কথার মধ্যে। বাচ্চুরও মনে হল, সেও যেন এক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, নদী কোথায় যায় জানবে বলে। বড় হওয়ার সুখে, এই এক নদীর উৎস কিংবা গ্রাম-গঞ্জ পার হয়ে কোনও পাহাড়তলির

ছায়ার নদী হারিয়ে যায় গভীর বনজঙ্গলে। কত বাঁকাচোরা পথ, কত উজান-ভাটা নদীর— তবু সে বয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, 'সাগরে গেলে কী হয়?'

বাচ্চু মুখ তুলে বলল, 'জানি না।'

ইন্দু বলল, 'নদী যদি সাগরে চলে যায় তবে আমার দরকার নেই নদী কোথায় যায় জেনে।' তারপরই কেমন গুম মেরে গেল ইন্দু। কী ভাবল কে জানে—বলল, 'সুসঙের পাহাড়ে গেছিস?'

বাচ্চু জানেই না, সেই পাহাড়টা কোথায়।

ইন্দু বলল, 'একবার গেলে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আমি গেছি। লক্ষ্মীর পিঠে চড়ে। লক্ষ্মী কিছুতেই যাবে না। কারও সাহস নেই কাছে যায়। আমি নিজে দিয়ে এলাম। রাখতে পারল না। থাকবে কেন বল। ওখানটায় তো ইন্দু বলে দুষ্টু মেয়েটা নেই। চলে এল। আচ্ছা বল, লক্ষ্মী না থাকলে আমি কী করতে পারি। আমার দোষ!'

বাচ্চু বুঝতে পারছে না, লক্ষ্মী কোথায় যেন কিছুতেই যাবে না। তবে সে বিশ্বাস করে ইন্দু ছাড়া লক্ষ্মীর যেন আর কেউ নেই। লক্ষ্মীর সুখ-দুঃখ ইন্দু যত টের পায় আর কেউ পায় না। লক্ষ্মী চলে আসতেই পারে। কিন্তু কে রাখতে পারল না লক্ষ্মীকে— সে কে? এমন প্রশ্ন করতেই ইন্দু বলল, 'সে আবার কে? সর্বজ্ঞ। বাবার এক কথা, আপনার সেবায় লাগবে লক্ষ্মী! সে যে আমার কত বড় সৌভাগ্য!'

'লোকটা সুসঙের পাহাড়ে থাকে?'

'সুসঙের পাহাড়ে থাকবে, তা হলেই হয়েছে! ওটা কত বড় পাহাড়। পাথর আর শিরীষ, কদম, জারুল গাছের বন। কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। পাহাড়ের উপত্যকায় হাজঙদের গ্রাম। কী সুন্দর! ছোট ছোট লাল নীল রঙের পাতার বাড়ি। ঢালু জমিতে বর্ষার জল। জল নেমে গেলে বিন্নি ঘাস হয়। পেঁয়াজকলির মতো পাতা। ছোট আর কানপাশার মতো দেখতে ফলের গুচ্ছ। গরিব মানুষেরা পাহাড়তলিতে শীত নেমে এলে ঘাস কেটে আনে। রোদে শুকিয়ে, বীজ সংগ্রহ করে। কালো কুচকুচে দেখতে। ডাঁটার বীজের মতো, ইস কী মজা, না, সেই বীজ থেকে বিন্নির খই।'

বাচ্চু বলল, 'তোর সত্যি মাথা খারাপ। উঠছি। সামনে তোর বিপদ-আপদ আছে বলে তো মনে হয় না।'

ইন্দু চটে গেল। বলল, 'মাথা খারাপই তো। ওঠ, ওঠ। যা। ভাগ। আমার মাথা খারাপ, আর সবার মাথা ভাল। তুইও আমাকে বুঝতে চাস না বাচ্চু! তুই এত নিষ্ঠুর!' বলেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

'আরে, কান্নার কী হল! বিন্নির খই দিয়ে এখন কী হবে?'

'মাথা খারাপ বললি কেন বল তবে!'

'না, মানে, তুই কত কথা বলছিস, কিন্তু কেন এত রাতে আবার ডেকে আনলি, বলবি তো। কথায় কথায় মাথা গরম!'

'আমি তো সে কথাই বলছি। লক্ষ্মী যাবে না— সবাই ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। শুঁড় তুলে ছুটে আসছে লক্ষ্মী। বাবা ভাবলেন, লক্ষ্মী পাগল হয়ে গেছে। বন্দুক বের করতে বললেন। আমি আর পারলাম না। লক্ষ্মী ফিরে এসে এতটা উন্মত্ত হয়ে যাবে কে জানত। আমি ছুটে গেলাম। লক্ষ্মীকে আড়াল করে সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম। লক্ষ্মী শুঁড় তুলে চিৎকার করছে। বাবা বন্দুক চালালে, আমি মরব জানতাম। কিন্তু বাবাকে তো জানি! পারেন! বাবা হয়ে পারেন! আর লক্ষ্মী তো তখন সরল বালিকা হয়ে গেছে রে। আমাকে শুঁড় দিয়ে আদর করছে। লক্ষ্মীর শুঁড় ধরে পিলখানায় নিয়ে গেলাম। পায়ে শেকল বেঁধে দিলাম। একেবারে ঠান্ডা। কিন্তু বাবার ধারণা, লক্ষ্মী পাগল হয়ে গেছে। তাকে গুলি করা হবেই।'

বাচ্চু খুবই গম্ভীর গলায় বলল, 'লক্ষ্মীকে আমরা ভাল করে তুলতে পারি না! ওকে কিছুতেই মরতে দেব না, কেমন!'

'আরে, তুই কী? লক্ষ্মী তো স্বাভাবিক, ভাল করে তোলার কী আছে। তোকে তেড়ে যায়? আমাকে তেড়ে আসে! ওর অনিষ্ট করলে, বদলা নেবে না! তুই নিতিস না? লক্ষ্মীর মেজাজমরজি না বুঝে যা-খুশি করলেই হল! লাগল তো সেই নিয়ে।'

'চাঁপাফুলের মালা নিয়ে নয়?'

'তবে তোকে কী বলছি! চাঁপাফুলের মালা নিয়ে হবে কেন! নিশিকাকা

গেলেন কেন বুঝিস না। বাবাঠাকুরের ফরমান, উন্মাদ হাতি পুষতে নেই। ব্যস, হয়ে গেল। দিনক্ষণও নাকি ঠিক করে দিয়ে গেছেন। লক্ষ্মীকে সাজিয়ে দিতে হবে।'

'কে সাজাবে, কেন সাজাবে?'

'কপালে চন্দনের আলপনা, একেবারে রানির মতো দেখাবে তখন লক্ষ্মীকে। মাথায় সিল্কের কারুকাজ করা তাজিয়া, গলায় ফুলের মালা। সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কোতলের সময়।'

'কে বলল এসব তোকে?'

'বাতাসের খবর। আমি কাছে গেলেই সবাই চুপ হয়ে যায়। আমাকে কেউ কিছু বলে না।'

২৪

গাছপালার ছায়ায় তারা মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। দূরে নদীর জল তেমনই বয়ে যাচ্ছে। বাদুড়ের ওড়াউড়ি টের পাচ্ছে তারা।

ইন্দু আজ লম্বা ফ্রক গায়ে দিয়েছে। হাঁটুর নীচে ফ্রক। সাদা শাটিনের উপর নানারঙের রেশমের ফুল ফল লতাপাতা আঁকা। ইন্দু উঠে দাঁড়ালে, আর কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে দিলে ঠিক ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই হয়ে যাবে। ইন্দুকে এমনভাবেই আজ কল্পনা করতে বাচ্চুর ভাল লাগছে।

'তবে জানিস, আমিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নই, বাবাকে বলে দিয়েছি, লক্ষ্মীর গায়ে হাত দেবে না। দিলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব। লক্ষ্মীর কিছু হয়নি। তোমরা ওর ভাল চাও না। লক্ষ্মী সব বোঝে। তোমরা কাছে গেলে খেপে তো যাবেই। ওর দোষ কী!'

বাচ্চু বয়স্ক মানুষের মতো কথাবার্তা বলছে এখন। কে বলবে, সে ক্লাস এইটে পড়ে। এবার পরীক্ষায় পাশ করলে নাইনে উঠবে।

'তোর কপালে দেখছি শেষে অশেষ দুর্গতি! এমন মহাফাঁপরে মানুষ পড়ে! এত দুষ্ট আত্মার সঙ্গে লড়বি কীভাবে বুঝছি না। দেবীদর্শন করাবি কীভাবে তাও বুঝছি না।'

'আচ্ছা বাচ্চু তুই বল, এমন নদীর পাড় ছেড়ে কেউ যেতে চায়। সেই কবে বাচ্চা-হাতিটা বড় হয়ে গেল নদীর পাড়ে। নদীর জলে স্নান, তার হেঁটে যাওয়া, পিঠে বাবুমশাই, কত দূরে দূরে যেত, আবার ফিরে আসত— হাতির মাহুত আগে ছিল নিবারণ, সে মরে গেলে তার ছেলে পবনকে পিঠে তুলে নিল— সেই পবনদা পর্যন্ত বেইমানি করছে। হাতিটাকে পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেয় না। কাকে তুই বিশ্বাস করবি বল!'

ইন্দুর কথা শুনতে শুনতে কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন্দু কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে। সে এত কথা এভাবে বলতেই পারে না। মায়া হবারই তো কথা। তারও তো বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে বেশি দিন থাকতে ভাল লাগে না। ইন্দু এত বড় ফ্যাসাদে পড়ে না গেলে, আর এত রোমাঞ্চ না থাকলে, সেও হাঁপিয়ে উঠত।

ইন্দু এবার উঠে গিয়ে হাতির পায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বাচ্চু অবাক। হাতির পায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই লক্ষ্মী পাথরের একটা ঢিবি হয়ে গেল যেন। নড়ছে না। আগুপিছু করছে না। স্থির এবং গাছের মতো। যেমন গত রাতে কার্নিশে ইন্দুকে হেঁটে আসতে দেখে আতঙ্কে গাছ হয়ে গিয়েছিল, তারপর কী মনে হতেই ভেবেছিল, গাছ হয়ে গেলে মুশকিল, ডালপালায় ভূতের আস্তানা গড়ে উঠবে, সেজন্য সে গাছ হয়ে থাকতে চায়নি— হাতিটাও যে বড় ভালবাসার কাঙাল তার ঢিবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বাচ্চু টের পাচ্ছে। জীবনের কোনও উষ্ণতা দু'জনে তারা এভাবে টের পায়। নড়লে উষ্ণতা কুয়াশার মতো হালকা হয়ে যেতে পারে, তাই নড়ছে না হাতিটা। কেউ আতঙ্কে গাছ হয়ে যায়, কেউ উষ্ণতায় মাটির ঢিবি।

ইন্দু এবারে বড় দর্পের সঙ্গে বলল, 'আমি পারি লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে। বাবাঠাকুরের সেবা লাগে! হুকুম, সুসঙের পাহাড়ে লক্ষ্মীকে দিয়ে আসতে হবে। কে গিয়েছিল, আমি। কে পারল, আমি। পবনদা গেল, ছুড়ে ফেলে দিল। যে কাছে যাবে তারই মরণ। আমাকে দেখে লক্ষ্মী ঠান্ডা। সর্বজ্ঞের সেই জঙ্গলে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। পবনদা ভিতু বালকের মতো আমার পেছনে বসে ছিল। আমার কী হাসি পাচ্ছিল না, তোকে কী বলব! সুকুমারদা সঙ্গে। টোটা-ভরতি বন্দুক। দশ ক্রোশ পথ গেলেই ভাওয়ালের

গড়। গড় পার হয়ে, টিলা পার হয়ে কখনও নদী, গ্রামগঞ্জ পার হয়ে চলে গেছি। দু'দিন লেগে গেল। দু'পাশে পাহাড়, পাথর কেটে রাস্তা উঠে গেছে। তারপর আবার নেমে গেলে নদী। নদীর হাড়মাস নেই, কঙ্কাল। পাথর থেকে জল চুঁইয়ে নামছে। সামনে সেই উপত্যকা। বিন্নির ঘাস মাইলের পর মাইল। লোকালয় নেই। নির্জন। তারপরই তেনার রাজত্ব। ছোটখাটো রাজার বাড়ি।'

ইন্দুর কথা শুনতে শুনতে কেমন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল বাচ্চু। হঠাৎ নদী, কী মনে হতেই বলল, 'ফিরলি কী করে?'

'পালকিতে। হু-হুম্-না।'

'ফিরলি কী করে?'

'নৌকায়। নদীতে জল। হেঁইয়া মারো মারো টান ভাইয়া। ছোট নদী থেকে বড় নদী— তারপর ঘোড়ার পিঠে। দুলকি চালে ফিরে এলাম। মন খারাপ। সোজা ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম চিতপাত হয়ে। কান্নায় ভেসে গেলাম।'

বাচ্চুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এ তো বড়ই দুর্গম অঞ্চল। ইন্দুর সঙ্গে সে যদি তখন যেতে পারত। এমন দুঃসাহসিক অভিযানের কথা সে একমাত্র বই-এ পড়েছে।

'তারপ'র কী হল জানিস বাচ্চু?'

'কী করে জানব।'

'রাত পার না হতেই হল্লা, যে যেদিকে পারছে ছুটছে। বাড়ির ভিতরে ত্রাসে পড়ে গেছে সবাই। বল্লম, লাঠিসোঁটা, বন্দুক নিয়ে ছুটছে সবাই। আমিও ছুটলাম। দু' লাফে সিঁড়ি ভেঙে সদর দেউড়ি পার হয়ে দেখছি নদী পার হয়ে লক্ষ্মী ছুটে আসছে। আর কী চিৎকার। সামনে যেতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। পায়ের নীচে ফেলে চেপটে দিচ্ছে সব-কিছু। বাঁশের জঙ্গল উপড়ে শুঁড় দিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে। এক মহাপ্রলয় আর কী। কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। বড়দার হাত থেকে বন্দুক বাবা হাতে নিতেই ছুটে গিয়েছিলাম। হয় আমি আছি, নয় লক্ষ্মী আছে।'

বাচ্চু কিছু বলছে না। সে কেমন বোবা হয়ে গেছে সব শুনে।

'তুই বিশ্বাস করছিস না! দ্যাখ তবে!' বলেই হাতির পায়ের শেকল খুলে দিল। হাতির গলায় ঘণ্টা খুলে ফেলল। তারপর হাতির পিঠে শুঁড় বেয়ে উঠে

গেল। বাচ্চু বোধহয় পালাত। ইন্দুর মাথা ঠিক থাকতে না পারে। কিন্তু পালাবে কোথায়! তার আগেই শুঁড়ে তুলে বাচ্চুকে ইন্দুর পাশে বসিয়ে দিল। এখন আর জ্যোৎস্না নেই। গভীর অন্ধকারে জলের ঢেউ— তার ছলাত ছলাত শব্দ। দূরে কনসার্ট বাজছে কর্ণার্জুন পালায়।'

বাচ্চুর সংবিৎ ফিরে এলে বলল, 'আরে করছিস কী ইন্দু! কোথায় যাচ্ছিস! হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে আছিস কী করে! পড়ে যাবি। তুই সত্যি পরি না দেবী, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি পরি না, দেবীও না। আমি ইন্দু। আমার ভাল লাগে লক্ষ্মীকে কোথাও নিয়ে চলে যেতে। আমার ইচ্ছে হয় কোথাও চলে যাই। লক্ষ্মী আর আমি। আর সেই সুসঙের পাহাড়। কী যে ভাল লাগে।'

ইন্দু অজস্র কথা বলে চলেছে। আর বাচ্চু হাতির পিঠে শক্ত হয়ে বসে আছে। পড়ে গেলেই হাতির পায়ের তলায়।

'মনে হয় না, এই নিরন্তর আকাশের নীচে এক অবিরাম যাত্রা আছে মানুষের!' ইন্দু বলল।

ইন্দুর কোনও কথাই মন দিয়ে শুনতে পারছে না। কেবল বলছে, 'ইন্দু, ফিরে চল। তোর মাথা সত্যি ঠিক নেই। তুইও আর-এক ঘোরে পড়ে গেছিস!'

ইন্দু কী সংকেত করল কে জানে! হাতিটা স্থির দাঁড়িয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে তারা যেন ঢুকে গেছে। কার্তিক মাসের শুরু, হিম পড়তেই পারে। কুয়াশায় সব স্পষ্ট দেখাও যায় না। নদী থেকে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। ইন্দু বসে পড়ল বাচ্চুর পাশে। উপরে কুয়াশার ভিতর থেকে দুটো-একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র উঁকিঝুঁকি মারছে। নীচে কাশের জঙ্গল দিগন্তপ্রসারিত। এখানে নদী অনেকটা চওড়া, বোঝাই যায়।

ইন্দু বলল, 'জানিস, হাতির পিঠে চড়লেই নিশিকাকার কথা মনে হয়, কত অদ্ভুত কথা বলত। হাতির পিঠে উঠলেই মনে হয়, আমার সত্যি দুটো পাখা গজিয়ে গেছে। আমি দুরন্ত বেগে নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছুটছি। নিশিকাকার কথা শুনলে তোরও এমন মনে হত। ঠাকুর-দেবতা, গুরুঠাকুর-কাপালিক, সব কত তুচ্ছ মনে হত। কাকা বলত, ভারতমাতা ছাড়া আপাতত আর কোনও

আমার দেবী নেই। মানুষের মুক্তিই আসলে জীবনের শেষ কথা। এই মুক্তি মানুষ নাকি নিজেই নিতে জানে না। সে চারপাশে অজস্র বেড়াজালে আটকে পড়ে যায়। মানুষেরই নাকি শুধু ঠাকুর-দেবতা, গুরুঠাকুর, ধর্মবাবা থাকে। গাছপালা পাখি প্রজাপতি, প্রাণী-জগতের আর কারও মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই। তারাও জন্মায়, বাঁচে, বড় হয়, প্রকৃতির নিয়মে শেষ হয়ে যায়। অথচ দ্যাখ ইন্দু, কোথাকার একটা লোক এসে তোর বাবার জমিদারি ছারখারে দিচ্ছে।'

'ইন্দু, এবার চল। আর দেরি করিস না!'

ইন্দু কেমন মূহ্যমান হয়ে যায় নিশিকাকার কথা বলতে বলতে।

'জানিস, নিশিকাকা আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে বলত, ওই দ্যাখ, ওটা কী নক্ষত্র জানিস? অরুন্ধতী। কত শত আলোকবর্ষ দূরে অরুন্ধতীর স্বামী মহামুনি বশিষ্ঠ বসে আছেন। নক্ষত্র যা দেখি, আমাদের মুনি-ঋষিরা তাদের কত সুন্দর সুন্দর নাম রেখে গেছেন।

'ভেবে দ্যাখ, পৃথিবীতে কত কলরব, কত গান, কত কর্মব্যস্ততা, তবু মানুষের মতো নিঃসঙ্গ কোনও প্রাণী নেই। এক অব্যক্ত অনন্ত তৃষ্ণা— কী যে পেতে চায়, সে নিজেও জানে না।

'তিনি বলতেন ব্রহ্মাণ্ডের এই অন্তহীন পথের নাকি শেষ নেই। মানুষ জানেই না—তার ভেতর এমন কোনও দূরবিনও নেই সেই মহা-রহস্যময় মায়া জানতে পারে। তাঁর নামে পৃথিবীতে কতরকম ভাবে, কত মানুষ ধোঁকা দিয়ে যে মহাপুরুষ সেজে বসে আছে তার শেষ নেই।

'জানিস, নিশিকাকা বলত, মহাসমুদ্রে জীবন-অণু সৃষ্টি হওয়ার পরই আত্মবিকাশের কোটি কোটি পথ খুলে গেল। এ-পৃথিবীতে তারই নানা পরিচয়। কেউ ইন্দু, কেউ লক্ষ্মী, কেউ গাছ, কেউ সর্বজ্ঞ। সেই কবে সামুদ্রিক জীবন শুরু করে আজ তুই ইন্দু। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়।

'বলত, জানিস ওই যে অরুন্ধতী দেখছিস, তা পৃথিবীর কয়েক লক্ষ গুণ বড়। ভেবে দ্যাখ, সূর্য একটি নক্ষত্র। ভেবে দ্যাখ, পৃথিবী তার চারপাশে বছরে পাক খাচ্ছে। আরও কত গ্রহ তার, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, এই একটি মাত্র সৌরজগতে আমরা বেঁচে থেকে মানুষকে কত রকমের

ধোঁকা দিচ্ছি। এরকমের লক্ষ-কোটি সৌরজগৎ— যদি তুই ইন্দু কোনও অলৌকিক উপায়ে উড়োজাহাজের মতো যানে চড়ে আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে থাকিস, দেখতে পাবি সেই সীমাহীন অন্ধকার মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র ভ্রমরের ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। মহাকাশের মহাশ্মশানে কত নক্ষত্র মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আকাশের এক প্রোজ্জ্বল নীহারিকার প্রান্তদেশে পাঁচ হাজার সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বসে আছেন ঋষি অগস্ত্য— পলকহীন ধ্যাননেত্র বিস্ময়কর কম্পমান শান্ত সৌন্দর্য।'

বাচ্চু হতবাক হয়ে শুধু শুনে যাচ্ছে। সত্যি সে ইন্দুকে চেনে না। জীবনেও চিনতে পারবে না। এ-যেন মহাকাশের আর-এক ঘোর। সে শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। ইন্দু এবার তাকেই এক মহাঘোরে ফেলে দিচ্ছে। তার নড়বার শক্তি নেই। ইন্দু তাকে এভাবে বশ করে ফেলবে সে চিন্তাও করতে পারেনি।

'নিশিকাকা কত হাসিখুশি মানুষ ছিল জানিস! কোনও দেবদেবী, কারও কাছে মাথা নোয়াত না। অসাধু কাজ করত না। ঈশ্বর বলতে বুঝত, সেই মহাব্রহ্ম, যার স্বাদ নাকি মানুষ সহজে পেতে পারে না। পেলেও আংশিক— যারা পায় তারা নাকি পৃথিবীর লোভ মোহ কাম সব সহজেই অবহেলা করতে পারে। বলত, যদি ইন্দু তুই কারও কাছে মাথা নোয়াস তবে সেই অনন্ত অন্তহীন জিজ্ঞাসার কাছে মাথা নোয়াবি। আর কারও কাছে নয়।'

ইন্দু দীর্ঘশ্বাস নিল একটা। বলল, 'সেই নিশিকাকাকে লোকটা খুন করল। বাবাকে প্রায় উন্মাদ করে দিয়েছে। শূল টংকেশ্বর।' বলেই পাগলের মতো হা হা করে হাসতে থাকল ইন্দু।

'তুই হাসছিস ইন্দু! এই, কী হয়েছে!'

'আমি না, নিশিকাকা হাসছে।'

'হাসবে কী করে? সে তো নেই।'

'আছে।'

'বেঁচে আছে বলছিস?'

'আমার মধ্যে বেঁচে আছে। নিশিকাকা বলত, কিছুর বিনাশ নেই। কিছুই শেষ হয়ে যায় না। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, আবার বীজ। গাছ

মরে গেলে কাঠ। কাঠে আগুন দিলে ছাই। শেষ হয় না। হয় না বলেই কিছু থেকে যায়।'

তারপর ইন্দু হাতির উপর বসে কানের কাছে পা নিয়ে গেল। ঠেলে দিল পা-টা সামান্য। এত অন্ধকারেও বুঝতে কষ্ট হল না বাঙ্কুর, ইন্দু হাতিটাকে পিলখানায় যেতে বলছে। হাতি নদীর চর থেকে উঠে যেতে থাকল।

ইন্দু যেন অন্য এক জগৎ থেকে কথা বলছে, 'নিশিকাকা বলত, ইন্দু, তোকে কেন্দ্র করে কোটি নক্ষত্রের ফুল দিয়ে সাজানো মহাচক্র আবর্তিত হচ্ছে— উদাসীন, নিরপেক্ষ, নির্বিকার। ভয় কী শূল টংকেশ্বরকে। ওটা ছাঁচের পেতলের মূর্তি। পেছনে ফুটো থাকে। জানিস বাঙ্কু। একটা পুতুল এনে দেখাল, এই দ্যাখ ছাঁচ থেকে তৈরি, পুতুলের পিঠে ফুটো। ফুটোতে ব্যাং ঢুকিয়ে রাখলে হাতের নাগালে ব্যাং ছাড়া কী পাবে! দাদা কেন যে সর্বজ্ঞের ধোঁকা টের পেলেন না বুঝি না।'

পিলখানায় উঠে যাওয়ার মুখে ইন্দু বলল, 'নিশিকাকা বাড়িতে ঢুকলে গোটা বাড়িটা জেগে যেত। সবার দুঃখ সহজে হেসে উড়িয়ে দিতে পারত। আমরা ছুটে যেতাম। কী দশাসই মানুষ ছিল নিশিকাকা। তোকে দেখাতে পারলাম না।'

ইন্দু হাতির পিঠ থেকে নেমে এল।

বাঙ্কু এবার ইন্দুর সাহায্য ছাড়াই হাতির পিঠ থেকে নেমে আসতে পারল।

আর নেমেই যা শুনল, তাতে সে কেমন অবশ হয়ে গেল।

ইন্দু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সরসর করে শব্দ হচ্ছিল, বেজি কিংবা কোনও গো-সাপ তাড়া খেয়ে ছুটছে।

ইন্দু বলল 'তা হলে ওই কথা থাকল। লক্ষ্মীর জন্য আশা করি এটুকু করতে পারবি। লক্ষ্মীকে বাবা গুলি করবেনই। লক্ষ্মী কারও কথা শোনে না। সর্বজ্ঞকে মানে না। যতবার দিয়ে আসা হয় পালিয়ে আসে। সর্বজ্ঞের এক চেলাকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মেরেছে। দেবীপক্ষেই বাবা লক্ষ্মীকে শেষ করে দেবেন। পাগলা হাতি কে পোষে!'

বাঙ্কু কোনও কথা বলতে পারছে না।

ইন্দুকে অবজ্ঞা করারও সাহস নেই।

ইন্দু তাকে শুধু লাল বাতাসা বিন্নির খই খাওয়ায়নি— জীবনের আরও দূরবর্তী রহস্যের খবর দিয়েছে।

সে শুধু ইন্দুকে অনুসরণ করল।

ইন্দু তবে সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাবেই। ইন্দু পারে। যেভাবে ইন্দু তার এই দেবীদর্শনের রাজসূয় যজ্ঞে তার সাহায্য চাইছে তাতে বিষয়টা ইন্দুর পক্ষে খুবই সোজা। বনদুর্গাপুরে আছে বিশাল গভীর বন— শাল জারুল শিমুল আকন্দ কাঁটার ঝোপ। নির্জন সব তৃণভূমি, বনজঙ্গলের টিলা পার হয়ে পাহাড়ের দু'পাশে মরুপথ। খাড়া পাহাড় দু' দিকে। শেষ মাথায় মহামায়ার থান। সর্বজ্ঞ থানের সেবাইত।

তিনি মহামায়ার পূজা সেরে গভীর রাতে নেমে আসেন নিজের ডেরায়। ইন্দু এই সুযোগ অবহেলায় ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

এত অন্ধকার যে, সুপারি গাছগুলো এখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। ঝোপে-জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে। কোথাও মানুষের কোনও সাড়া নেই। শুধু দূর থেকে বিবেকের গান, কিংবা ক্ল্যারিওনেটের সুর ছাড়া কিছুই কানে আসছে না। ইন্দুর এই পথ এত চেনা, সে সহজেই হেঁটে যেতে পারছে, গাছে মাথায় ঠোকাঠুকি না হয় সেজন্য বাচ্চুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, 'দেখিস, এখানটায় গর্ত আছে, পড়ে যাস না। বাঁ দিকে পা ফেল।' গভীর নিশীথে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে হাঁটতে বাচ্চুর এতটুকু ভয় করছিল না। ইন্দু সত্যি বিপদনাশিনী। তার মা বিপদনাশিনীর ব্রত করেন— ইন্দু যেন আর-জন্মে সেই দেবী ছিল। শাপভ্রষ্ট হয়ে ইন্দু বাবুমশাইয়ের ছোট কন্যে। এখন বন্দিনী রাজকন্যা।

বাচ্চুর মনে সহসা ধন্দ দেখা দিল, বাবুমশাই তো চেয়েছিলেন, বাচ্চু আসুক। ইন্দুর ঘোর বিপদে বাচ্চুর আসার দরকার। আশ্চর্য, এবারে বাবুমশাই তাকে ডেকে কোনও কথাই বলেননি। এমনকী, সে কোন ক্লাসে পড়ে তাও জানতে চাননি। সে দুষ্টুমি করে কি না, সাঁতার কেটে পুকুর পার হতে পারে কি না, তাও জানতে চাননি। অথচ তিনিই তো চেয়েছিলেন সে এলে ভাল হয়। কিন্তু...

এই কিস্তুটার জন্যই বাচ্চু না বলে পারল না, 'আচ্ছা, বাবাকে দিয়ে কে চিঠি লিখিয়েছিল? বাবুমশাই, না তুই?'

ইন্দু বলল, 'কেন, আমি।'

'বাবুমশাইয়ের নাম করে লেখালি কেন?'

'তুমি যা একখানা বিচ্ছু, বাবাকে ছাড়া আর কাউকে তো পাত্তা দিতে না।'

বাচ্চু হলুদ জমিতে ঢুকে বলল, 'ইন্দু, আর-একবার ভেবে দ্যাখ, ঠিক কাজ হবে কি না! ধরা পড়লে বাবা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবে।'

'লক্ষ্মীকে শেষ করে দেওয়া হবে, আমার বাবা বাবাঠাকুর বাবাঠাকুর করে উন্মাদ হয়ে যাবে— তুই কিনা তোর ছাল-চামড়ার কথা ভাবছিস! এত স্বার্থপর তুই! যেতে হবে না। আমি একাই পারি। তুই সঙ্গে থাকলে দূরের জঙ্গলে ভয় থাকবে না। ফিরে আসতে না পারলেও না। পথ হারিয়ে ফেললেও না।'

বাচ্চু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল— সেই বিন্নির খই লাল বাতাসার কথা মনে পড়ছে। জীবনে যে এর আলাদা এক ঘ্রাণ আছে! সে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বলে দে।'

ইন্দু দু'লাফে পাঁচিলে উঠে গেল দড়ি বেয়ে। তারপর জামগাছটায় উঠে যাবার মুখে বলল, 'কাছারিঘরের বারান্দায় বসে থাকিস। সকালে! মনে থাকবে, সকালে। আমাদের হাতে সময় কম, বুঝলি! ভেবে দ্যাখ, এবারে লক্ষ্মীকে বাঁচাতে গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়ালেও রেহাই পাব না। দু'জনেই মুখ থুবড়ে পড়ব। সবটাই দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবে। ভেবে দ্যাখ, তোর সামনে মরে পড়ে আছে, ইন্দু আর লক্ষ্মী। ভেবে দ্যাখ, রক্তে ভেসে গেছি। আমার মরা মুখ দেখতে তোর ভাল লাগবে? কিংবা বাবা হয়তো রাতে সবার অজ্ঞাতে সুকুমারদাকে নিয়ে যাবে। নিজে লক্ষ্মীকে খুন করবে। কেউ জানতেই পারবে না। সকালে উঠে শুনব, লক্ষ্মী নেই।' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল ইন্দু।

বাচ্চুর চোখ ছলছল করছিল। ইন্দু বেপরোয়া, দোষ নেই। ইন্দুর মরা মুখ দেখতে হবে ভেবেই সে মাথা ঠিক রাখতে পারল না। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'সকালে বসে থাকব। রাতে আর ঘুমাব না।' যেন এক আলাদা

শস্যক্ষেত্রে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে, নদী কোথায় যায়— এই শব্দমালা যেন বারবার তাকে কোনও গভীর অরণ্যের মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে। সেখানে সে আর ইন্দু আর লক্ষ্মী। পৃথিবীর নতুন দ্বীপ, নতুন নক্ষত্রের জন্ম এবং জন্মাবধি এভাবেই কীটপতঙ্গ থেকে মানুষের আবাস তৈরি হয়ে যায়— ইন্দু বলেছে, আমরা সেখানেই চলে যাব, যেখানে মানুষের তৈরি ঈশ্বর আমাদের তাড়া করবে না।

ইন্দু কার্নিশের উপর দিয়ে অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছে। একবার পেছনে ফিরে তাকে বোধহয় দেখল। কারণ কার্নিশের মাথায় যতই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে যাক, এবং যতই উপরে থাকুক, ইন্দুর সংকেতে সে টের পেয়েছে, 'বাচ্চু, চলে যা। আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। আমি ঠিক ছাদে নেমে যেতে পারব। কার্তিকের হিম বড় খারাপ। দাঁড়িয়ে থেকে আর ঠান্ডা লাগাস না।'

বাচ্চু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পায়ে ঘাস-পাতা লেগে আছে। জুতোর নীচে। সে আলগা করে এক পাশে জুতো রেখে দিল। শেজবাতি উসকে ঘাসপাতা পা থেকে তুলে বাইরে ফেলে দিল। তারপর বালিশ টেনে শুয়ে পড়তেই ভিতরে তার মোষ-বলির বাজনা শুরু হয়ে গেল। একটা নির্বোধ জীবকে অকারণ টেনে টেনে নিয়ে হাড়িকাঠে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ঢাকিরা ঘুরে ঘুরে বাদ্য বাজাচ্ছে। ইস, এটা কী দেখল, ওটা মোষ নয়, ধর্মের নামে ইন্দুকে উচ্ছুগ্গ করা হচ্ছে। বাবুমশাইয়ের হাতে বিশাল খাঁড়া। কপালে রক্তচন্দনের তিলক। খাঁড়ার মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা— মা-জগদম্বা, মা-তারা, মা-মাগো, খাঁড়ার কোপে ঘ্যাচাং করে দু'খানা হয়ে গেল। দৃশ্যটা এত তাড়া করতে থাকল যে, বাচ্চু ছটফট করতে থাকল। সে শুতে পারছে না। সে পায়চারি করছে। তার এখন আর সেভাবে ভয়ডরও নেই। আগে হলে ঘর থেকে দৌড় লাগাত, কিন্তু যাবেটা কোথায়, পৃথিবীর অন্য এক নতুন কনসার্ট তার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। সে আর ভীরু বালকের মতো উদোম হয়ে ছোটার জন্য পাগল হবে না। ইন্দু তাকে কীভাবে যে মুহূর্তে সাবালক করে দিয়ে গেল সে টের পায়নি।

আজ প্রথম লক্ষ্মীর জন্য মায়া বোধ করল। সরল অকপট সোজা-সাপটা হাতিটারও নিস্তার নেই।

লোকটা অবতার, না কাপালিক। কাপালিকরা কি এখনও আছে। বাপ্তুর ভিতর থেকে কে যেন বলল, আছে। তারা থাকে। তারা মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দম্ভ, আত্মম্ভরিতায় তারাই আসলে পাগলা হাতি। সরল মানুষের দুর্বলতার সুযোগে কীটের মতো বাসা বেঁধে ফেলে। এক-এককালে এক-এক ছলে তারা আসে। কপালকুণ্ডলার কাপালিক, ইন্দুর সর্বজ্ঞ, যখন যেরকম।

তবে ইন্দু তাকে সব খুলে বলেনি।

যেটুকু বলেছে, তাতেই সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেটা সে কাটিয়ে উঠেছে। সে আর কোনও কারণেই সরে আসতে পারবে না। ভিতরে তার উত্তেজনা বাড়ছে। যেন এক গভীর সমুদ্রে অজানা ভূখণ্ড আবিষ্কারের প্রত্যাশায় সে অধীর। সেই অরণ্যের মধ্যে কোনও মহামায়ার থান, তার নীচে সে আর ইন্দু হাতির পিঠে— দু'দিনের যাত্রা, দশ ক্রোশ রাস্তা রাতে পার করে দেওয়া যাবে— তারপরই ভাওয়ালের গড়। রাস্তায় কখনও সুমার মাঠ, কখনও নির্জন বসতি অঞ্চল, কখনও নদী-নালা, হাঁটুজল পার হয়ে যাওয়া— কানে কানে এটুকুই শুধু বলেছিল। ফিরে আসবে কী করে? দু'দিন কিংবা তারও পরে অভিযান সফল করে ফিরে আসা হবে কি না— না অন্য কোনও মতলব আছে ইন্দুর, সে জানে না। কাল সকালে সে জানতে পারবে হয়তো। কাল আবার একটা উড়োজাহাজ ভেসে আসবে তার কাছে।

২৫

সকালে আবার সেই লম্বা বেঞ্চি— বাপ্তু বেঞ্চিতে বসে আছে তীর্থের কাকের মতো। কখন ছাদ থেকে ইন্দু কাগজের উড়োজাহাজে আবার আজকের সংকেত পাঠাবে। বসে থাকাও বিড়ম্বনা। সবার এক প্রশ্ন, 'কী রে, চুপচাপ বসে আছিস কেন।' 'কী রে, মুখ গোমড়া কেন।' 'কী রে, এখনও হাতমুখ ধুলি না? কখন খাবি!'

অষ্টমীর বাজনা বাজছে।

দাদারা ঘুম থেকেই ওঠেনি— তাই রক্ষা। সকাল-বিকাল ঘুমাবে। রাত

জেগে যাত্রা দেখবে। তারা উঠলেও নানা প্রশ্ন করত। সে যে সবাইকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। কারও কথার জবাব দিতেই ইচ্ছে হচ্ছে না। বলতে গেলে তার এখন শিরে সংক্রান্তি। তার কিছুই ভাল লাগছে না।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশ দূরে কর্মিটোলার ঘাঁটি। ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধবিমান নেমে যায়। দাদারা বিকেলে নদীর চরে নেমে গেছিল যুদ্ধবিমানের মহড়া দেখতে। সে যায়নি। সকালেও একঝাঁক উড়ে গেল— তার উৎসাহ কম। তার কাছে এখন একটা কাগজের উড়োজাহাজই আসল যুদ্ধের খবর নিয়ে আসবে। সেই অপেক্ষায় সে বসে আছে। আজ কী সংকেত পাঠাবে কে জানে।

তার রাগ হয়, ইন্দু সব খুলে বলছে না বলে। আসল মতলবটা কী? হাতি। ইন্দু নিজে না সর্বজ্ঞ। ফিরবে কী করে। ফিরে এলে হাতিটাও ফিরে আসবে। তা হলে শেষে কী দাঁড়াল। না, আবার মাথা ঘুরছে। সে বুঝতে পারছে না ইন্দু কীভাবে লক্ষ্মীর প্রাণ বাঁচাবে। একবার ভাবল, আচ্ছা, লক্ষ্মীকে শেকল খুলে ছেড়ে দিলেই হয়। রাতের বেলা, তারা দু'জনে মিলে হাতিটাকে নদীর ও-পাড়ে দিয়ে আসবে। বলবে, বাছা, তুমি জঙ্গলে চলে যাও। ইন্দু যদি বুঝিয়ে বলে লক্ষ্মী ঠিকই বুঝতে পারবে। ইন্দুর এত কথা বোঝে, এটা বুঝবে না হয় না। মাথায় বুদ্ধিটা আসতেই ভাবল, রাতে ইন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়— কী বলিস ইন্দু, এই ভাল না। লক্ষ্মী জঙ্গলে চলে গেলে কেউ নাগাল পাবে না। কিন্তু ইন্দু যে বলল, সর্বজ্ঞকে দেবীদর্শন করাবে। সে তো বাজে কথার মেয়ে নয়। সেই দেবীদর্শনই বা কীভাবে হবে। দেবীদর্শন করিয়ে লাভই বা কী হবে। ইন্দুর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা ভাবলেই সকালবেলায় মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

দাদাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়। সে ভাবতে ভাবতে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দাদারা তাকে উপায় বাতলে দিতে পারে— জানিস বড়দা, লক্ষ্মীকে নাকি মেরে ফেলা হবে। লক্ষ্মীকে মেরে ফেললে ইন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারবে না।

কিন্তু সে জানে, যতই উতলা হোক, কাউকে কিছু বলতে পারবে না। বললে পাঁচ কান হয়ে যাবে। ইন্দুর এতে বিপদ আরও বাড়তে পারে। সে এখন সব-কিছু ছাড়তে রাজি, কিন্তু ইন্দুর মরা মুখ দেখতে রাজি না।

বেলা বাড়ছে, কিন্তু উড়োজাহাজের পাত্তা নেই। তার রাগ হচ্ছিল। এই বলল, সকালে খবর পাবি, কী করতে হবে-না-হবে জানতে পারবি, খবর পাওয়ার এই নমুনা! ইন্দুর সব টের পেয়ে যায়নি তো! এই যে রাত করে সে তাকে নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কেউ দেখে ফেলেনি তো! তা হলে গেছে। সেও গেছে, ইন্দুও গেছে। ভয়ে ভয়ে কেমন গলা শুকিয়ে উঠছে।

বাবা খুব সকালে নদীতে স্নান করতে গেছেন, দেখে গেছেন সে বসে আছে বেঞ্চিতে। বাবার সকালে উঠেই জপতপ থাকে। কথা বলেন না। নদী থেকে স্নান সেরে এসে তিনি মুক্ত হন। নানা বিঘ্ন মানুষকে কতভাবে যে দুশ্চিন্তায় রাখে বাবার মুখ দেখলে সে টের পায়।

বাবা ফিরে এসেও দেখলেন, বাচ্চু বেঞ্চিতে বসে আছে। বাবা অবাক হতেই পারেন। যাত্রা দেখে এত সকালে কেউ ওঠে না। বেলা অবধি ঘুমায়। এত সকালে উঠে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা হওয়ারই কথা।

বাবা ফরাশে বসার আগে তাকে ডেকে পাঠালেন। সে মহানামদাকে বলল, 'যাচ্ছি।'

কিন্তু যাচ্ছি বললেই তো যাওয়া যায় না। যদি সেই দণ্ডে উড়োজাহাজটা উড়তে শুরু করে!

কিন্তু বাবা এত বারবার ডেকে পাঠালে সে বসেই বা থাকে কী করে! বাবার কাছে গেলে বললেন, 'কাল গেছিলি যাত্রা দেখতে?'

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'কোথায় বসেছিলি, দেখলাম না তো!'

সে বুঝি ধরা পড়ে গেল! ঢোক গিলে বলল, 'কেন, রক্ষিতজ্যাঠার পাশে।' ডাহা মিথ্যে কথা বলতে তার মুখে আটকাল না।

বাবা কাঠের বাক্স বার করে রেজগি পয়সা গুনতে-গুনতে বললেন, 'যা গন্ডগোল, ধস্তাধস্তি, কোথায় তুই, খুঁজছিলাম। যাক রক্ষিতদাদার সঙ্গে ছিলি, রক্ষা।'

হাতিটাকে মেরে ফেলা হবে কি হবে না, বাবা হয়তো জানেন। এত বড় আমলা জানবেন না হয় না। খবরটা কতদূর সত্যি জানার আগ্রহে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। বলল, 'বাবা, লক্ষ্মীকে নাকি মেরে ফেলা হবে!'

বাবা একটা লাল রঙের জাবদা খাতা খুলে লিখলেন তখন, 'হরি সহায়'। তারপর খাতাটা কপালে ঠেকিয়ে বাচ্চুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তা ছাড়া কী উপায়! যা গেল! সর্বজ্ঞের আশ্রম থেকে শেকল ছিঁড়ে চলে এল। রাস্তায় ঘরবাড়ি ভেঙেছে। লোকের শস্য নষ্ট করেছে। শুঁড় তুলে ত্রাহি চিৎকার। সে দৃশ্য দেখা যায় না। কখন আবার খেপে যাবে কে জানে! ওসব ভেবে তোমার লাভ নেই। দ্যাখো গে, দাদারা উঠল কি না। বেলা হয়েছে। ডেকে দাও গে। রান্নাবাড়ি থেকে দু'বার খবর পাঠিয়েছে। কাজের বাড়ি, সবাইকে বুঝেসুঝে চলতে হয়!'

সে দৌড়ে দাদাদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছুট। তার যে উড়োজাহাজ উড়ে আসবে কথা আছে।

এসে যেতেও পারে।

যদি আসে, তবে কোথায় পড়বে, যদি কারও হাতে পড়ে যায় এই দুশ্চিন্তায় সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কেন যে ভাবল, ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রাসাদ-সংলগ্ন কিছু ধুতুরা ফুলের গাছ, এবং জায়গাটা সামান্য জংলা। যদি উড়ে এসে সেখানে পড়ে থাকে! এমন সব সংশয়ে সামনের মাঠে নেমে গেল। ঘাসের উপর দু'-একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। সে সেগুলি তুলে আবার ফেলে দিল। উড়োজাহাজ নয়, কিংবা কাগজে কিছু তেমন সংকেত নেই। ধুতুরা ফুলের জঙ্গলটার দিকে হেঁটে গেল। এমনভাবে হাঁটছে যেন সে ফুল তুলতে যাচ্ছে।

ঝোপজঙ্গলে যদি আটকে থাকে।

থাকতেই পারে। ইন্দু তো আর সে বারান্দায় বসে আছে কি না দেখতে পায় না। ছাদের কোনও গুপ্ত স্থান থেকে হয়তো উড়োজাহাজটাকে ভাসিয়ে দেয়। সে তো নিশ্চিন্ত— বাচ্চু বেঞ্চিতে বসে আছে। তার সংকেত না-পাওয়া পর্যন্ত সে সেখান থেকে নড়বে না।

আচ্ছা ইন্দু বল, তোর কাণ্ডজ্ঞান হবে না! এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে না!

সে ডালপালা ফাঁক করে খুঁজছে। জংলার ভিতরে ঢুকে গেছে। হালকা কাগজ, ডালপালায় আটকে থাকতে পারে। সে পাগলের মতো তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

দাদারা রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখল, বাচ্চু জঙ্গলের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে কী খুঁজছে।

'এই বাচ্চু, আমরা খেতে যাচ্ছি। কী করছিস ওখানে? খেতে চল।'

বাচ্চু জঙ্গল থেকেই মুখ বাড়িয়ে বলল, 'তোরা যা। আমি যাচ্ছি।'

বাচ্চু কী যে করে। এখনই খেয়ে না-নিলে, কাজের বাড়িতে কে কার খোঁজ রাখে। তা ছাড়া দাদারা যদি জানতে চায়, বাচ্চু তুই জঙ্গলে ঢুকে বসেছিলি কেন রে! তা হলে কী বলবে।

বলতে পারে ধুতুরার গোটা খুঁজছিলাম। ধুতুরা গোটার যেমন বিষ, তেমনই এক বয়সে তাদের কাছে খেলার সামগ্রী। অবিশ্বাস করবে না দাদারা।

সে বুঝল, বসে থেকে লাভ নেই। খেয়ে নেওয়া দরকার। কোনও বিপদ না হয়, খুব বিচলিত হয়ে পড়াও ঠিক না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। সে রান্নাবাড়ি থেকে খেয়ে এক ছুট। আবার বারান্দায়। তখনই ডাক পড়ল ফের বাচ্চুর। এই রে, তবে কি উড়োজাহাজটা কারও হাতে পড়ে গেছে। বাবার কাছে এনে দিয়েছে। কিন্তু তারা এখন বিন্নির খই, লাল বাতাসা— বাবা বুঝবেন কী করে! হাতের লেখা দেখে যদি টের পান— অকারণে এভাবে ত্রাসের মধ্যে পড়ে যেতে হয় এই প্রথম টের পেল সে।

বাবা বললেন, 'বোসো।'

সে বাবার পাশে বসল। পিছনে বিশাল কাঠের র‍্যাক। রাশি রাশি জাবদা খাতা জমা। বারান্দায় লোকজন বসে আছে। এক-একজন করে ডাকা হয়, কাজ সেরে চলে যায় তারা। ঘরে ঢুকেই বাবাকে মাথা নুয়ে অভিবাদন করার পর আজ্ঞে, জি, অথবা হুজুর বাহাদুরের কী হুকুম হয়েছে জানতে চায়। এসব কারণে তার বাবা যে খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি সে বুঝতে পারে। তার মধ্যে যতই উচাটন থাকুক, এমন একজন দাপুটে মানুষের হুকুমে না বসেই বা কী করে! বাবার বোধহয় একপ্রস্থ কাজ সারা। কিছুটা ফুরসত মিলেছে।

'বাচ্চু, তুমি কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে যাবে না। কেউ যাচ্ছে না। লোক দেখলেই খেপে যায়। আমরা তো সেদিন কাছারিবাড়ির দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম আতঙ্কে।'

বাচ্চু বলল, 'আমি যাই-ই না।'

'না যাবে না। তবে লক্ষ্মী ইন্দুকে পছন্দ করে। ইন্দুকে পছন্দ করে বলেই তোমাকেও করবে ভেবো না। না-ও করতে পারে।'

বাচ্চু আর না বলে পারল না, 'কবে হাতিটাকে মেরে ফেলা হবে বাবা?'

'তা তো জানি না।'

'দেবীপক্ষেই মেরে ফেলবে শুনছি।'

'কে বলল তোমাকে দেবীপক্ষে মেরে ফেলা হবে? আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানি না।'

বাবা জানেন না, সে বিশ্বাস করতে পারে না। কিংবা বাবা যদি খুবই গোপনে কাজটা হাসিল করা হবে এমন জেনে তাকে এড়িয়ে যান? যেতেই পারেন। বাবুমশাই ডাকলেই তো আজ্ঞে যাই হুজুর। বারান্দার সামনে লন, লন পার হয়ে বাবুমশাইয়ের আটচালা বৈঠকখানা। বারান্দায় ইজিচেয়ার, বেতের চেয়ার নীল রঙের— ঘরের ভিতর টানা পাংখা ঝোলানো। বিশাল ফরাশ, তাকিয়া, পাট-ভাঙা সব। ইন্দু তাকে নিয়ে একবার সেবারে ঘরটায় ঢুকেছিল, কী মনোরম ঘ্রাণ ঘরে! আর বড় বড় জানালা। শণের মোটা চাল। ঘর নাকি এতে গরমে ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডায় গরম থাকে। বিলাস সামগ্রী বলতে নীল রঙের দুটো লণ্ঠন এবং একটা ডে-লাইট জ্বালানো হত রাতে। এবারে এসে, সে একদিনও বাবুমশাইকে বৈঠকখানায় বসতে দেখেনি। বাঘের মতো তেজ দেখেছে মানুষটার। এখন কেমন ক্ষীণস্বরে কথা বলেন। এবারে সে বৈঠকখানায় কাউকে রাত্রে আলো জ্বালাতেও দেখেনি। দরজা-জানালা বন্ধ। কেবল সকালবেলায় ফরাশদার দরজা খুলে ঝেড়েপুঁছে আবার ঘর বন্ধ করে দেয়।

বাচ্চুর মনে হল, বাবা সব জানেন। সে নিজেও জানে— কারণ ইন্দু তার এত বড় অসময়ে কখনও মিছে কথা বলতে পারে না। তবে বাবা বললে একশো ভাগ সত্যি মনে হত তার। বাবা তো আর দীক্ষা নেননি। দীক্ষা নিলে মানুষ জাঁতাকলে পড়ে যায় এমন মনে হল তার।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা ফের বললেন, 'কে বলল দেবীপক্ষেই লক্ষ্মীকে মেরে ফেলা হবে?'

সে আমতা আমতা করতে থাকল।

বাবার মুখেও কেমন দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে। তবে কি গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল! বাবার এমন সংশয়ের মুখ বাচ্চু কখনও দেখেনি। সে বাবাকে সমীহ করে— কিন্তু ভয় পায় না। সে আজ তার বাবাকে দেখেও ভয় পেয়ে গেল। জমিদারবাড়ির খুনখারাবি নাকি কাকপক্ষীও টের পায় না। কার কাছে যেন সে শুনেছে। সে আর বসে থাকতে পারল না। বাবার মুখ দেখে আর-এক আতঙ্কে পড়ে গেছে। যদি তাকে বাবার পরে বাবুমশাই জেরা করতে শুরু করেন। সে প্রায় দৌড়ে পালাবার মতো বারান্দায় আসতেই দেখল— ভেসে আসছে। বুক ধড়াস করে উঠল। কী লেখা থাকবে কে জানে!

সে উড়োজাহাজটা পকেটে নিয়ে আবার হলুদ জমিতে হাজির।

টুপ করে বাচ্চু হলুদ গাছের ভিতর ডুবে গেল। তবে সেবারের মতো সবটা ঢেকে যায় না। মাথার কিছুটা গাছের উপর ভেসে থাকে। সে আরও নিচু হয়ে চিঠিটা পড়ল। বিন্নির খই লিখেছে, লাল বাতাসা, আজ হাতিটাকে পবনদা নদীতে চান করাতে নিয়ে যাবে। জানি না কপালে কী আছে। লক্ষ্মী পাগলামি করতেই পারে। তুই কাছে থাকলে সাহস পাবে। পাগলামি নাও করতে পারে। অন্দরমহলের বাইরে দিনের বেলায় বের হতে পারি না রে! আমার ভয় করছে। তুই কিন্তু সারা দিন হাতিটাকে পাহারা দিবি। পারিস তো লক্ষ্মীর পায়ে ফিনাইল ঢেলে দিস। শেকলে বাঁধা থেকে ঘা হয়ে গেছে। কতটা পথ যাব, লক্ষ্মী বসে গেলে সব যাবে।

পায়ে ঘা! কই কাল তো ইন্দু তাকে কিছু বলেনি। আসলে ইন্দু জানে না, কী হতে যাচ্ছে। ইন্দুর মাথাটাও ঠিক থাকতে না পারে।

পরে ইন্দু লিখেছে, বিবেক সাহার দোকানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেবে। খুড়ামশাইয়ের নামও বলতে পারিস। তুই খুড়ামশাইয়ের ছেলে বলবি। ফিনাইল পায়ে দিলে জানিস তো মাছি বসতে পারে না। ঘায়ে মাছিরা ডিম পাড়ে। পোকা হয়। ঘা শুকিয়ে আসছে। কাল এত উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম— ফিনাইল ঢেলে দিতে ভুলে গেছি। বোতলটা নিতেও ভুলে গেছিলাম। সব তোকে খুলে বলতেও পারিনি।

সে আর-এক দণ্ড দেরি করল না। যেন গিয়ে সে দেখতে পাবে লক্ষ্মীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর জন্য তারও যে কেমন এক টান ধরে

গেছে। সে আর লক্ষ্মীকে ভয় পায় না। কাছে যেতেই লক্ষ্মী শুঁড় তুলে তাকে সেলাম দিল। যেন কোনও অন্তর্গত অভিলাষ শুঁড় তুলে তাকে জানাচ্ছে কিংবা ইন্দুর বন্ধু ভেবে খেলা শুরু করে দিতে পারে। সে কাছে যেতেই এগিয়ে এল। শুঁড়ে হাত দিতেই শরীরে তার আশ্চর্য শিহরন খেলে গেল। নিরীহ অবোধ হাতিটারও রক্ষা নেই সর্বজ্ঞের কোপ থেকে। ভেতরে সেও ইন্দুর মতো জেদি হয়ে যাচ্ছে। পিছনের পা দেখল কাছে বসে। ঘা শুকায়নি ভালমতো। মাছি ভনভন করছে। সে দৌড়ে গিয়ে বিবেক সাহাকে বলতেই এক বোতল ফিনাইল পেয়ে গেল। কিছুটা ঢেলে দিতেই মাছিগুলি উড়ে গেল। দুটো-চারটে পোকা বের হয়ে এল ঘা থেকে। ওর এতটুকু ঘৃণা নেই। হাতি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আরাম পেলে এটা হয়।

বাচ্চু সারা সকাল একবার কাছারিবাড়ি একবার পিলখানা— কখন চান করাতে নিয়ে যাবে সে জানে না। চান করাতে নিয়ে গেলে কী হয় জানে না। ইন্দু বিপদের সংকেত না পেলে এভাবে তার কাছে উড়োজাহাজ পাঠাত না। জরুরি বলেই উড়োজাহাজে খবর পাঠিয়েছে। সারাদিন পাহারা দিবি। কী হচ্ছে-না-হচ্ছে উড়োজাহাজে খবর পাঠাবি। দক্ষিণের জানালা খোলা থাকবে।

অবাক, পবন মাহুত হাতিটার কাছেই গেল না। একবার মাত্র হাতিটাকে খেতে দেওয়ার জন্য গেছে। কলাগাছ আর মান্দারগাছের ডাল ঠেলে দিয়ে এসেছে। ঠাকুরদালানে অঞ্জলি দেবার সময় গেলে সে দেখতে পেল অন্দরমহলের সবার সঙ্গে ইন্দু এসেছে অঞ্জলি দিতে। জেঠিমাকে দেখে সে টুক করে একটা প্রণামও সেরে ফেলল।

বাবা ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে নামাবলি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জেঠিমা বোধহয় তাকে চিনতে পারেনি। না পারারই কথা। সেবারে আর এবারে কত যে তফাত।

বাবাই বললেন, 'বউঠান, বাচ্চু, চিনতে পারছেন না?'

'অ মা, তুই কত বড় হয়ে গেছিস!'

এ-সময় ইন্দু ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল। সবার সামনে বাচ্চুর সঙ্গে কথা বললে দোষের না। সে বলল, 'তুই বাচ্চু!' কত যেন অবাক হয়ে গেছে ইন্দু। চোখে-মুখে কপট বিস্ময়।

বাচ্চু ফিসফিস করে বলল, 'জানিস, হাতিটাকে চান করাতে নিয়ে যায়নি।'

'চুপ।'

ঠাকুরদালানের এক কোনায় পড়ে আছে ঝুনো সব নারকেল। ইন্দু দুটো নারকেল হাতে দিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীকে দিবি। আজ অষ্টমী পূজা, ভাল-মন্দ সবার খেতে ইচ্ছে হয়। কী, পারবি তো, ভয়ে আবার পালাবি না তো?' এরপর ইন্দু মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, আমি যাব বাচ্চুর সঙ্গে! লক্ষ্মীকে নারকেল খাইয়ে চলে আসব।'

'যাও। অন্নদা সঙ্গে যাক।'

বাবুমশাই বললেন, 'পদ্মাবতী, তোমারও দেখছি মাথা খারাপ। কোথায় যাবে! কে যাবে! বাচ্চু, তুই নারকেলদুটো নিয়ে যা। লক্ষ্মীকে খেতে দিস। তিনি অন্তর্যামী, ক্ষুব্ধ হতে পারেন।'

ইন্দু গুম হয়ে গেল। পূজার দিনেও তাকে এভাবে নজরবন্দি করে রাখছে! সে নারকেলজোড়া বাচ্চুর হাতে তুলে দেওয়ার সময় কানে কানে বলল, 'সাঁজবেলায় উড়োজাহাজ যাবে। লক্ষ রাখিস।'

২৬

অষ্টমী নবমী দশমী পর পর উড়োজাহাজ ভেসে আসতে থাকল। উড়োজাহাজে এক-একদিন এক-একরকমের ফর্দ থাকত। উড়োজাহাজে এখন ইন্দু শুধু ফর্দ পাঠায়। কী কিনতে হবে, কোথায় কী রাখতে হবে, সংকেতে জানিয়ে দেয়। সে ফর্দমতো সব সংগ্রহ করে গোবরার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখছে।

এক ডজন মোমবাতি। একটা দেশলাই। খবর আসত, পোড়োবাড়িটা তো জানিস, ওখানে লুকিয়ে রাখবি। ফর্দমতো জিনিস কিনবি। আমার নামে খুড়ামশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিবি।

একটা কাঠের বাক্স আছে গোবরার জঙ্গলে। ভিতরে লাল বেনারসি। আবার সংকেত। এক আঁটি কঞ্চি, কঞ্চির ডগায় কাঁঠালের আঠা। গোবরার

জঙ্গলে ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখবি। পাঁচিল পার করে দেব আমি।

একটা ড্রাম। ড্রামে মুড়ি, লাড্ডু, বিন্নির খই, লাল বাতাসা।

শুধু নিশীথে ইন্দু পাঁচিল টপকে নেমে আসত। কখনও শাড়ি পরে, কখনও ফ্রক গায়ে। শাড়ি পরলে একেবারে দেবী-চৌধুরানি। চুল খোলা। হাত খালি। সস্তা তাঁতের শাড়ি পরনে। ফুল-হাতা ব্লাউজ গায়ে। পাঁচিল থেকে ফ্রক পরে নেমে এলে মনে হত ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই। শুধু কোমরে তরবারি ঝুলছে না, ইন্দু তার সঙ্গে নদীর বিশাল চরে— প্রায় তিন-চার ক্রোশ হবে হাতির পিঠে ঘুরে বেড়াত, হাতিটা ছুটছে দুরন্ত গতিতে, আর হাতির পিঠে ইন্দু দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমার মতো। হেলছে না, দুলছে না। দেবীদর্শনের রিহার্সাল কি না কে জানে। গভীর রাতে খোলা আকাশের নীচে এভাবে হাতি নিয়ে ছুটে বেড়ানোর আর কী কারণ থাকতে পারে সে বোঝে না। ইন্দু কত সহজে হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আর তার ভয়ে তখন মাথা বনবন করে। ইন্দু তো কিছু খুলে বলে না।

'আরে, ইন্দু, এগুলো দিয়ে কী হবে?' কাঁঠালের আঠার কঞ্চি তুলে প্রশ্ন করলেই ধমক, 'রাখ তো। কেবল এটা কী হবে, ওটা কী হবে। এই কাসকেটটা রাখ। আমার গয়না।'

'গয়না!' বাচ্চু চিৎকার করে উঠল, 'আরে তুই কি পাগল হয়ে গেলি! গয়না দিয়ে কী হবে?'

'কী হবে, তোমার মাথা হবে! দেবীর গায়ে অলংকার লাগে না!' বাচ্চু অবাক, অন্ধকারেও আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। জড়োয়া সেট। মাথার মুকুট, চুড়, কঙ্কণ, আরও কত কী!

কোনও রাতে, পাঁচিলের ওপাশ থেকে হাঁক আসে—'লাল বাতাসা হাজির!'

'হাজির।'

'এত রাতে কে জাগে?'

'রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে।' বাচ্চু পাঁচিলের ওপাশে বসে কৃত্রিম ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে— ইন্দুর কথা, 'ঠিক বললি না।'

'কী ঠিক বললাম না।'

'বল বিন্নির খই জাগে।'

'বলব না।'

'তোমার ঘাড় বলবে।'

পাঁচিলের পলেস্তারা খসা। ইটের খাঁজে পা রেখে বাচ্চু ওপাশে ঝুলে দেখে ইন্দু বসে বসে কী একটা বড় আঁটি বাঁধছে।

'আমি নেমে আসব?' বাচ্চু পাঁচিলের ওপর থেকে বলল।

ইন্দু উপরের দিকে তাকিয়েই বলে, 'নামতে হবে না। ওদিকে নেমে যা। দড়িটা ধর।'

একটা লম্বা দড়ি তার দিকে ছুড়ে দিলে খপ করে দড়ির মাথাটা ধরে ফেলার চেষ্টা করে। পারে না। আবছা অন্ধকারে ঠিক বোঝাও যায় না। সে ধরতে না পারায় ইন্দু খেপে গেল। বলল, 'ঠিক আছে, নেমে যা ওপাশে।' তারপর সে নিজেই পাঁচিলের মাথায় হাতে দড়ি নিয়ে উঠে গেল। শেষে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ওপাশে নেমে বলল, 'ধর।'

সে ধরে আছে।

ইন্দু লাফিয়ে আবার পাঁচিলে উঠে গেল। শেষে লাফ দিয়ে পাঁচিলের অন্য পাশে নেমে বলল, 'ভাল করে ধরিস। কী, ধরেছিস তো!'

'ধরলাম তো।'

'ঝুঁকে আবার পড়ে যাস না। শক্ত করে ধর।'

'ধুস। এক কথা বারবার। বলছি শক্ত করে ধরেছি।'

'ছেড়ে দিলাম।'

আর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু হেঁচড়ে পাঁচিলের গায়ে ঠেসে গেল। কী ওজন! সে হাঁপাচ্ছে। 'দড়িতে কী ঝোলালি? টেনে রাখতে পারছি না।'

ইন্দু কাঁধ ঠেকিয়ে রেখেছে। তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাঁচিলটা হাতে নাগাল পায় না। ইন্দু কী করবে ঠিক করতে না পেরে বলল, 'শক্ত করে টেনে ধর!' বলেই পাঁচিলে উঠে কুয়োয় বালতি টানার মতো ভারী পাকা বাঁশের লাঠিগুলি তুলে নিল।

এ কী! আট-দশটা পাকা বাঁশের লাঠি। বাচ্চু ঘাবড়ে গেল, হাত দেড়-দুই লম্বা। কোনও প্রশ্ন করা যাচ্ছে না। কিছু বললেই খেঁকিয়ে উঠছে ইন্দু। সে আর

ইন্দু সুপারির বাগানে বসে লাঠির মাথায় কাঁঠালের আঠায় মোড়া কঙ্কিগুলি বাঁধতে থাকে। কী যে হয়েছে ইন্দুর। এত উত্তেজনার মধ্যে বোধহয় ইন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বাচ্চু না বলে পারে না, 'এগুলো কী মশাল বানাচ্ছিস!'

'কিছু বুঝতে পারিস না। তুই কি রে!'

এই এক কথা ইন্দুর— কেমন তাকে সব বিষয়েই উপেক্ষা করার স্বভাব ইন্দুর। সে অবশ্য জানে কাঁঠালের আঠা ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে লাঠির ডগায় বেঁধে নিলে মশালের মতো জ্বলতে থাকে। এক-একটা মশাল সারা রাত জ্বলেও শেষ হয় না। তা দেবী কি হাতে মশাল নিয়ে যাত্রা করবেন? বাচ্চু প্রশ্ন না করে পারে না, 'তোর হাতে বুঝি মশাল রাখবি?'

'দ্যাখ কী রাখি। ধর শঙ্খটা। কাঠের বাক্সে ভরে নে।'

তার ফলে আশ্চর্য নীরবতা। গভীর জ্যোৎস্নায় গোপনে এই বের হয়ে আসার মধ্যেও থাকে ভারী মজা। দু'জনে যতক্ষণ পারে হাতের কাজ সেরে রাখছে। বাচ্চু শুধু ইন্দু যা বলছে করে যাচ্ছে। মাথার উপর জোনাকিরা জ্বলে। শেয়াল ডাকে দূরে। 'ভাল করে টেনে বাঁধ। খুলে যায় না যেন।'

ওরা কথাও বলে খুব নিভৃতে। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসে। বাদুড় উড়ে যায়। টুপটাপ সুপারির ফল ঝরে পড়ে। কখনও ঘাসের ভিতর থেকে উঠে আসে কীটপতঙ্গের আওয়াজ— দূরে কোথাও ধর্মীয় আওয়াজ ওঠে। রাইপুরা পরাপরদি পরপর সব গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও গ্রাম থেকে ধ্বনি ওঠে, বন্দে মাতরম্। কোনও কোনও রাতে মশার কামড়ে হাত-পা ফুলে যায়।

কখনও নদীর ওপারে মিছিল চলে যায়। মিছিলে নানারকম স্লোগান ওঠে। এই যখন চলছিল, তখন ধর্মের আর-এক গুরুঠাকুর বাবুমশাইয়ের মাথায় ভর করেছেন।

ইন্দু কেমন বিচলিত গলায় বলে, 'জানি না কী হবে। আমরা কালই বের হচ্ছি। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নেব। ওটা আমার শরীরে, মুখে ঠিকমতো জ্বালিয়ে রাখতে না পারলে তুইও মরবি, আমিও মরব।'

'কে কে যাব?'

'আমি, তুই, লক্ষ্মী।'

'টর্চ জ্বালিয়ে রাখলে ধরা পড়ে যাব না?'

'ধরা পড়বি মানে?'

'বা রে, লোকজন ছুটে আসবে না! তোর শরীরে টর্চের ফোকাস ফেললে হাতির পিঠে তুই আছিস লোকে বুঝতে পারবে না! বাবুমশাইকে খবর দেবে ইন্দুদিদি হাতি নিয়ে চলে গেছে। লোকজন ঘিরে ফেললে কী করবি?'

ইন্দুকে কেমন চিন্তিত দেখাল। তারপর বলল, 'মনে তো হয় না তাড়া করবে। ঘিরে ফেলবে, তা হলেই হয়েছে। দেখা যাক।' বলে সে ফের কী খুঁজতে থাকল।

ওরা গোবরার জঙ্গলে বসে আছে। এ-জায়গাটায় একটা কবরখানা আছে। এদিকটায় কেউ আসেই না। ভাঙা মিনার, শ্যাওলা-ধরা পাথর, আর বড় বড় সব কড়ুই গাছের জঙ্গল। লতাপাতায় ঢাকা বনটায় দিনের বেলাতেই কেউ ঢোকে না। গা ছমছম করে।

'কী খুঁজছিস? আমাকে বল না!'

'আরে মোমবাতিগুলি কোথায়! দেশলাইয়ের বাক্স কোথায় রাখলি?'

'আমি কী জানি! তুই নিলি না? ব্যাগটা তো তোর হাতেই ছিল।'

'দাঁড়া!' বলে ইন্দু জঙ্গল ফাঁক করে ছুটতে থাকল। কী দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু সে একা বসে থাকে কী করে। ইন্দু কাছে থাকলে তার কোনও ভয় থাকে না। ইন্দু নেই, তার পক্ষে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকা সম্ভব না। সেও ইন্দুর পিছু পিছু দৌড় লাগাল।

পেছনে ইন্দু পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাবড়ে গেল। কেউ যদি অনুসরণ করে গোপনে। সে মরিয়া হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল।

'এই ইন্দু! তুই কোথায়?'

ইন্দুর ধড়ে প্রাণ এল। বলল, 'চলে এলি কেন? ব্যাগটা পাঁচিলের পাশে। আনতে ভুলে গেছি। আমি এলাম বলে!'

বাচ্চু যাচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

'ঠিক আছে, আয়।'

তখনই বাচ্চু বলল, 'জানিস ইন্দু, আমার মাথায় দারুণ একটা ফন্দি খেলছে।'

'ফন্দি! তোর আবার ফন্দি! একা বসে থাকতে ভয় পাস— তোকে নিয়ে শেষে না সত্যি কেলেঙ্কারিতে পড়ে যাই।'

'শোনই না।'

'কিছু শোনার সময় নেই। দৌড়া', বলে দু'জনেই ছুটতে থাকল। বাচ্চুও ছাড়বে না। তার এত বড় ফন্দি মাঠে মারা যাবে, হয় না। সে দৌড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। আবার বলছেও, 'হাতিটা নদীর চরে ছেড়ে দিয়ে এলে হয় না! তুই চলে যেতে বলবি। ও তোর কথা বোঝে। জঙ্গলে চলে গেলে কেউ নাগাল পাবে না।'

'তোর শেষে এই ফন্দি!'

'কেন, খারাপটা কী বল।'

'খারাপটা কিছুই না। খাটাখাটনির তবে এত দরকার কী। তোর মতো গোবরপোরা মাথা আর দুটি দেখিনি।' বলেই দৌড়াতে থাকল।

বাচ্চুর রাগ হয়ে গেল। কিন্তু একা যে দাঁড়িয়ে থাকবে তাও পারছে না। সুপারির বাগানে ঢুকে গেছে। আর কিছুটা গেলেই পাঁচিল। কিন্তু এত কাছেও নয় যে, ইন্দুকে দেখা যাবে। ইন্দু দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলেও সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। আর এসব কারণেই কী যে রাগ হয়, কেন এভাবে ইন্দুর পাল্লায় পড়ে সে গোল্লায় যাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না। সে দৌড়ে গিয়ে এবারে ইন্দুর ফ্রক টেনে ধরল, 'বল ফন্দিটা খারাপ কীসে?'

'খারাপ হবে কেন। তবে কাজে লাগবে না।'

'কাজে লাগবে না!'

'না, না। বলছি তো না। লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে এলে আবার চলে আসবে পিলখানায়। পিলখানা ছেড়ে সে যাবেই না। তা হলে এত কী বোঝালাম তোকে। সে ইন্দুমতীকে জঙ্গলে পাবে কোথায় বল। সে যাবে কেন, বল! অভ্যাস দিনের পর দিন পিলখানায় দাঁড়িয়ে থাকা, রাতে তার ইন্দুদিদি আসে, এটা যে কত বড় আকর্ষণ লক্ষ্মীর, বুঝবি না।'

বাচ্চু আর কী করে। এখন ইন্দুর সঙ্গে থাকা ছাড়া তার আর যেন কোনও উপায়ও নেই।

ব্যাগটা নিয়ে ফেরার সময় বলল, 'আমরা হাতিটাকে নিয়ে তবে জঙ্গলে চলে যাব! সেটা কতদূর? ফিরব কবে?'

ইন্দু গুম হয়ে গেছে, কিছু বলছে না। হাঁটুমুড়ে সে ব্যাগ থেকে মোমবাতি বের করছে। তারপর ড্রামের ভিতর একপাশে ঠেলে ভরে দিল। ড্রামের ভিতর নুয়ে কী দেখল টর্চ জ্বেলে। সে যা-যা নেবে ঠিক করেছে, তার কিছু বাকি থাকল কি না এমন কোনও চিন্তায় মুখ গম্ভীর।

কিন্তু বাচ্চু অধৈর্য হয়ে পড়ছে। সে ফের বলল, 'আমরা কবে ফিরব। আমরা কতদূর যাচ্ছি। দেবীদর্শন করাবি সেটা কীভাবে?'

ইন্দুর কথায় কী ক্ষোভ, 'শোন বাচ্চু, তোর বকবকানি আমার ভাল লাগে না। কতবার এক কথা বলব। সব তো বলেছি। ভুলে যাস কেন। কবে ফিরব, না ফিরব কী করে বলব! আমাকে বিশ্বাস না করলে যেতে হবে না। কবে ফিরব কিছু বলতে পারব না। যেতে হয় যাবি, না হয় আমি একাই যাব। তুই এলেও যেতাম, না এলেও যেতাম।'

তারপরই থেমে মাথা নিচু করে বলল, 'তুই এত নিষ্ঠুর জানতাম না। কেবল নিজের কথা ভাবিস। লক্ষ্মীর জন্য তোর মায়া হয় না! কী রে, একটা অবলা জীবকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে তোর কষ্ট হয় না! বল, চুপ করে থাকলি কেন?'

বাচ্চু বুঝতে পারছে, লক্ষ্মীকে পাঁচ-দশ ক্রোশের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে লাভ নেই। বাবুমশাইয়ের হাতি, কে না চেনে! ধরা পড়ে যাবে। নিজে ফিরে না এলেও ধরা পড়ে যাবে। দূরের কোনও পাহাড়ে তারা সত্যি যাচ্ছে। ইন্দুর আজগুবি ভাবনা না তবে! সে তো অনেক দূর, দু'-তিন দিনের পথ। তখনই সে বুঝল, সঙ্গে লাড্ডু, বিন্নির খই, লাল বাতাসা কেন নেওয়া হয়েছে। পথে পড়তে পারে বনদুর্গাপুর কিংবা সেই সুসঙের পাহাড়। সেখানে সে দেবীরূপে আবির্ভূতাও হতে পারে। তবে সেও যেমন জানে না, ইন্দুও হয়তো ঠিকঠাক জানে না— কীভাবে সব-কিছু হবে। সেয়ানা, শয়তান সর্বজ্ঞ কি সহজে ছেড়ে দেবে! না, তার কেমন মাথা ঘুরছে ভাবতে গিয়ে। মাথা ঘোরা যে প্রায় ব্যামো হয়ে গেল তার। তখনই ইন্দু বলল, 'আমার দিকে তাকা। টর্চ জ্বেলে আমাকে দ্যাখ! আরে, এভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে! উপরে কী দেখছিস!

ডালপালা কারা ঝাপটাচ্ছে। ভূত না রে। হনুর উৎপাত। তুই আমার জন্য এটুকু করতে পারবি না, লক্ষ্মীর জন্য।'

বাচ্চু বলল, 'যত ভাবছি কূল পাচ্ছি না। তোর মাথা খারাপ, না আমার মাথা খারাপ বুঝছি না। স্বপ্ন দেখছি না তো।'

'আমার মাথা খারাপ। আমার। আমার। তুই এ-কথা বলতে পারলি। লক্ষ্মীর জন্য শুধু বলছি, আমার কপালে যা আছে হবে। শুধু লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর কথা ভেবে...।'

বাচ্চু টর্চ জ্বালতেই অবাক।

ইন্দুর দু' চোখে জল। ইন্দু হয়তো ভাবছে শেষ মুহূর্তে সে বিগড়ে যাবে।

তার যেমন কষ্ট সব-কিছু ছেড়ে যেতে, অজানা এই দুঃসাহসিক অভিযানে বের হতে, ইন্দুরও কম ভয় না। সর্বজ্ঞ যদি ইন্দুকে সেই জঙ্গলে সত্যি তুলে নিয়ে যায়। এসব ভাবলেই সে কেমন অন্যরকম ঘোরে পড়ে যায়।

বাচ্চুর মনে হল, ইন্দু তার পরিচিত গাছপালা, নদী, মাঠ, কাশের বন, সুপারির বাগান ফেলে চলে যাবে বলে বোধহয় চোখের জল ফেলছে। কিংবা তার আত্মীয়-পরিজন, মা-বাবা, ঝাড়লণ্ঠন, ঠাকুরদালান, যাত্রাগান ফেলে চলে যাবে বলে বোধহয় নীরবে কাঁদছে।

বাচ্চু জানেই না বিন্নির খই, লাল বাতাসার আছে এক অমোঘ নিয়তি অথবা নদী কোথায় যায় এমন এক জীবনের রহস্যময়তায় সে ইন্দুর জন্য কষ্ট পাচ্ছে। ইন্দু এতটা পারলে সে ইন্দুর জন্য বাকি কাজটুকু করতে পারবে না! এবারে সে সত্যি মরিয়া হয়ে উঠল।

ইন্দু তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বাচ্চু তাকিয়ে আছে ইন্দুর দিকে।

ইন্দু এবারে ফিক করে হেসে দিল। 'শোন বাচ্চু, তুই লক্ষ্মীর পিঠে বসে থাকবি। ঠিক আমার পায়ের কাছে। লক্ষ্মী ছুটবে। অন্ধকার থাকতে পারে, জ্যোৎস্নাও থাকতে পারে। যাই থাক, পায়ের কাছে বসে যখনই বলব, পাঁচ ব্যাটারির টর্চটার ফোকাস আমার শরীরে ফেলতে, ফেলবি।'

বাচ্চু মাথা চুলকাচ্ছিল।

'পড়ে যাব না তো হাতির পিঠ থেকে?'

'না। সামনে বসবি। পাটাতন, জাজিম সঙ্গে দেব।'
'টর্চের ফোকাস ফেললে কী হবে?'
'দেখবি দেবী হয়ে গেছি।'
'যাঃ, হয় নাকি। তোর যে মাথায় কী থাকে!'
'হয়। দেখবি হয়।'

বাচ্চুর ভিতর বোধনের বাজনা বাজছে। নতুন এক নীল ভূখণ্ড সে দেখতে পায়। সেখানে হাত তুলে তার অপেক্ষায় আছে ইন্দু। সে জলে সাঁতার কাটছে। দিগ্‌ভ্রান্ত। কোনও বাতিঘরের মতো ইন্দু তাকে তীরে ওঠার সংকেত পাঠাচ্ছে। সে বলল, 'কাল রাতে কখন আসব?'

ইন্দু বলল, 'যখন আসিছ, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।'

২৭

শেষে 'যখন আসিছ' বলে কী এই! কার্নিশে কেউ হেঁটে আসছে না। জ্যোৎস্নার ছায়া ভেসে যাচ্ছে না হলুদের জমিতে। তবে কি তার দেরি হয়ে গেছে। ইন্দু তাকে ফেলে চলে গেল! সে ঠিক এ-সময়েই বের হয়। সে এখন ঘরে একা থাকে। বাবা বলেছেন, ভয় পাবে না তো। সে বলেছে, না। ইন্দুর সঙ্গে গভীর রাতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে ভয় থাকার কথাও না। সে রাতে ইন্দুর সঙ্গে থেকে বুঝেছে ভূতটুত বলে কিছু নেই। থাকলে একবার চোখে পড়ত না। সব চোখের ধন্দ। দাদারা চলে গেছে বিজয়ার দিনই। দাদারা থাকলে সে অসুবিধায় পড়ত। সে ঠিক সময়েই হলুদের জমিতে পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকেই পাঁচিলের ওপর দিয়ে তারা হেঁটে যায়। দু'-একবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে। রক্ষা— এ-বাড়িতে দুষ্ট আত্মা ভর করেছে। তেনারই ছলনা এসব।

বাচ্চু কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি ইন্দু তার দেরি দেখে সুপারির বাগানে গিয়ে বসে থাকে!

সে সুপারির বাগানে ঢুকে গেল।

না। নেই।

তবে এত বড় সুপারির বাগানে কোথাও লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা কঠিন। সে যে কী করে! ইন্দুকে সে বুঝতে পারে না। সব ঠিকঠাক করে নিজেই এল না! ছাদের সেই পরি দেখবার মতো ব্যাপার! ইন্দু ভাবে কী! তাকে নিয়ে এটা কি ইন্দুর শেষ মজা!

বাঙ্কুর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। সে জ্যোৎস্নায় সুপারির জঙ্গলে ছুটছে, আর ডাকছে, ঝিল্লির খই তুই কোথায়! বাঙ্কুর এখন হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। ইন্দুর ফাঁদে পা না দিলেই হত!

ইন্দু আবার তাকে নিয়ে মজা করল। এত ফাজিল মেয়ে! কিন্তু ইন্দুর চোখে তো সে জল দেখেছে। ইন্দু রহস্যময়ী হতে পারে, কিন্তু এত বড় ধোঁকা দেবে কেন! কাঠের বাক্স, মোমবাতি, ড্রাম, পবনদার ঘর থেকে পাটাতন বের করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা, গভীর রাতে তার কিংবা ইন্দুর এক দণ্ড নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না, সেই ইন্দু শেষ পর্যন্ত আসবে না কী করে হয়!

কিংবা ইন্দু কি বের হতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে! মাতির মা টের পেয়ে গেছে, ইন্দু দিদিমণি পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেমন করতে থাকল। ইন্দু ধরা পড়ে গেলে সেও ধরা পড়ে যাবে। ভয়ে বিহ্বলতায় শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আর এ-সময়ই মনে হল, দিঘির পাড়ে পাতাবাহার গাছগুলোর পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে! ঠিক বোঝা যায় না। কুয়াশার মতো অস্পষ্ট এক ছায়া। এদিকেই হেঁটে আসছে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার মতো জ্যোৎস্নার বাহার। কাল লক্ষ্মীপূজা। তিনি কি তবে সেই! দূর থেকেই ডাকল, 'লাল বাতাসা, আয়। দেরি করিস না।'

ওই তো ইন্দু! ইন্দুই হবে। ইন্দু না হলে লাল বাতাসা বলে ডাকবে কেন!

সে ছুটতে থাকল।

জমিদার-প্রাসাদের এই পেছনের দিকটায় কোনও লোকালয় নেই। মানুষজনের সাড়া পাওয়ারও কথা না। বিশাল বনের মধ্যে পিলখানা। বাঙ্কু দেখল, সেই ছায়ামূর্তি পিলখানার দিকে ছুটে যাচ্ছে। চোখের নিমিষে মিলিয়ে যেতেই সে দৌড়াতে থাকল। ইন্দু পিলখানায় তবে ঢুকে গেছে।

জ্যোৎস্নার আছে নিজেরই এক মোহ। আর ইন্দুর মতো চঞ্চল বালিকার

হাতিদর্শন তাকে কোথায় যে শেষে নিয়ে যাচ্ছে। সে ভিতরে ঢুকলে গাছপালার অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। এমনকী, হাতিটাকেও না। হাতির গলায় শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

আর তখনই যেন কে বলছে, 'টর্চটা কাঠের বাক্স থেকে বের করে নে।'

কাছে গেলে সে হাতিটাকে দেখতে পেল। কিন্তু ইন্দু নেই। যেন বনের গভীরে অন্তরালে সে লুকিয়ে আছে। তাকে কেউ দেখতে পায় না, সে সবাইকে দেখতে পায়।

হাতির ওপাশে যদি ইন্দু দাঁড়িয়ে থাকে।

সে ওপাশে গিয়ে দেখল, নেই।

কেবল চুড়ির আওয়াজ পাচ্ছে। কাছে কোথাও ইন্দু লুকিয়ে আছে। কাঠের বাক্স থেকে টর্চ বের করে আর্ত গলায় বাচ্চু বলল, 'এবারে কী করব বিন্নির খই! কোথায় গেলি?'

'হাতির পিঠে টর্চের ফোকাস ফেল।' অদৃশ্য লোক থেকে কেউ যেন কথা বলছে।

টর্চের ফোকাস ফেলতেই বাচ্চুর চক্ষুস্থির। হাতির উপরে দেবী। বনদেবী। হাতে শঙ্খ, ত্রিশূল। লাল বেনারসি পরা ইন্দুর দু'চোখ বিস্ফারিত। মাথায় সোনার মুকুট। স্থির অবিচল। এমনকী, চোখও। দেবী বাতাসে ভেসে আছেন। টর্চের ফোকাসে দেবী বাদে সব অদৃশ্য। বনজঙ্গল সব। এমনকী, ইন্দু যে হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাচ্চু ঘোরে পড়ে চোখ বুজে ফেলেছে। ইন্দু সত্যি দেবী কি না কে জানে। ভয়ে পালাবে ভাবছিল আর তখনই ইন্দু হাতির পিঠ থেকে নেমে বলল, 'কী বুঝলি?'

বাচ্চুর ঘোর কাটছিল না। বারবার ঝাঁকাতেই তার হুঁস ফিরে এল। দেখল সামনে ইন্দু। হাতে মুকুট, শঙ্খ, ত্রিশূল। বাচ্চু বলল, 'জানি না। যা!' শেষে বলল, 'তোর মাথায় এত দুষ্টু বুদ্ধি!' ইন্দুর আর কোনও কথা শোনার সময় নেই। সে বলল, 'শিগগির হাত লাগা। আমি শাড়ি পালটে আসছি।'

সকালে উঠেই মাতির মা প্রাসাদের বারান্দা ধরে ছুটে যাচ্ছে। 'ঘরে ইন্দু দিদিমণি নেই।'

নেই, নেই।

সারা প্রাসাদে শোরগোল।

কাছারিবাড়িতে খবর এসে গেল, ইন্দু হাওয়া। এত কড়া নজরবন্দি কী করে আলগা হয়ে যায়— ভুতুড়ে ব্যাপার— মাতির মা কপালে করাঘাত করছে, সে সারা রাত জেগেই থাকত— সে ঘুমোত না, ইন্দু দিদিমণি নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। ইন্দু দিদিমণির মধ্যে সেই দুষ্টু আত্মার ছলনাও ছিল না, আরোগ্যলাভ করছিল— এখন সেই নেই।

বাবুমশাই বৈঠকখানায় এসে হাঁকলেন, 'কে আছিস? শিগগির খবর দে সুকুমারকে। নরেনকে। সবাইকে খবর পাঠা।' ইন্দু সুপারির বাগানে পালিয়েছে কি না, কিংবা ইন্দু যদি সত্যি সেই দুষ্ট আত্মার ছলনায় পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়— কত কিছুই হতে পারে— বাবাঠাকুরকে তিনি কী জবাব দেবেন— ইস, কী যে হবে— সারা গাঁয়ে হইরই পড়ে গেছে। আর এ-সময় বাঙ্কুর বাবা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'বাঙ্কুকে পাচ্ছি না।'

নদীর পাড় ধরে তিনি ডেকে এসেছেন— যদি হলুদের জমিতে লুকিয়ে থাকে— গেল কোথায়! এ ক'দিন তিনি বাঙ্কুকে খুবই গম্ভীর দেখেছেন। কেমন অন্যমনস্ক, কখনও চুপচাপ বসে থাকত নদীর পাড়ে— হায় হায় সে গেল কোথায়! আর পবন এসে খবর দিল, সর্বনাশ। লক্ষ্মীও নেই। দেশে এত বড় অরাজকতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মানুষ সব লোপাট হয়ে যাচ্ছে, আর কিনা এই দুঃসময়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে ইন্দু দিদিমণি হাওয়া। নিখোঁজ।

গাঁয়ে গাঁয়ে খবর রটে গেল। সুকুমারকে পাঠানো হল, সে ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ-সাত ক্রোশ টহল দিয়ে ফিরে এসেছে, কোথাও কেউ বলতে পারেনি, হাতির গলার ঘণ্টার শব্দ তারা কেউ শুনেছে! তাজ্জব ব্যাপার, গেল কোথায়! না কি বাবাঠাকুরের কোনও কৃপা! তাঁরই ইচ্ছে এমন হবে— তিনি তো সব আচার-নিয়ম বলে দিয়ে গেছিলেন। পদ্মাবতী অলস রমণী— নিজের সন্তানের প্রতিও তাঁর নজর নেই— বাবুমশাই খেপে গিয়ে বললেন, 'সবাইকে বের করে দাও বাড়ি থেকে। আমার বাড়ির এত বড় কলঙ্ক সইব না। সুকুমারকে ডাকো।'

সারাদিন ধরে একে ডাকো, ওকে ডাকো। ডাকাডাকিই চলছে। সব আমলারা হাজির হচ্ছে, পাইক-বরকন্দাজ হাজির। মাতির মা সকাল থেকেই

কপালে করাঘাত করে চলেছে, চোখের পলকে হাওয়া! সে ভোররাতেও দেখেছে ইন্দু দিদিমণি বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘুমোচ্ছেন। দুপুররাতেও দেখেছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বালা থাকে। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দিনমান বসে থাকা, তার চোখের উপর থেকে হাওয়া, এক পলকের মধ্যে, এই আছে এই নেই। কিছুতেই স্বীকার করছে না অঘোরে সে ঘুমোত। বাবুমশাই অবিশ্বাসও করতে পারেন না। দুষ্ট আত্মার বিচরণ নিজের চোখে দেখেছেন। ফুলমণির দুষ্ট আত্মার কাজ— ইন্দু হাওয়া হয়ে যেতেই পারে— কিন্তু বাচ্চু আবার কোন দুষ্ট আত্মার প্রকোপে পড়ে গেল! লক্ষ্মী তো মানুষ না যে তার উপর দুষ্ট আত্মা ভর করবে! পাগলা হাতির আবার দুষ্ট আত্মা থাকবে কেন? এতসব ভাবতে ভাবতে মনে হল প্রাসাদে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দরকার। বাবাঠাকুরকে খবর দেওয়া দরকার। তিনিই বলতে পারবেন, আসলে কী হয়েছে। তাঁর দিব্যদৃষ্টির কাছে ফাঁকি দিতে পারে এমন কেউ আছে তিনি ভাবতেই পারেন না। বিচার-বিবেচনা করতে সময় লাগে। রক্ষিতজ্যাঠামশাই বললেন, 'আজ্ঞে হুজুর, এত খোঁজাখুঁজি না করে সুকুমারকে পাঠিয়ে দিন।'

বাচ্চুর বাবা বললেন, 'আমার তো মনে হয় তিনি রওনা হয়ে গেছেন। আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন!'

বাবুমশাই বৈঠকখানার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে। ভারী সুদর্শন, ভারী মোটা গোঁফ, হাঁড়ির মতো ভারী মুখ। কোঁচানো ধুতি, ফতুয়া গায়। মাথার কাছে ভজন তালপাতার পাখায় সর্বক্ষণ হাওয়া করছে। ইন্দুর জন্য মমতা তাঁর না যতটা, বাবাঠাকুরকে মুখ দেখাবেন কী করে, দুশ্চিন্তা তার চেয়ে বেশি। আর এ-সময় কী শুনছেন! 'তিনি তো রওনা হয়ে গেছেন!'

'তুমি কী করে বুঝলে রওনা হয়ে গেছেন।' রক্ষিতজ্যাঠাকে কড়া প্রশ্ন।

'হুজুর, আপনার এত বড় বিপদে তাঁর আসন টলে উঠবে না বলুন! তিনি তো সর্বজ্ঞ। স্থির থাকবেন কী করে! ভক্তর বিপদে গুরুর আসন টলে উঠবে না!'

না, তিনদিন হয়ে গেল, তাঁর আসনও টলেনি— তিনি নির্বিকার। তাঁর টিকিরও পাত্তা পাওয়া গেল না।

থানা-পুলিশ কোথাও খবর দিতে বাকি নেই। ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে।

পদ্মাবতীর নাওয়া-খাওয়া নেই। এমন সুন্দর মেয়েটার পেছনে এত লাগলে তারই বা দোষ কী। সে তো পালাবেই। বাবুর কেরামতিতে সংসার ছারেখারে যাচ্ছে কে দ্যাখে! বাচ্চুই বা কেমন, তুই জানিস ইন্দুর মতি স্থির নেই, তোর তো মতি স্থির ছিল।

সবাই ধরে নিয়েছে হাতিটাকে নিয়ে ওরা পালিয়েছে। আর এও তো বিস্ময়ের, হাতি গেলে ঘণ্টা বাজবে, সেই ঘণ্টার শব্দে তল্লাটের কে না টের পায়, বাবুদের হাতি যায়। আর চরের কাশবন থেকে গলার ঘণ্টার পর খবর নিয়ে এল রামসুন্দর। বলল, সে নদীর চরায় হাতির পায়ের ছাপ দেখেছে। কাশের জঙ্গলে হাতির ঘণ্টা পড়ে আছে। লোকজন ছুটছে, পায়ের ছাপ কোনদিকে গেছে! গেছে উত্তরের দিকে। ওরা কি নদী পার হয়ে তবে চলে গেল! সেটা কোথায়, কতদূর! সুকুমার রওনা হয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে, বনজঙ্গল টিলা পার হয়ে দু'দিনের পথ, সে চলে গেছে খবর দিতে, কী হবে? বাবাঠাকুর এখন কী বিধান দেন সেই দেখার।

সুকুমার জানে, রাস্তা দুর্গম। পাহাড় টিলা তৃণভুমি পার হয়ে সর্বজ্ঞের সাম্রাজ্য। পাহাড়ের মাথায় সর্বজ্ঞের দেবী মহামায়ার থান। সেখানে যেতে হলেও হাতে জান নিয়ে যেতে হয়।

তবে তাকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়নি।

বনদুর্গাপুর থেকেই খবর নিয়ে এল। গ্রামবাসীরা সুকুমারকে চেনে। বাবুর মহলে সুকুমার আদায়পত্রে একসময় আসত। তাকে দেখে সবাই নিরস্ত করেছে যেতে। যাবেন না। দেবীর কোপে পড়ে গেছেন সর্বজ্ঞ। অন্ধকার রাতে রত্নে বিভূষিত কুণ্ডল কর্ণে দেবী চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেলেন। এই আছেন, এই নেই। তিনি কখনও জ্যোতির্ময়ী, কখনও গভীর অন্ধকারে অদৃশ্য! গভীর রাতে কুকুরের আর্তনাদে কে একজন বের হয়ে দেখেছিল, মাঠের উপর দিয়ে দেবী ভেসে চলে যাচ্ছেন। ঝলমল করছে দেবীর পোশাক। এক হাতে শঙ্খ, অন্য হাতে ত্রিশূল। আরও খবর, সর্বজ্ঞের তপোবন পুড়ে ছারখার। আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে, টিন-কাঠের বাড়ি, শণের চাল, কিংবা পাতার কুটির আগুনে জ্বলে উঠলে, চোখে ভেসে উঠেছে, দেবী দিগন্তে ভেসে চলে যাচ্ছেন। মনসা পাহাড়ের ওপারে শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

আরও খবর, বাড়ির পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা পাওয়া যাচ্ছে না। একনলা বন্দুকটা হাওয়া। টোটার বাক্স নেই।

সুকুমার ফিরে এসে খবর দেবার আগে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের খোঁজ পড়েছিল। ওটা থাকে প্রাসাদের অস্ত্রাগারে।

আর কী কী গেল!

লাঠি গেল, তরবারি গেল, প্রায় সব ফাঁকা করে দিয়েছে ইন্দু।

সবই যে অলৌকিক ঘটনার মতো। কখন করল, কীভাবে করল! বাবুমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। বাচ্চুর খোঁজে তার বাবা দেশেও লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি ইন্দুকে নিয়ে সেখানে পালিয়ে যায়। বাচ্চু নিখোঁজ, এটা লিখতে বাচ্চুর বাবার বুক কেঁপেছে।

চিঠিতে জানিয়েছেন, বাবুমশাইয়ের মাথা ঠিক নেই। ইন্দু গেছে। অস্ত্রাগারটিও সাফ করে নিয়ে গেছে। এখন আর-এক আতঙ্ক। জমিদারের প্রাসাদ সুরক্ষিত রাখার এমন এলাহি বন্দোবস্ত ইন্দু ছারেখারে দিয়ে গেছে। দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। রাতের বেলা হাজার রকমের সন্ত্রাস। নদীতে সারি সারি নাও ভেসে গেলে ভয়, এই বুঝি লেগে গেল, রাতের বেলা কারা যায় নৌকায়! কার নৌকা, কীসের নৌকা। ডাকাতির ভয়ও কম না। হুজুরবাহাদুরের সময় খুবই খারাপ যাচ্ছে।

বাবুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবরও দেওয়া হল সঙ্গে।

বাচ্চুর জ্যাঠামশাই ছুটে এসেছেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'ইন্দু যখন সঙ্গে আছে ভয় নেই। খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার উপর দুষ্ট আত্মা ভর করেছে বলছ! দুষ্ট আত্মা ভর করেছে তোমাদের ওপর।' বাচ্চুর বাবাকে এক ধমক, 'তুমি কেন আগে আমাকে আসতে লিখলে না। ইস, এমন সুন্দর মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে। হাতি নিয়ে পালিয়ে গেছে বেশ করেছে।'

সুকুমার প্রায় আধমরা হয়ে ফিরে এল। কোনওরকমে ঘোড়ার পিঠে ঝুলছিল। এসেই ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবুমশাইয়ের পায়ের কাছে ধপাস করে বসে পড়ল। সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। বাবুমশাইকে কী যে খবর দেবে! সর্বজ্ঞর লাশ শিমুল গাছের ডালে ঝুলছে। পচে গেছে। দুর্গন্ধ। কাকে-শকুনে

ঠুকরে খাচ্ছে লাশ। পচা দুর্গন্ধে মহামায়ার মন্দিরের কাছেই যাওয়া গেল না।

এত বড় লাশ ছুড়ে দিয়েছে মগডালে কে, কেউ বলতে পারছে না। অতিকায় সব পাথর পাহাড়ের ঢালুতে পড়ে আছে। পথ বন্ধ। শুধু চারপাশে ধ্বংসলীলা। পোড়া মাঠের ধোঁয়া দূর থেকেও সুকুমার দেখতে পেয়েছে।

এমনও গুজব, আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দেবী মহামায়ার কোপ। তিনি নিজেই ঘরে ঘরে আগুনের মশাল ছুড়ে দিচ্ছিলেন। দক্ষযজ্ঞ আর কাকে বলে! কোন অপরাধে দেবী নিজেই আবির্ভূতা হয়ে সব যে শেষ করে দিলেন— কেউ তার কারণ বুঝতে পারছে না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ ত্রাসে পড়ে বোবা হয়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না। রুদ্রাক্ষের মালা-তাবিজ পরা গেরুয়া পোশাক দেখলেই দেবী আকাশ থেকে নেমে আসছিলেন। ভেসে যাচ্ছিলেন। দৌড়েছে— যে যার প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে। কৌপিন ফেলে লুঙ্গি পরে দৌড়েছে। বাবাঠাকুরের সব চেলা নিমেষে হাওয়া। লুঙ্গি নয়, খোট পরে ঝোপ-জঙ্গলে অদৃশ্য। মাঝে মাঝে দেবীকে বিশাল অজগরের মাথায় ভেসে যেতে দেখা গেছে। অজগর না বাঘ, না চলন্ত মাটির ঢিবি, কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

মাঝে মাঝে দেবী নাকি কথাও বলছিলেন, 'লাল বাতাসা, কী বুঝছিস এবার! ভয় পাচ্ছিস না তো!'

অন্ধকার থেকে কে বলছে, 'বিন্নির খই, ওদিকটায়। ওই পালাচ্ছে। আরে পাথরের আড়ালে! দেখতে পাচ্ছিস না!' আবার বলছে, 'ইস, তোর শেষে এই লীলা! বেনারসি পরে তোকে সত্যি দেবী মনে হচ্ছে।'

দেবী তদ্গত চিত্তে নাকি বলেছেন, 'মহামায়ার কোপ থেকে কে রক্ষা পায় দেখি!'

তারপর দেবী নাকি ভেসে চলে গেলেন— দূরে, আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেলেন। কখন তিনি যে নক্ষত্র হয়ে ফুটে থাকলেন আকাশে!

পাশে জ্যাঠামশাই বসে সব শুনে বললেন, 'সত্যি তিনি দেবী।' বাচ্চুর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেবীই বাচ্চুকে রক্ষা করবেন।' বাচ্চুর বাবা তাঁর দাদার কথা শুনে কাছারিবাড়ির দিকে চলে গেলে বাবুমশাই হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'আমার এমন প্রতিমাটিকে নদীর জলে

বিসর্জন দিলাম যজ্ঞেশ্বরবাবু। আমার প্রতিমাটি যে চোখ খুলে দিল, কত বড় অলীকের পিছনে আমরা ছুটছি।'

আর এ-সময়ই বাচ্চুর বাবা কাছারিবাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে আসছেন। কাঠের বাক্সে চিঠি। ইন্দুর চিঠি। ইন্দু লিখেছে, 'খুড়ামশাই, বাচ্চুর জন্য ভাববেন না। ওকে আমি নিয়ে গেছি। নদী কোথায় যায় খুঁজতে বের হয়েছি।'

জ্যাঠামশাই বুঝলেন, নদী কোথায় যায় বলতে ইন্দু জীবনের রহস্যময়তার কথাই বুঝিয়েছে।

জ্যাঠামশাইয়ের মনে হল, ইন্দু শুধু বুদ্ধিমতী নয়, বিচক্ষণও। জীবনের সেই গভীর অর্থটি নাড়া দিল, দেবদেবী, ঈশ্বর বিশ্বাস, মহামায়ার মন্দির, বাবাঠাকুর সবই যে কালের যাত্রা রূপক মাত্র। তিনি এটা বোঝেন বলেই সান্ত্বনা দিলেন বাবুমশাইকে—'যে যার মতো বাঁচে, বড় হয়। আমরা নিমিত্তমাত্র, বাবুমশাই। আপনি চোখের জল ফেলবেন না। এতে ইন্দুর অমঙ্গল হবে। ওরা যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক, বেঁচে থাকুক।'

জন্ম : ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ। ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পর ছিন্নমূল। যাযাবরের মতোই প্রায় কেটেছে যৌবন। কখনও নাবিক রূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, কখনও ট্রাক-ক্লিনার। পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা। প্রধান শিক্ষকও ছিলেন একটি স্কুলে। আবারও ঠাঁই-বদল। কখনও কারখানার ম্যানেজার, কখনও প্রকাশন-সংস্থার উপদেষ্টা। শেষে সাংবাদিকতা।

প্রথম গল্প মফস্বল শহরের 'অবসর' পত্রিকায়। 'সমুদ্রমানুষ' লিখে পান মানিক-স্মৃতি-পুরস্কার। পরে শিশির পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান, মানুষের ঘরবাড়ি, আবাদ, নগ্ন ঈশ্বর, একটি জলের রেখা।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী